"আর বার এ ভারত আপনাতে আস্থক ফিরিয়া
শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় ধ্যানে বস্থক সে অপ্রমত্ত চিত্তে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।"

সূচীপত্র

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

॥ ১ ॥

প্রেরণা

রবীন্দ্রনাথ কবি; তাঁহার কবি খ্যাতি বিশ্ব-বিশ্রুত। বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগস্রষ্টা কবি বলিয়া আমরা অসীম গর্ব বোধ করি। তাঁহার রচনা বিশ্বের সাহিত্যসমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়া পৃথিবীকে চমকিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এ যাবৎকাল তাঁহার কাব্যসাহিত্যকেই আমরা বিশেষ মূল্য দিয়াছি। তাঁহার প্রতিভার দানকে এই মূল্যের দ্বারাই পরিমাপ করিয়াছি। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, কেননা তাঁহার বহুভঙ্গিম কল্পনার দ্বারা তিনি যে বিরাট সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার ভাবময় কাব্যসাহিত্য যে সহজেই মানুষের সৌন্দর্যপিপাসু মনকে আকৃষ্ট ও তৃপ্ত করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তাই দেখি তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা ও কৃতির যে অংশ লইয়া সুধিগণ সচরাচর চর্চা করিয়া থাকেন তাহা স্বভাবতই তাঁহার সৃষ্ট কাব্যসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিয়াছেন,—"আমি কবিমাত্র। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।"

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা তাঁহার মনীষার শ্রেষ্ঠাংশ হইলেও তাহাই যে সব নহে একথা আমরাও যেমন জানি, তিনিও তাহা জানিতেন। বহু বৎসর নদীবক্ষে নৌকাবাসে সাহিত্য সাধনা করিয়া অপরিসীম শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছিলেন কবি কিন্তু তৃপ্তি পান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্ত-বৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে, বলতে হবে ওঁ—আমি জেগে আছি।" শৈশবে ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে তিনি যেভাবে কামনা করিতেন, যৌবনে তাঁহার নিভৃত হৃদয় ঠিক তেমনি বেদনার সহিত মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, এবং পরে বাস্তব জীবনের আস্বাদনে তাঁহার জীবনবোধ কেবল কাব্যে নহে, কিন্তু নানা আকারেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার মধ্যে তাঁহার শিক্ষাসাহিত্য

যেমন একটি প্রকাশের রূপ, তাঁহার শিক্ষাদান কার্যও তেমনি তাঁহার আত্ম-প্রকাশের আর একটি রূপ।

কবি শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ হইল ক্রান্তদর্শী। অর্থাৎ যাঁহার নিকটে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলই প্রকাশ পায়। এই অর্থে সত্যদ্রষ্টা কবি বিরল এবং ক্রান্তদর্শী কবি একান্ত দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ সেই দুর্লভ কবি। জগৎ ও জীবনের সত্য তাঁহার দৃষ্টিপথে ছিল দিগন্তপ্রসারী তাই তাঁহার হৃদয়ানুভূতি ছিল এত গভীর ও অকৃত্রিম। প্রকৃতির পূর্ণতা তাঁহাকে যেমন প্রেরণা দিয়াছিল, মানব প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাও তেমনি তাঁহাকে দিয়াছিল বেদনা। আমাদের শিক্ষা জগতের যে অসম্পূর্ণতা তাহা কবির স্বচ্ছদৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। ইংরাজ শাসকের শিক্ষায় ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে জাগাইবার যে কোন আহ্বান ছিল না—এই দুঃখময় সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সত্যদ্রষ্টা তৃতীয় নেত্র দিয়া। তাই তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন তাঁহার কর্মে ও বাণীতে, তাঁহার সকল প্রয়াসেই মানবজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের অতি সুস্পষ্ট পথ—যে পথে চলিলে মানুষের সামগ্রিক সত্তার পূর্ণ বিকাশে আর কোন অন্তরায় থাকিবে না—আর থাকিবেনা ভারতের বন্ধন দশার শৃঙ্খল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি যুগস্রষ্টা, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত—একথা আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে। সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি নিরন্তর তাঁহার যে শিক্ষাসাধনা চলিতেছিল, প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতির বাহিরে তিনি যে একটি অপূর্ব শিক্ষা আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দীর্ঘ অনবসর কঠিন সাধনা করিতেছিলেন সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বিশদরূপে কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ কথা আজ মানিতেই হইবে যে যতদিন না পর্যন্ত কবির বিরাট সাহিত্যের মধ্যে তাঁহার যে শিক্ষা-দর্শন ছড়াইয়া আছে তাহা আমরা সংগ্রহ করিয়া এবং প্রয়োগক্ষেত্রে তাহার ফলাফল কি তাহা নিরূপণ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাবিদ ও কর্মযোগীরূপে প্রণাম জানাই ততদিন পর্যন্ত গুরুদেবের জীবন কাহিনী পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ হইবে না।

কবির শিক্ষা সম্বন্ধে এই রচনাগুলি বিদেশী শিক্ষাবিদগণের চর্বিত চর্বণ কথা নহে। তাঁহার শিক্ষাতত্ত্ব মৌলিকতায় অসামান্য। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনি তাঁহার নিজস্ব ধারণাকে রূপ দিবার জন্য যেরূপ নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, মহাশিক্ষকরূপে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি

পরীক্ষণের জন্য যেরূপ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনের দ্বারা মানুষের আত্মাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। তিনি যখন দেখিলেন যে বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে তাহার অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তিনিই তখন প্রথম পূর্ব ও পশ্চিমের সাংস্কৃতিক মিলনের দ্বারা দুই শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। বিদেশী শিক্ষার উন্মত্ত নেশার মধ্যে তিনিই স্থিতির আদর্শ, লক্ষ্যের আদর্শ ও পরিণতির আদর্শ ধরিয়া রাখিয়া আমাদের আত্মস্থ করিয়াছেন। এই জন্যই বলিয়াছি যে তিনি ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই বিপ্লবী পরিকল্পনা একান্ত তাঁহারই নিজস্ব। ভারতের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের যে ঐতিহ্য তাহার তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধারক এই যুগে। যাহাতে ভারতের চিত্রকলা, চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত, ধর্ম ও শিক্ষা—সকলই ভারতবর্ষের যুগ পরিবেশে নিজস্ব-রূপেই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে—ইহারই জন্য ছিল তাঁহার নিরন্তর সাধনা। তাঁহার জীবনে কবি ও কর্মীর যে যুগ্মরূপ একত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে ইতিপূর্বে আর কোন কবি বা কর্মীর জীবনে এমন সুষমরূপে প্রকাশ পায় নাই। তাই তাঁহার কবি বা কর্মীরূপের কোন একটিকে বাদ দিয়া অপর একটি দিকের আলোচনা করা আংশিক প্রচেষ্টা। কেননা এই দুইই তাঁহার বৃহৎ কর্ম জীবনের অংশ এবং তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, "কাব্যরচনা ও জীবনরচনা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ এবং এই দুইটিকে একত্র করিয়া দেখিলে কবির জীবনের অর্থ বিস্তৃততর ও ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথের জীবন-প্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি জগৎ ও জীবনকে নানা কল্পনায় ও চেতনায় সত্য করিয়া অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই প্রচেষ্টাই তাঁহার জীবনের মূলগত সাধনা। এই সাধনার দ্বারাই তিনি জ্ঞান ও ভাব, রূপ ও রসের যে নিবিড় অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাই তিনি বিশ্বকে উজাড় করিয়া দান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কাব্য, সাহিত্য ও কর্মের মাধ্যমে। এই সত্যের অনিবার্য বিকাশ যেমন আমরা দেখিতে পাই তাঁহার কাব্যে ও সাহিত্যে তেমনি তাহা দেখিতে পাই শান্তিনিকেতনের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের কর্ম-প্রবর্তনার মধ্যে। সত্য বলিতে

কি, তাঁহার কবি-মনের একটি বিশুদ্ধ প্রকাশ তাঁহার আশ্রম বিদ্যালয়। তাঁহার সময়ে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা তাঁহার চক্ষে ছিল অসম্পূর্ণ—তাহাই পূর্ণাঙ্গ করিতে তাঁহার যে সাধনা তাহা কবির পূর্ণের প্রতি অগ্রসর হওয়ারই সাধনা। কবির সমস্ত জীবন দর্শনের ভিতরে আছে এই পূর্ণতারই সাধনা—তাঁহার শিক্ষাসাধনাও তাহার একটি দিক।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন যে কি রূঢ় রুদ্ধতার মধ্যে, যুক্তিহীন নিষেধের মধ্যে সঙ্কুচিতভাবে কাটিয়াছিল তাহা "জীবনস্মৃতির" পাঠক মাত্রেই জানেন। সেই রুদ্ধ জীবনের কথা, সেই বিভীষিকাময় বিদ্যালয়ের দিনগুলির কথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে তাঁহার মনের অবচেতন স্তরে নিমজ্জিত ছিল কেননা পরিণত বয়সে নানা কাব্য ও প্রবন্ধে এবং পরে কর্মসাধনায় সেই নিরানন্দ লক্ষ্যহীন শিক্ষাজীবনের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। কেবল বিদ্রোহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যখন রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের গোলকধাঁধায় প্রকৃত শিক্ষাহীন জনসাধারণের চরিত্রের শোচনীয় দুর্বলতা লক্ষ্য করিলেন তখন তিনি গঠনমূলক কার্যের দ্বারা তাঁহার নিজের চিন্তা ও আদর্শ রূপায়িত করিতে সাধনা করিতে লাগিলেন শান্তিনিকেতনের সাধনভূমিতে।

জমিদারী পরিচালনাসূত্রে এবং জনসাধারণের সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃত শিক্ষার যে কি অভাব তাহা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্গতির কারণগুলি লুপ্ত হইলেও আমাদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা আমাদের প্রকৃত মুক্তি ও উন্নতির পথে অন্তরায় হইবে। প্রকৃত শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের শিক্ষা নহে। ইহা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবনকে গড়িয়া তুলিবার শিক্ষা। এই বিশেষ শিক্ষা প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে যে পাওয়া যাইবে না তাহার প্রমাণ তাঁহার নিজের জীবনেই ছিল। কাজেই বাস্তব গঠনমূলক কার্যের দ্বারা নূতন আদর্শে তিনি যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িতেছিলেন তখন বিদ্যালয়ে তাঁহার নিজের বাল্যজীবনের নীরস ও বৈচিত্র্যহীন দিনগুলির কথা তিনি ভুলিয়া যান নাই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় তাঁহার "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ "গীতাঞ্জলি"র ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশের সময় কবি তাঁহার "জীবনস্মৃতি" রচনা করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার জীবনের উপর দিয়া বিদেশভ্রমণ, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা,

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব, পিতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল বিচিত্র ঘটনা ও নানা ঘাত-প্রতিঘাত ঘটিয়াছিল সে-সকলের দ্বারা তিনি সহজেই গুরু গম্ভীর দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ একটি বিরাট আত্মজীবনী লিখিতে পারিতেন। কিন্তু কবি সে সকল ঘটনার দিকে না গিয়া আপন বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বয়সটিকে অর্থাৎ জীবনের মাত্র আরম্ভ অংশটুকু নিজের "জীবনস্মৃতির" মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন। মনে হয় রবীন্দ্র-নাথের বহুমুখীন প্রতিভাবিকাশে যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী ও ব্যক্তিত্ব তাঁহার বাল্য ও কিশোর জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কবি সেই ঘটনা ও চরিত্রগুলি তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে একবার বিচার করিয়া দেখিলেন। কেননা, তখন কয়েক বৎসর হইল শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাপ তাঁহার ছিল না; চিরকাল তিনি পলাতক ছাত্র, আজ তিনি শিক্ষাব্রতী হইয়া এক অভিনব বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন, হয়তো জনসাধারণের চক্ষে তাহা খুবই অসঙ্গত বোধ হইতেছে, কেহ কেহ বা তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতিকে কবির "বাস্তববুদ্ধিহীন কল্পনাবিলাস" বলিয়া পরিহাসও করিতেছেন। সে সময়ে এদেশের শিক্ষা হইয়া উঠিয়াছিল মূলতঃ পুস্তকসর্বস্ব ও অর্থকরী এবং অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে ডিগ্রিই হইল যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি। অথচ তাঁহার বিদ্যালয়ে সিলেবাসবাঁধা পাঠ্য পড়ার এবং পরীক্ষা পাশ করিয়া ডিগ্রি লাভ করার গতানুগতিক রীতি নাই। তাঁহার কাজ যে ঠিক পথে চলিতেছে, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতেছে না ইহা বিচার করিবার জন্য একবার আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়াছিল বই কি।

কিশোরের মন যে কি চায়, কি ভাবে তাহা পাইতে চায়, কোন পথ ধরিয়া তাহার মন শতদলের ন্যায় ফুল্ল বিকশিত হইয়া উঠে তাহা ভাবুক, প্রেমিক, দার্শনিক কবি আর একবার নিজের মনে প্রাণে অনুভব করিলেন জীবনস্মৃতির পথ বাহিয়া। সেই গভীর উপলব্ধিরই প্রকাশ দেখি তাঁহার কর্মক্ষেত্রে। "তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল" যদি কেহ দেখিতে চান তবে কবির এই সাধনপীঠে তাঁহাকে আসিতে বলি। কিশোর মনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংশয়-বেদনাকে প্রকাশ করিবার কি প্রশস্ত ক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। আবার জীবনের গভীরতম নিবিড়তম উপলব্ধির স্থানও এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ফুল যেমন অতি স্বাভাবিক পথে ফলে

পরিণত হয় রবীন্দ্রনাথের কিশোর যাহাতে সেই ভাবেই পরিণত মনুষ্য হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা দেখি তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনাতে—পাঠভবন হইতে বিশ্বভারতীর পথে।

কবি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলেছিলেম—আমি চাই নে হতে নব-বঙ্গে নব যুগের চালক সে কথা সত্য বলেছিলেম। অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন; কেউ বলেছেন তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে ইস্কুল মাষ্টারের পদে বসিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কেবল মাত্র খেলার ঝোঁকেই ইস্কুল মাষ্টারকে এড়িয়ে এসেছি—মাষ্টারী পদটাও আমার নয় * * * একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয় আমি কবিমাত্র।" কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহাকে "নববঙ্গে নবযুগের" চালক হইতে হইয়াছিল। বঙ্গের সন্তানদিগকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি এক গুরুভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাহা কতদূর সার্থক হইতেছে, তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থায় বালকেরা সত্য ও জীবন্ত শিক্ষা পাইতেছে কি না তাহাও তিনি "জীবনস্মৃতি" রচনাকালে গভীরভাবে ভাবিতেছিলেন।

এই সত্য ও জীবন্ত শিক্ষা তিনি বাল্য ও কৈশোরে নিজের গৃহেই পাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষাধারায় নিজেকে কোনদিন বাঁধিতে পারেন নাই বটে কিন্তু গৃহের যে অপূর্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশে তাঁহার চিত্তসম্পদ সমৃদ্ধ হইয়াছিল, যে গৃহে শিক্ষার যথার্থ সমন্বয় ঘটিয়াছিল যাহার ফলে তাঁহার কবিমনটি বলিষ্ঠ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই গৃহ পরিবেশের কথাই তিনি লিখিয়াছেন তাঁহার "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে।

এই গৃহপরিবেশেই কবি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন দেখিয়াছিলেন আর দেখিয়াছিলেন পিতা ও অগ্রজগণের সমন্বয়শীল বিশ্বমানবতাবোধের আদর্শ ও নিষ্ঠা। এই গৃহ পরিবেশেই তিনি কাব্য, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত ও নাট্যকলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন এবং তাহারই রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার শান্তিনিকেতনে।

এ কথা সত্য যে "জীবনস্মৃতি" কবির আত্মজীবনী নহে। কিন্তু এই গ্রন্থে কবি যেমন তাঁহার কবিত্ব বিকাশের প্রবাহটি প্রকাশ করিয়াছেন তেমনি সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনের আর একটি বিশিষ্ট দিকের তথ্য তিনি পাঠকের নিকটে পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা হইল তাঁহার শিক্ষাজীবনের

ইতিহাস। বিদ্যালয়ের কৃত্রিম প্রাণহীন শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার তিক্তস্বাদে বাল্যকালে তাঁহার জীবন ব্যর্থবোধ হইয়াছিল, হয়তো বা মনে হইয়াছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণের অক্ষমতা তাঁহার জীবনের একটি বিরাট পরাজয়, তাই তিনি "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের চিত্রটি হুবহু আমাদের নিকটে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কোন অবস্থায়, কি কি কারণে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণে অপারগ হইয়াছিলেন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কবির "জীবনস্মৃতি" পাঠ করিলেই পাঠকের নিকটে সেই কারণগুলি যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্যদিকে তাঁহার গৃহপরিবেশের প্রভাবের ফলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি কি ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, কোন উপাদানগুলির দ্বারা তাঁহার বহু ও বিচিত্র ভাব-কল্পনাময় মনটি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, কি ভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে আপনার জীবন-ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিলেন, এ সকলেরই পরিচয় পাই তাঁহার "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে।

শৈশবে কবির শিক্ষা শুরু হওয়ার চমকপ্রদ ইতিহাস, তাহার বৈচিত্র্যময় অগ্রগতি, তাহার কৌতূহলোদ্দীপক ধারা এবং আশ্চর্যজনক পরিশেষ আমাদের কাছে এক রূপকথার মতই মনে হয়। কবি বিদ্যালয়ের প্রাণহীন শিক্ষাধারাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই একথাই লোকে জানেন, অথচ "জীবনস্মৃতি" পাঠ করিলে দেখা যায় যে শিক্ষার সূচনাকালে বিদ্যালয় সম্বন্ধে কবির মনে কোন বিভীষিকা বা সন্দেহ ছিল না। সত্য কথা বলিতে কি, যেদিন অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ প্রথম স্কুলে গেলেন কিন্তু কবি স্কুলে যাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইলেন না, সেদিন উচ্চৈঃস্বরে কান্না ব্যতীত যোগ্যতা প্রচার করার আর কোন উপায় তাঁহার হাতে ছিল না এবং সত্যপ্রসাদ যখন স্কুলপথের ভ্রমণ বৃত্তান্তটিকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে প্রত্যহ অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন তখন কিছুতেই আর বালককবির গৃহে মন টিকিত না। স্কুলে যাওয়ার জন্য তাঁহার মন মাতিয়া উঠিত এবং বিদ্যালয় সম্বন্ধে কত যে সুখচ্ছবি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যিনি তাঁহাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন, তিনি কবির মোহভঙ্গ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন যেমন স্কুলে যাওয়ার জন্য কাঁদিতেছ, না যাইবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে

হইবে।" কবি তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরম আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন, "সেই শিক্ষকের নামধাম আকৃতি প্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই, কিন্তু সেই গুরুবাক্য ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। এত বড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর কোনোদিন আমার কর্ণগোচর হয় নাই।"

কান্নার জোরে কবি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অকালে ভর্তি হইলেন বটে কিন্তু সেখানে তিনি কি যে শিক্ষালাভ করিলেন তাহা তাঁহার কিছুই মনে নাই কেবল একটি শাসন প্রণালীর কথা মনে ছিল। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হস্তের উপর ক্লাশের অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না কবি বলিতেছেন তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্গণের আলোচ্য, কিন্তু তাঁহার শিশুচিত্তে এইরূপ শাসন প্রণালীর নির্মমতা তাঁহার শিক্ষারম্ভের সূচনাতেই যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা কোনদিনই মুছিয়া যায় নাই।

কবির নিজের জীবন এই আনন্দহীন বিজাতীয় শিক্ষার বেদনায় যে কি ভাবে জর্জরিত হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ চিত্র পাই তাঁহার 'নর্মাল-স্কুল' প্রবন্ধে। কেবলমাত্র "ছাত্র হইয়া থাকিবার যে হীনতা" তিনি যেন আর সহ্য করিতে পারিতেন না। বারান্দার রেলিংগুলিকে লাঠি দিয়া মারিয়া, গুঁতা দিয়া প্রাণের আক্রোশ মিটাইতেন। ক্রমাগত রেলিং এর উপরে বালককবির লাঠি পড়িয়া লোহার দণ্ডগুলির এমন দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে কবি বলিতেছেন, প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিত! তাহার পরে কবি আরও বলিতেছেন, "ইহা বেশ দেখিয়াছি, শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোন দুঃখ পাইতে হয় না। শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। * * * যদিচ রেলিং-শ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণীতে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল, তবু আমার সঙ্গে আর সঙ্কীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।"

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে কবি বেশিদিন ছিলেন না। তাহার পরে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হইলেন। তখন কবির বয়স সাত-আট বৎসরের অধিক নহে। সেখানেও প্রচলিত শিক্ষাধারার অর্থহীনতা ও একঘেঁয়েমী কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল চিত্তকে কি ভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছিল তাহার প্রমাণ পাই তাঁহার সেই "নর্মাল স্কুল" প্রবন্ধে। শিক্ষার সহিত যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের মনোরঞ্জনের আয়োজন থাকে ইহা মনে করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা পাঠের প্রথম ঘণ্টাতে একটি গান গাহিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ছেলেরা গ্যালারীতে বসিয়া গানের সুরে কি যে আবৃত্তি করিত তাহা কবি বুঝিতে পারিতেন না। তবে ভাষাটা যে ইংরাজি তাহা তাঁহার মনে ছিল কিন্তু ছাত্রদের মুখে সেই ইংরাজীটা যে কি ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহা কেবল শব্দতত্ত্ব-বিদগণই উদ্ধার করিতে পারিবেন বলিয়া কবির বিশ্বাস। কেবলমাত্র একটি লাইন তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে মনে পড়ে তাহা হইল—

"কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।"

অনেক চিন্তা করিয়া কবি পরবর্তীকালে ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু কলোকী কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা তিনি কোনমতেই ভাবিয়া পান নাই। বাকী অংশটা তিনি বলেন বোধ হয় "Full of glee, singing merrily, merrily, merrily."

এই নিতান্ত প্রাণঘাতী শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন যে, "থিয়োরী অনুসারে শিক্ষার সহিত ছেলেদের আনন্দ দেওয়া একটা কর্তব্য এবং সেইজন্যই কর্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয়ে কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত চর্চার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ছেলেদের দিকে তাকাইয়া তাহার ফলাফল বিচার করা তাঁহারা সম্পূর্ণ বাহুল্যবোধ করিতেন। যেন থিয়োরী অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্তব্য এবং না পাওয়াটা তাহাদের অপরাধ।"

এ সকল ছাড়াও বালককবির সংবেদনশীল মন ছাত্রদের ব্যবহারে নিতান্তই পীড়িত হইত। অন্য বালকদের সহিত অবাধে মিশিতে পারিলে হয়তো এই অর্থহীন বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন দুঃসহ হইত না, কিন্তু তাহাও তো কোন মতে ঘটে নাই। অধিকাংশ সমপাঠীর সংস্রবই তাঁহার কাছে অশুচি ও অপমানজনক ছিল। শিক্ষকদের মধ্যেও একজন এমন

কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহার কোন প্রশ্নেরই কবি উত্তর দিতেন না। "গিন্নি" বলিয়া কবি যে একটি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহা নর্মাল স্কুলেরই স্মৃতি হইতে লিখিত। কবে যে এই সকল দুঃখময় দিনের অবসান ঘটিবে তাহারই হিসাব করিতে করিতে কবির দিন কাটিত।

নর্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া কবি "বেঙ্গল একাডেমী" নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়েও কি যে পড়িতেছেন তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। অধ্যক্ষ মহাশয়ও কিছু বলিতেন না— মাসে মাসে মাহিনা চুকাইয়া দিতেন বলিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং পাঠচর্চার গুরুতর ত্রুটিতেও তাঁহার পৃষ্ঠদেশ অনাহত থাকিত। কিন্তু গুরুমহাশয়দিগের এই নিরাসক্ত ব্যবহার কবির চিত্তকে নিরন্তর পীড়িত করিত এবং ছাত্রের সহিত গুরুর মনের যে আদান প্রদান হওয়া উচিত তাহার কোনও পরিচয় না পাইয়া এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণও জন্মায় নাই। যে বিদ্যালয়ে কেবল মাস মাস মাহিনা চুকাইয়া দেওয়াই একমাত্র সম্বন্ধ সেখানে ইস্কুলের ঘরগুলি যে নির্মম ও দেওয়ালগুলি পাহারাওয়ালার মত— তাহার মধ্যে গৃহের সস্নেহ পরিবেশ যে কোথাও দেখা যাইত না, ইহাতে আর বিচিত্র কি? কবি বলিতেছেন যে, "ইস্কুল বাড়িটা ছিল যেন একটা খোপওয়ালা বড় বাক্স। কোথাও সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালো মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত।" সেইজন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সঙ্কীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র কবির সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত অতএব ইস্কুলের সহিত তাঁহার পলাইবার সম্পর্ক আর কোন মতেই ঘুচিল না।

বেঙ্গল একাডেমীতেও কবির বিদ্যাশিক্ষার কোন উন্নতি না দেখিয়া তাঁহাকে ১৮৭৫ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেখানেও পাঠ কিরূপ অগ্রসর হইয়াছিল তাহা কবির "জীবনস্মৃতি" হইতেই জানা যায়। তাঁহার দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া কবির লেখাপড়ার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। একদিন তাঁহার

বড়দিদি সৌদামিনীদেবী বলিয়াছিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" কবি আরও বলিতেছেন "আমি বেশ বুঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু যে বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাঁসপাতাল জাতীয় নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘাণির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।"

অভিজাত বংশের সর্বগুণসম্পন্ন, সুদর্শন, বুদ্ধিমান বালক সমাজে সংসারে কৃতিত্ব দেখাইতে অনিচ্ছুক ইহাতে যে স্নেহশীল আভভাবকগণ চঞ্চল হইয়া উঠিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এ পর্যন্ত বালকের শিক্ষার জন্য তাঁহারা যত প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন দেখা গেল যে সকলই ব্যর্থ হইল। অবশেষে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাবমত কবি মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সহিত ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর ২০শে তারিখে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডেও কবি বেশিদিন থাকেন নাই। এক বৎসর পাঁচ মাস বিদেশে কাটাইয়া তিনি পিতার আদেশে সহসা ১৮৮০ ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি জিনিষ বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা হইল ওদেশের পড়াইবার পদ্ধতি। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক মর্লি তাঁহাকে ইংরাজি সাহিত্যে যথার্থভাবে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। সাহিত্য যে ভাষাশিক্ষার যন্ত্রমাত্র নহে—কিন্তু অন্তর দিয়া রস-সম্ভোগের বিষয় তাহা কবি মর্লির অধ্যাপনাতে অনুভব করিতেন। এইখানেই তিনি এদেশের ও ওদেশের অধ্যাপনা পদ্ধতির মধ্যে যে কি বিরাট পার্থক্য তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

যাহা হউক, এই সহসা দেশে ফিরিয়া আসাটা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবেন এবং কালে যশস্বী আইনজীবী হইয়া প্রভূত ধন ও মান অর্জন করিবেন, তাঁহারা সকলেই হতাশ হইলেন। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত কবির সকল সম্পর্ক চুকিয়া গেল। এই বয়সের মধ্যে কাগজে,

শ্লেটে যে অবিরাম কবিতা রচনা চলিতেছিল তাহার ললিত পদবিন্যাস, রচনা-চাতুর্য ও ভাষার মাধুর্য অনেককে চমকিত করিলেও বালকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেহই উচ্চাশা পোষণ করিতেন না এবং বিদ্যালয়ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক মানদণ্ডে তাঁহার গৌরবভার অনেকখানিই কমিয়া গেল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার সম্পূর্ণ হয় নাই বটে কিন্তু গৃহে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। একটি সমৃদ্ধ পারিবেশিক আবেষ্টনের মধ্যে তিনি বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন যাহার ফলে বালককাল হইতেই তাঁহার যে একটি বিশ্বকুতূহলী মন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা তো অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত শিক্ষা তো তাঁহার গৃহেই হইয়াছিল এবং সেই সার কথাটিই তিনি তাঁহার "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে এবং বিভিন্ন পত্রে প্রবন্ধে, নাটকে গল্পে এমন কি কবিতাতেও বার বার প্রকাশ করিয়াছেন। আজ বিশ্বসভায় কবির স্থান অবিসম্বাদী ও তাঁহার প্রতিভা সর্বজন স্বীকৃত। সেই দীপ্ত প্রতিভা কি ভাবে পরিস্ফুরণের সুযোগ পাইয়াছিল তাহা বিচার করিতে হইলে যে যুগে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সেই যুগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে কলিকাতা—বঙ্গদেশের, তথা সমগ্র ভারতেরই সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টা, সাহিত্যসাধনা, ধর্মান্দোলন ও রাজনৈতিক আশাউদ্দীপনার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙালীর অন্তরে বাহিরে, সমাজে সংসারে নানাভাবে মুক্তির আহ্বান আসিয়াছিল। এবং য়ুরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগে ইতালী যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ভারতীয় রেনেসাঁয় বঙ্গদেশ ঠিক সেই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল একথা বলা অত্যুক্তি নহে। বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সহিত ঠাকুর পরিবার যে শতাধিক বৎসর কাল ধরিয়া অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভারতের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে মঙ্গলবার মধ্যরাত্রির পর মহামানব রবীন্দ্রনাথের শুভ আবির্ভাব হইল।

বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত কবির পিতৃপুরুষ এই ঠাকুর বংশ এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও শক্তি অর্জন করিয়াছিল, যাহার বলে এই পরিবারের অনেকেই বাংলার বিচিত্র সামাজক জীবনের শীর্ষ স্থানে নিজ নিজ অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবি

সত্তর বৎসর বয়সে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দনের প্রতিভাষণে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, "যে-সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত। আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।......এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগেছিল সে স্বাভাবিক—মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছ-পালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।"

ইংরাজ বণিক, সরকারী কর্মচারী, মিশনারী, শিক্ষক ও সাংবাদিকগণের সংস্পর্শে আসিয়া কলিকাতার নাগরিকগণের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার মধ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়া ঠাকুর পরিবারের মধ্যে অতি সুষ্টুভাবেই পরিব্যক্ত হয়। কবি তাঁহার "জীবনস্মৃতিতে" লিখিতেছেন, "বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, বেশভূষায়, কাব্যে গানে, চিত্রে নাট্যে, ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল।" তাঁহার বাল্যবয়সে গৃহে সাহিত্য চর্চার একটা স্রোত বহিয়া চলিতেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্য রচনায় মগ্ন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন—আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্ন-প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়া-ছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, "আমি ঘরের কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিবার চেষ্টা করিতাম।...শুনিয়া তাহার বহুস্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।"

সাহিত্যের রসগ্রাহিতা যেমন ঠাকুর পরিবারের ছেলে মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, সঙ্গীতকুশলতাও ছিল তেমনি তাঁহাদের সহজাত ক্ষমতা। কবি লিখিয়াছেন, "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।" রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সুকণ্ঠ ছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার আদরও ছিল সর্বত্র। আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাড়ির গীতশিক্ষক, ধ্রুপদী বলিয়া বিষ্ণুচন্দ্রের খ্যাতি ছিল। ইনিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতগুরু। কবি লিখিয়াছেন,

"প্রত্যহ শুনেছি সকালসন্ধ্যায় উৎসবে আমোদে উপাসনামন্দিরে তাঁর গান। ঘরে ঘরে আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলাভাষায়। এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে চিরাভ্যস্ত সেই প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ার ভিতরে থেকেও তাঁরা আপন মনে যে সব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ ও তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।" কবির ভ্রাতারা গতানুগতিক সাংস্কৃতিক ধারাকে গ্রহণ করিয়া আপন আপন বৈশিষ্ট্যে তাহা সুষমামণ্ডিত করিয়া দেশকে নূতনভাবে তাহা পরিবেশন করিয়াছেন। এই ভাবে দেখা যায়, ঠাকুর বংশের যুবকেরা যে সৃষ্টিধর্মী মনের পরিচয় দিয়াছেন তাহা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে।

আর একটু বড় বয়সে কবি যদুভট্টের নিকটে গানের যে শিক্ষা গ্রহণ করেন তাহারই প্রভাব তাঁহার জীবনে স্থায়ী হয়; কিন্তু কবি নিয়মিতভাবে কখনও গান শেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই।" "কুড়িয়ে বাড়িয়ে" যাহা পাইয়াছিলেন তাহা হইতেছে দেশী গান, লোকের মুখ হইতে শোনা—দাস দাসী কর্মচারী ভিখারী বাউল মাঝি মাল্লার গান। এই সব গানের ভাষা ও ভাব বালককবির ভাবপ্রবণ মনের উপরে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীত গুণিয়া শেষ করা যায় না; প্রায় আড়াই হাজারের উপর তাঁহার সঙ্গীতের সংখ্যা। এই বিরাট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সঙ্গীত ভাণ্ডার সুরু হইয়াছিল তাঁহার ষোলো সতেরো বৎসর বয়স হইতেই। পূর্বেই বলিয়াছি যে বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা তাঁহাদের বাড়ীতে কোন বাধা না পাইয়া যেন উৎসের ন্যায় উৎসারিত হইয়াছিল। ছেলেবেলায় তিনি যে গান শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাহা সখের দলের গান নহে, কাজেই তাঁহার মনে কালোয়াতি গানের একটি ঠাট আপনাআপনি জমিয়া উঠিয়াছিল। ১৮৭৮ সালেই দেখি তিনি রচনা করিয়াছেন "তাঁহার শাখা উজল করি", "শুন নলিনী খোল গো আঁখি", "বলি ও আমার গোলাপ বালা" ইত্যাদি। তাহারও পূর্বে বিদ্যাপতির "ভরা বাদর মাহ ভাদর" গানটিতে তিনি সুর দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ সাল হইতেই "ভানুসিংহের পদাবলী"র গান রচনা করিয়াছিলেন যদিও সুর দেওয়া হইয়াছিল পরবর্তী কালে কাজেই আমরা দেখি বাল্যকালে সে

যুগের বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিল্পীদের সংসর্গ তাঁহার উপর কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ইহাও দেখিতে পাই যে শিশুকবি তাঁহার শিক্ষার প্রথম পাঠ পাইয়াছিলেন নানা জাতীয় ছড়ার ছন্দ হইতে; গুরুমহাশয়ের নিকট ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই লইয়া এই শিক্ষা পাওয়া যায় না। শিশুকালের যেসব কথা তাঁহার স্মরণে ছিল—তাহাদের অন্যতম হইল বাড়ির খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জের কথা। কবি বলিতেছেন, "সেই কৈলাস মুখুজ্জে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত।······কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।······আর মনে পড়ে, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান। ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।"

'ছড়ার ছবিতে', 'বালক' কবিতায় এবং 'ছেলেবেলার' মুখবন্ধেও কবির বাল্যকালের একটি স্মৃতি চিত্রিত আছে। যে কবিতাটি এই মুখবন্ধে মুদ্রিত হয় তাহার এক জায়গায় আছে—

"কিশোরী চাটুজ্যে হঠাৎ জুটতো সন্ধ্যা হোলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লব কুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া,
মনে মনে ইচ্ছে হোত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হোত এই পাঁচালির দলে
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাশে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।"

এইসকল ছাড়াও ভৃত্যমহলে যে-সব বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াও বালক কবির সাহিত্যচর্চা সুরু হয়। ভৃত্যেরা দৈনিকবরাদ্দ জলখাবারে ঘোরতর

কৃপণতা করিত বটে কিন্তু তাহাদের কাব্যচর্চায় শিশুকবির মনের খোরাকে কম পড়ে নাই। যে ভৃত্যদের শাসনে কবির শৈশবের দিনগুলি কাটিয়াছে—তাহাদের মধ্যে ব্রজেশ্বর ছিল অন্যতম। এই ব্রজেশ্বর ঠাকুরবাড়িতে চাকুরী লইবার পূর্বে গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয় ছিল। কাজেই সন্ধ্যাবেলায় ভৃত্যদের বৈঠকে সে ভূতপূর্ব পদগৌরবের অধিকারে সভাপতির আসন গ্রহণ করিত। সেই সভায় চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস—রামায়ণ পাঠই ছিল প্রধান কাজ। সুদূর বাল্যকালের সেই রহস্যময় দিনগুলির কথা মনে করিয়া কবি লিখিয়াছেন, "ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশ-লবের কথা আসিল, বীর বালকেরা তাহাদের বাপ-খুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যেবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ উৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও মনে পড়ে।"

সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙ্গা সেজের চারিদিকে বসাইয়া বাড়ির ভৃত্যেরা কবি ও অন্যান্য বালকদিগকে সংযত রাখিবার জন্য রামায়ণ মহাভারত শুনাইত। কুশ-লবের কাহিনী শুনিতে শুনিতে একদিন রাত্রি বাড়িয়া গেল, কিন্তু শেষ হইতে তখনও অনেক বাকী। বালকেরা মুগ্ধ হইয়া দুই বীর বালকের বীরত্ব-কথা শুনিতেছে, কিন্তু মনে মনে জানে যে তাহাদের রাত্রি জাগরণের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে অথচ সমস্ত কাহিনীটা না শুনিয়া শুইতে যাইতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই—এহেন সময়ে হঠাৎ কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালী গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া দিল। কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল, অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝঙ্কারে বালকেরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এইভাবে অতি অল্প সময়েই রামায়ণ পাঠ শেষ হইল। রামায়ণের কাব্যরসে বালকদের মন অভিষিক্ত হইল। ভৃত্য শ্যাম যখন ঘরের মধ্যে "গণ্ডি" আঁকিয়া যাইত, বালক রবীন্দ্রনাথ তাহার বাহিরে যাইতে সাহস করিতেন না। সীতার দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া বালক চুপ করিয়া গণ্ডির মধ্যে বসিয়া থাকিতেন। পরিণত বয়সে "বনবাস" কবিতায় সম্ভবতঃ কবির সেই বাল্যস্মৃতি রূপপরিগ্রহ করিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

"বাবা যদি রামের মত
পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাবছ মনে ?"

তাই দেখিতেছি, অক্ষর পরিচয়ের পূর্বেই কবির শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল ছড়া, কবিতা ও রূপকথার অরূপরাজ্যে। রবীন্দ্রনাথ ছড়ার রসকে বাল্যরস আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মত ভাব-প্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় শিশুর মনে ছড়ার ছন্দ ও রূপকথার কাহিনী যে তরঙ্গ সৃষ্টি করিত, তাহার ধ্বনি প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রসাহিত্যে বারে বারে দেখা দিয়াছে। ইহার বহুকাল পরে রূপকথার তত্ত্ব সম্বন্ধে কবি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহাই বোধহয় এই সম্পর্কে সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মন্তব্য। "রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মত উলঙ্গ, সত্যের মত সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মত স্বচ্ছ আর এখনকার দিনের সুচতুর গল্প মুখোশ-পরা মিথ্যা।" "অসম্ভব গল্পে" তিনি আরও বলেন, "শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম। এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয় ঠিক বুঝিত আসল কথাটা কোনটুকু।"

কবির বাল্যবয়সে বাংলা বই বেশী ছিল না। যে কয়খানা বই মুদ্রিত ছিল তাহার একটিও বোধ করি তিনি পড়িতে বাকি রাখেন নাই। আজকাল শিশুপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ছেলেদের জন্য যেমন বই রচিত হয় সেকালে সে রকম বই বাজারে ছিল না, কাজেই কবি নিজেই লিখিতেছেন যে, "বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে কয়টা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।" সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীও কবি পাঠ করিয়াছিলেন বালকবয়সে। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি। মৈথিলী ভাষায় পদাবলী পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথের এমনই আয়ত্ত হইয়া গেল যে সেই ভাষাতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই কবিতাগুলিই ১৮৮৪ সনে ভানুসিংহের পদাবলী নামে প্রকাশিত হয়। তখন কবির বয়স তেইশ বৎসর মাত্র।

জন-সাধারণ হইতে দূরে বাস করিলেও তিনি আত্মীয় বন্ধুদের সাহচর্যে সংগীত, সাহিত্য ও নানা শিল্পচর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি খুব বড় কথা। তিনি নিজেই বলিয়াছেন

যে শিশুকাল হইতে তিনি পলাতক ছাত্র কিন্তু বিশ্ব সংসারের যে-সকল অদৃশ্য শিক্ষক অলক্ষ্যে থাকিয়া পাঠ শিখাইয়া দেন তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে নিয়ত ইংরাজি ও বাংলা সাহিত্যের এবং সঙ্গীতের আলোচনা হইত এবং এইরূপ সমৃদ্ধ পরিবেশের মধ্যে কবি বাড়িয়া উঠিয়াছেন। এই সকল বিদ্যা যথার্থভাবে বাল্যকালে শিক্ষালাভ না করিলেও এসব হইতে তিনি নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার বড়দাদার সাহিত্য রচনা হইতে যেসকল লেখা বাদ পড়িত—সেইগুলি তিনি অবারিতভাবে পড়িতেন ফলে সেই রসরচনাগুলি তাঁহার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রাখিয়া গিয়াছিল।

যখন চারিদিকে খুব ঘটা করিয়া ইংরাজী পড়াইবার ধূম চলিতেছিল তখন কবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া বালক ভ্রাতাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেন, ফলে বালকদের বাংলা ভাষার বুনিয়াদ হয় পাকা, বিষয়জ্ঞানও একেবারে কাঁচা হয় নাই। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিত্তিও শক্ত হইয়া গড়িয়া ওঠে। "ছেলেবেলা" পুস্তকে কবি লিখিতেছেন "সকাল হতে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই। ঘর্ঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন বড় শাসনকর্তা। সেজদাদা বলতেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপরে ইংরেজী শেখার পত্তন তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনও বি এ ডি ব্যাড, এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমাদের বিদ্যে পৌছয় নি।" পৌছায় নাই বলিয়াই বোধ হয় বাল্যে বাংলা-সাহিত্যে পারঙ্গম এবং ইংরাজীতে অপটু রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী রচনা তাঁহার যৌবন কালেই ইংরাজী সাহিত্যেও গৌরবের আসন অর্জন করিয়াছে। মাতৃভাষা উত্তমরূপে আয়ত্তে ছিল বলিয়া উত্তরকালে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। পরবর্ত্তীযুগে রবীন্দ্রনাথ যখন নিজ বিদ্যায়তনে শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তখন ছাত্রদের একটা বয়স পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষা মুলতবী রাখিয়া বাংলার মধ্য দিয়া সমস্ত শিক্ষনীয় বিষয়ের বুনিয়াদ পত্তন করিবেন ইচ্ছা

করিয়াছিলেন যদিও সেই ইচ্ছা নানা কারণে পুরামাত্রায় সম্বন্ধে পরিণত হয় নাই।

নর্মাল স্কুলে বালকদের যাহা পড়িতে হইত, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল বাড়িতে। পূর্বেই বলিয়াছি যে বালকদের শিক্ষাদান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ। তাঁহারই নির্দেশ ও সময়সূচীমতে ছেলেদের যে বিচিত্র বিষয়ে গৃহশিক্ষা চলিত তাহার বর্ণনা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ভোরের অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া তাঁহাদিগকে লংটি পরিয়া প্রথমেই হীরাসিং নামে এক কানা শিখ পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পর সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া লেখাপড়া আরম্ভ হইত। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল তাঁহাদের পড়াইতেন। সকাল ছয়টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বালকদের শিক্ষার ভার ছিল তাঁহার উপর। পাঠ্য ছিল অক্ষয় কুমার দত্তের 'প্রাণিবৃত্তান্ত', মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', এছাড়া জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল তো ছিলই। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিমন্যাষ্টিক শিক্ষক তাঁহাদের লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার পর ইংরাজী পড়াইবার জন্য আসিতেন অঘোরবাবু। রবিবার সকালে গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে গান শিখিতে হইত এবং মাঝে মাঝে সীতানাথ ঘোষ আসিয়া যন্ত্রযোগে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। যন্ত্র সাহায্যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সে যুগে শিক্ষাব্যবস্থায় একেবারেই নূতন জিনিষ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে সেই শিক্ষাটি তাঁহার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল এবং যে রবিবার সকালে বিজ্ঞান-শিক্ষক না আসিতেন সে রবিবার বালকের কাছে রবিবারই বলিয়া বোধ হইত না।

"জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে "নানা বিদ্যার আয়োজন" প্রবন্ধে কবির বাল্যশিক্ষার সম্পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া যাইবে। নানা বিদ্যার মধ্যে কবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ বালকদের অস্থিবিদ্যা শিখিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া তাঁহাদের পাঠগৃহে লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহারই মধ্যে আবার এক সময়ে হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় তাঁহাদিগকে মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতেন। কবি লিখিতেছেন, "অস্থিবিদ্যার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্র, দুয়ের মধ্যে জিত কাহার ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমার বোধহয় হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।" এই সকল তথ্যের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে সাধারণের

বিশ্বাসমত কবির শৈশব ও শিক্ষাজীবন কেবল আলস্যে, বিলাসে ও দিবাস্বপ্নে কাটে নাই; বরঞ্চ বলা যায় যে প্রত্যূষ হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত কঠিন শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের মধ্যেই তাঁহার বাল্যকাল কাটিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবিকাশে যে-সকল ব্যক্তির সহায়তা ছিল এবং তাঁহার কবিমানসে যাঁহাদের প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা আমাদের সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে। তাঁহার ঋষিতুল্য আকৃতি বেদ-উপনিষদে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, সর্বোপরি তাঁহার যথার্থ মনুষ্যত্ব বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

মহর্ষি কি গভীরভাবে বালক চরিত্র বুঝিতেন তাহার একটি উদাহরণ পাই কবির উপনয়ন অনুষ্ঠানের পরেই। এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার কিশোর পুত্রকেও অতিক্রম করিয়া যায় নাই। পৈতা উপলক্ষ্যে মাথা মুড়াইয়া বালক কবির ভয়ানক ভাবনা হইল, কি করিয়া তিনি নেড়া মাথা লইয়া ফিরিঙ্গি স্কুলে যাইবেন। "মুণ্ডিত মস্তকের উপরে আর কোনো অন্য জিনিষ বর্ষণ যদি নাও হয় ছেলেগুলি হাস্য বর্ষণ তো করিবেই।" এমন দারুণ দুশ্চিন্তার সময় পিতা তাঁহাকে হিমালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়! পরম সঙ্কটের সময় শিশুচিত্তের গভীর উৎকণ্ঠা বুঝিয়া লইয়া এমন সময়মত কাজ করা কত স্নেহের কত ঔদার্য্যের পরিচয়। পিতা বালক কবিকে লইয়া হিমালয় যাত্রা করিয়া "মুণ্ডিত মস্তকের" লজ্জা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন বটে কিন্তু পুত্রের শিক্ষা দীক্ষার কোন শৈথিল্য হইতে দিলেন না। মহর্ষি স্বয়ং আদেশ দিয়া কবির হিমালয়ের উপযোগী বেশভূষা প্রস্তুত করাইলেন এবং মাথার জন্য একটি জরির কাজ করা গোল মখমলের টুপিও আনা হইল। নেড়া মাথার উপরে টুপি পরিতে কবির মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, "মাথায় পরো।" মহর্ষির কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার উপায় ছিল না। তিনি কোন ঢিলাঢালা ভাব পছন্দ করিতেন না। এই শিক্ষার ফলে আমরা দেখিয়াছি কবিও উত্তরকালে সকল কাজ বেশ সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ হওয়া পছন্দ করিতেন এবং তাহার ব্যতিক্রমে বিরক্ত হইতেন।

কেবল তাহাই নহে। উপনয়নের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে না, ইহার জন্য সাধনার প্রয়োজন। উপনয়নের পরে পিতা পুত্রকে আহ্বান করিলেন এই সাধনার জন্য। হিমালয় শিবভূমি, হিমালয় যোগভূমি,

এই হিমালয় ভারতের মুনি ঋষি ও যোগীশ্রেষ্ঠদের অনন্তসঞ্চিত তপস্যার পবিত্রতায় পূত। এই স্থানই মহর্ষি বালক-ব্রহ্মচারীর জন্য মনোনীত করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের পোষণ ও পূর্ণতার ইহাই শ্রেষ্ঠতম পরিবেশ।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে হিমালয়ে আসিবার পর পিতা তাঁহাকে গীতা হইতে কতকগুলি শ্লোক চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেগুলি বাংলা অনুবাদসহ তাঁহাকে কপি করিতে বলিয়াছিলেন। সর্বোপনিষদ চয়ন করিয়া গীতার যে অমৃতরস তাহাতেই বালককবি অভিষিক্ত হইলেন পিতার সান্নিধ্যে। তাহার পর তিনি আরও বলিয়াছেন, "হিমালয়ে বসিয়া আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশি বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম।" ইহা ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন, "প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।" এইভাবে হিমালয়ের আসনে বসিয়া ঋষি পিতার নিকটে বালক-ব্রহ্মচারী ব্রহ্মধ্যানে ও তপস্যায় দীক্ষালাভ করিলেন।

এই শিক্ষার প্রভাব তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতা টাউন হলে যে রবীন্দ্রজয়ন্তী (১১ই পৌষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনুষ্ঠানে দেশবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে— মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম॥ * * * প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্য যে যত্তেরূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার, আত্মীয় স্বজনের ঐক্যতত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠেছে—বলে উঠেছে কোহ্যেবানাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দন স্যাৎ॥" ব্রহ্মের এই যে কল্যাণতম রূপকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার প্রথম সেই পাঠ সুরু হইয়াছিল মহর্ষি পিতার পদতলে।

আবার আর এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "এক একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি

মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।" পিতার বিষয়ে কি শ্রদ্ধার সহিত তিনি লিখিতেছেন, "আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে (শান্তিনিকেতনে) কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগ-সাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিষ ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটা মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।"

কবির জীবনে পিতার এই সাহচর্য ও শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয় বন্ধুগণও সাক্ষ্য দিয়াছেন। কবিগুরুর মহাপ্রয়াণের দিনে তাঁহার প্রিয় সেবিকা লিখিতেছেন, "কবি পুবশিয়রি হয়ে শোয়া, আমি পায়ের কাছে একটা মোড়ায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছি। চেয়ে চেয়ে দেখছি আর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে আকাশ স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগলো। বরাবর এর অনেক আগেই বিছানায় বালিশগুলো উঁচু করে দিয়ে উঠিয়ে বসাবার হুকুম হতো। আজ আর পূবদিকে মুখ ফিরিয়ে দেবার তাগিদ নেই। * * * অমিতা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে কবির ঠোঁটে একটু করে জল দিচ্ছেন আর কানের কাছে মুখ নিয়ে "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" মন্ত্র উচ্চারণ করছেন—যদি ভিতরে জ্ঞান থাকে তাহলে যেন উনি তাঁর প্রতি দিনের ধ্যানের মন্ত্র শুনতে পান।"

পিতার শিক্ষায় তাঁহার মনে যে গভীর ধর্মবোধ সৃষ্টি হইয়াছিল—সেই ভিত্তির উপরেই যে তাঁহার সমস্ত কর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত, এ কথা বলা অত্যুক্তি নহে। পুত্রের জীবনে পিতার প্রভাব যে কত বড় এই শিক্ষাই আমরা পাই যুগ্মভাবে মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথের জীবন আলোচনায়। উপনয়নের পরে পিতা ও পুত্র একত্র থাকার ফলে তাঁহাদের মধ্যে যে একটি সুন্দর ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার স্মৃতি কোনদিনই কবির মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। হিমালয় যাইবার পথে মহর্ষি কয়েকদিন বোলপুরে বিশ্রাম করেন। এই স্থানে

পরস্পরের সাহচর্যে ঋষি পিতার সহিত শিল্পী ও কবি পুত্রের প্রথম সত্যকার পরিচয় ঘটিল। পুত্র বালক হইলেও সে যে শ্রদ্ধা ও আস্থা-ভাজন তাহা প্রমাণ করিতে পিতা পুত্রের উপর প্রচুর দায়িত্ব ও অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "পিতা বোধ করি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতি সাধনের জন্য আমার কাছে দুই চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে-চিন্তা তিনি করিলেন না আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। পিতার কাছে জমা খরচ মেলাইবার সময়ে কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিলই বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।" কবি আরও বলিতেছেন "তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবলবেগেই করিতাম, ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।" পরবর্তীকালে কবির শিক্ষাসাহিত্যে শিশুকে দায়িত্ব দানে সম্মানিত করিতে হইবে, তাহার ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে এবম্বিধ যেসকল উপদেশ পাওয়া যায় তাহার ধারণা তিনি পাইয়াছিলেন পিতার নিকটেই।

বালকপুত্রের কোন কাজকেই প্রবীণ পিতা যৎসামান্য বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া কবি পিতার নিকটে উপস্থিত করিতেন। পিতা উৎসাহ দিয়া বলিতেন, "কী চমৎকার, এ সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!" আমি বলিতাম, "এমন আরও কত আছে। কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।" তিনি বলিতেন, "সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে তাঁহার সহকর্মিগণকে বালকদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্ব দিতে পরামর্শ দিতেন। বলিতেন, স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিলে চিন্তা ও কল্পনাশক্তি ক্রমে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। শিক্ষার এই আদর্শ জীবনের অতি প্রত্যূষেই তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার নিকট হইতেই। হিমালয় বাসকালে মহর্ষি পুত্রকে ভ্রমণাদি ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। বাসার নিকটবর্তী অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবনে

একাকী দীর্ঘলৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায়ই তিনি বেড়াইতেন। কোন বিপদের আশঙ্কা করিয়া কবিকে ইচ্ছামত পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে মহর্ষি একদিনও বাধা দেন নাই।

হিমালয় ভ্রমণে আসিয়াছেন বলিয়া কবির যাহাতে পড়াশুনার ব্যাঘাত না ঘটে সে বিষয়ে মহর্ষির তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। অতি প্রত্যূষে তিনি পুত্রকে সুখশয্যা হইতে উঠাইয়া দিতেন যাহাতে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে পারেন। মহর্ষি নিজেও সেই সঙ্গে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং উপাসনায় বসিতেন। সূর্যোদয় হইলে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন। প্রৌঢ় বয়সে কবি শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনাকালে বলিয়াছেন "মনে রাখিতে হইবে যে বালকদের সাধনার এবং গুরুর সাধনার একই সমতল আসন—এখানে গুরুশিষ্য সকলে একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাশে ভর্তি হইয়াছেন।" এই অভিজ্ঞতাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার ঋষিপ্রতিম পিতার সান্নিধ্যেই—সেই হিমালয়ের তপোভূমিতে।

সংস্কৃত ছাড়া ইংরাজী পড়াইবার জন্য মহর্ষি কতকগুলি ভাল ইংরাজী বই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং পিতার সাহচর্যে কবি বালক বয়সেই গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। দেশপূজ্য পিতা ও বালক পুত্রের মধ্যে যে সহজ সম্বন্ধটি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। পিতার সহিত বালক রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তর্ক করিতেন। সচরাচর এমত ক্ষেত্রে ধমক দিয়া বালককে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মহর্ষি ধৈর্যের সহিত পুত্রের সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া যাহা সত্য বা ন্যায্য বলিয়া মনে করিতেন তাহা পুত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। পুত্রের সহিত তিনি নানা আমোদজনক ও কৌতুককর গল্পও করিতেন। এইভাবে বালকের নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গদান করিয়া তাহা মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন—তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই।

কবি শ্রদ্ধার সহিত আরও স্মরণ করিয়াছেন যে বাল্যকালে তিনি দুইটি পারমার্থিক কবিতারচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবুর মুখে কবিতা দুইটি শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়াছিলেন। কিন্তু যৌবনে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে" গীতটি শুনিয়া পিতা পুত্রের কাব্য-প্রতিভার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন

না। সে সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা ও সাহিত্য বুঝিত, তাহা হইলে কবিকে তাহারা নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করিত, কিন্তু রাজার দিক হইতে যখন সে সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্মচারীকে চেক বহি আনিতে বলিলেন এবং কবিপুত্রের হাতে একখানি ৫০০৲ শত টাকার চেক্ দিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন।

ছাত্রশাসন সম্পর্কে কবির যে মত প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ভিত্তিও মহর্ষির শিক্ষার উপরে। জীবনের শেষ পর্যন্ত মহর্ষি কোন মতেই পুত্রদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধে কাজ অনেকেই করিয়াছেন; তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু কবি বলিতেছেন যে মহর্ষি কখনই তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য তাহা সকলে অন্তরের সহিত করিবে, এজন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে যে কেহ বাহির হইতে গ্রহণ করিবে, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্ত হইত না; তিনি জানিতেন যে সত্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে ফেরা যায়, কিন্তু কৃত্রিম শাসনে সত্যকে অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সত্যের মধ্যে ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়। কবি বলিতেছেন, "যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।"

পূর্বেই বলিয়াছি যে দেশের শিল্প, সঙ্গীত, ভাষা, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, বেশভূষা, আচার ব্যবহারে ঠাকুর বংশ এক নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। কবির পিতামহ দ্বারকানাথের সময় হইতে তাঁহাদের গৃহে নানা জাতীয় লোক-সমাগম হইত। রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার ও লোকহিতকর কার্যে তিনিই প্রধান সহায় ছিলেন। পিতার উত্তরসাধকরূপে দেবেন্দ্রনাথও নানা সমাজ সংস্কারক ও ধর্মপ্রচার কার্যে মনোযোগী ছিলেন। মহর্ষির অনন্যসাধারণ গুণগ্রাহিতা, জ্ঞানী ও গুণীদের সমাদর করিবার যে সহজ আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহাতে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া আসা করিতেন।

তাঁহাদের বাড়িতে হিন্দু পূজা-অনুষ্ঠান রহিত হইবার পর মাঘোৎসবকে প্রধান উৎসব বলিয়া ধরা হইত এবং তদুপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজন ও বহু বন্ধু বান্ধব, দীক্ষিত ব্রহ্মবাদী ও হিতৈষীগণ কয়েকদিন একত্র হইয়া উৎসব পালন করিতেন। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন এবং তাহার সাম্বাৎসরিক উৎসবও ধূমধামের সহিত সম্পন্ন করিতেন। রবীন্দ্রনাথ আজন্ম তাঁহাদের গৃহে ঐ সকল উৎসব হইতে দেখিয়াছেন এবং বাল্যকাল হইতেই গুরুজনদের আলাপ অলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া (১৮৩৩) ইংরাজি শিক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া একটি প্রাচীন দেশ ক্রমশঃ তাহার সকল সম্পদ হইতে বঞ্চিত, ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত ও সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্তরে বাহিরে রিক্ত হইতে চলিতেছে।

এই বৈদেশিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হিন্দুসমাজের মুখ্য ব্যক্তিগণ যথা রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি নানাভাবে হিন্দুসমাজের সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। পিতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও স্বদেশের প্রতি তাঁহার পিতৃদেবের একটি অক্ষুণ্ণ আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল এবং তাহাতেই তাঁহার পরিবারের সকলের মধ্যে প্রবল স্বদেশ প্রেম সঞ্চারিত হয়। যে সময়ে শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজগণ পূর্ণমাত্রায় মাতৃভাষার চর্চা করিতেছিলেন। কবি লিখিয়াছেন, "আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

এই জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই দীর্ঘদিন বাস করিয়াছেন পিতৃগৃহ-বিতাড়িত কেশবচন্দ্র, এইখানেই পদধূলি পড়িয়াছে পরমহংসদেবের। মধুসূদন দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ বারে বারে আসিয়াছেন মহর্ষির সহিত আলাপ আলোচনা, নানা সমস্যা সমাধানকল্পে, আর আসিয়াছেন নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দপ্রমুখ সাধকবর্গ। ইঁহাদের দর্শনে, সাহচর্যে ও তাঁহাদের আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্কের মর্মকথা শুনিয়া বালক-কবি

মানুষকে সংস্কারের মূঢ়তা, আচার বিচারের জড়তা ও বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার জন্য যে গভীর প্রেরণা পাইয়াছিলেন ইহা ভাবিয়া লইতে দোষ কি?

ঠাকুরবাড়ির সাহায্যে "হিন্দুমেলা" বলিয়া কলিকাতায় যে মেলা বসিত, তাহাতে কবি বাল্যকাল হইতেই যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন তাহার সাক্ষ্য আছে ইতিহাসে। এই মেলায় দেশের স্তব গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশীয় গুণী লোকেদের পুরস্কার দেওয়া হইত। ১৮৭৫ সালে চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সে বালক-কবি "হিন্দুমেলায় উপহার" নামে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এক উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা লেখেন। ইহা ভিন্ন স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা, কাপড়ের কল তৈয়ারী করা, বিলাতী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বদেশী মূলধনে জাহাজ চালাইবার প্রচেষ্টায় ঠাকুর বংশের যুবকেরা প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কাজেই এ-সকলই বালক ও যুবক রবীন্দ্রনাথের মানসপটে যে নানা রঙ্গের চিত্র আঁকিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মৃতি হইতে কখনই মুছিয়া যায় নাই ইহা নিশ্চিত। এই ঘটনাগুলি তঁহার চরিত্রস্ফুরণে ও কর্মজীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

বৃক্ষ যেমন সহজেই মাটি হইতে রসগ্রহণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট করে, তেমনিভাবে বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিবেশ হইতে জ্ঞানের ও ভাবের রসগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, সঙ্গীতের অনুশীলনে, চিত্রকলার রসগ্রাহিতায় কবি তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ও তাঁহার স্ত্রী কাদম্বরীদেবীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। কবির "লেখাপড়া" না হওয়ায় বাড়ির সকলেই যখন তাঁহার প্রতি বিরূপ তখন কাদম্বরীদেবীর স্নেহ তাঁহার জীবনে আশীর্বাদের ন্যায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহারই স্নেহ ও সাহচর্যে কবির সাহিত্যজীবন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উদ্বোধনে একদিকে যেমন তাঁহার পিতা, নূতন বৌঠান কাদম্বরীদেবী, অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও দিদি স্বর্ণকুমারীদেবী নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার গৃহপরিবেশ এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজও তাঁহাকে নবভারত রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাঁহার বাল্যশিক্ষার ভিত্তিটা

যে কত দৃঢ় ও গভীর গাঁথুনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁহার সমস্ত সাহিত্যে বারম্বার পাওয়া যায়। লৌকিক অর্থে তাঁহার শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই বটে কিন্তু যে জ্ঞানের যজ্ঞশালায় তিনি নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, সেখানে বিদ্যা একটি "লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ" ছিল না, তাই তাঁহার মন উপবাসী হইয়া মরে নাই, বরঞ্চ নব নব জ্ঞানের সরস আস্বাদনে বিদ্যালাভের স্পৃহা ও আনন্দ নিত্যই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বিদ্যার প্রতি তাঁহার অনুরাগ একেবারে অকৃত্রিম এবং জ্ঞানার্জনের আগ্রহ অতিশয় প্রবল ছিল বলিয়াই তিনি স্কুল হইতে পলাইয়া গিয়া প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ বৈদেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় জীবনধারার পক্ষে যে অনুকূল নহে তাহা তিনি বাল্যকালেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই পরিণত বয়সে তিনি সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পাঠশালায় গুরুমহাশয় হইয়া বালক-দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কবি নিজের যথাসর্বস্ব পণ করিয়া, কবিতা-দেবীকে উপবাসী রাখিয়া একটি আদর্শ শিক্ষায়তন গড়িতে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। নিজের চিন্তা ও লেখনীকে শিক্ষা-বিজ্ঞানের গবেষণায় নিয়োগ করিয়া বিদ্যার্থীকে বিদ্যার্জনের ক্লেশ হইতে মুক্তি দিয়াছেন—তাহার জন্য দেশ তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

এই বিরাট কার্যে কবি প্রেরণা পাইয়াছিলেন বহু ক্ষেত্র হইতে। তাঁহার কবিমানসের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল প্রকৃতি ও মানুষ। তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য সেই প্রকৃতি ও মানুষের প্রকাশ, তাহাই তাঁহাকে কর্মপথে প্রেরণা দিয়াছিল। তাঁহার আধ্যাত্মিকজীবনের উপরে দৃঢ়তম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন মহর্ষি ও রামমোহন। সাহিত্যজীবনের উপর দেখি বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব যেমন গভীর, পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাবও বাদ পড়ে নাই। বিহারীলাল তাঁহার প্রিয় কবি ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যজীবনের গুরু বলিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্মান দিয়াছেন। কর্মজীবনে বাউল মার্গ তাঁহাকে সহজ ও সরল সাধনার দিকে পথ দেখাইয়াছে আর কালিদাস দেখাইয়াছেন তপোবনের আদর্শ। এ সকলেরই রূপ তাঁহার কর্মসাধনায় বার বার প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি নিজেও বলিয়াছেন, "বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমার মনে এর ভাবটি—সঙ্কল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সঙ্কল্পের বীজ আমার

মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।"

তাই দেখিতেছি কাব্যে, গানে, চিত্রে, নাট্যে, ধর্মে, স্বাদেশিকতায় ও বেশভূষায় ঠাকুর-বংশ বাংলা দেশে যে-সকল পরিবর্ত্তন আনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যে-সকল মনীষী ও গুণী জ্ঞানী বিদ্বোৎজ্জন সমাবেশে তাঁহাদের গৃহ সততই একটি সাংস্কৃতিক রুচিবোধে মণ্ডিত হইয়া থাকিত—তাহাদেরই প্রভাব একদিন কবিকে বিশ্বভারতী গড়িতে প্রেরণা দিয়াছিল এবং তাহাদেরই মধ্যে গুরুদেব বিশ্ব-ভারতীর মানসীমূর্ত্তি ও পরিণতি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

॥ ২ ॥

আশ্রম

সৌন্দর্যচর্চায়, আলস্যে বিলাসে, ভাবের উচ্ছ্বাসে যুবক কবির দিন যায়। "জীবনস্মৃতিতে" তিনি লিখিতেছেন, "তখনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কী আমার জীবনে, কি আমার গদ্যেপদ্যে, কোন প্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ করিতে চায় নাই। পথিকের দলে যোগ দিই নাই, কেবল পথের ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম।" কিন্তু এমন "নির্ভাবনার দিন" আর বেশিদিন রহিল না। বাইশ বৎসর বয়সে কবির বিবাহ হইল। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি তাঁহাকে সংসারের কর্মরজ্জুতে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিলেন। মহর্ষির পত্রাবলীতে দেখা যায় যে তিনি কবির বিবাহের ঠিক দুই দিন পূর্বে পুত্রকে লিখিলেন, "এই ক্ষণে তুমি জমিদারীর কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

জমিদারী পরিচালনা কার্যে রত হওয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ঘটনা। ইহার দ্বারাই তিনি বাংলার নিপীড়িত, শোষিত, জীবন সংগ্রামে পরাজিত ধ্বংসপ্রায় জনসাধারণের সহিত পরিচিত হইলেন। বাংলা দেশের চাষীর যে এমন দুর্গতি, তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার যে এমন অধোগতি হইয়াছে তাহা তাঁহার জানা ছিল না। তিনি হতবাক্ হইয়া দেখিলেন যে মহাজন ও জমিদারের শোষণের ফলে বাংলার চাষী সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হইয়া অর্থনৈতিক ব্যর্থতায় যেন কাঁদিতেও ভুলিয়া গিয়াছে।

পিতা যখন তাঁহাকে জমিদারী দেখাশুনা করিবার কাজে আহ্বান করিয়াছিলেন তখন তিনি সেই কাজের গুরুত্ব বেশ ভালো করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এমন কি গৃহে কয়েকটি আকস্মিক মৃত্যু ও দুর্ঘটনার ফলে জমিদারী তদারকের ভার যখন আপনাআপনিই তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িল তখনও তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে দেখি না। জমিদারী দেখাশুনার কাজ তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়াই আমাদের মনে হয় কিন্তু সেই সময়ে কবি ভাবিয়াছিলেন অন্যরূপ। পদ্মাবক্ষে নৌকাবিহার সাহিত্যচর্চার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ হইবে বলিয়া তাঁহার মনে আশা ছিল। ভাবিয়াছিলেন

বুঝি, "আরামে দিবস যাবে।" এই জমিদারী তদারকের ভিতর দিয়াই তিনি দরিদ্র দুঃখকাতর মানুষের যে পরিচয় পাইলেন তাহা ছিল তাঁহার স্বপ্নেরও অতীত। ইহারা কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার করে, কত সামান্য কারণে বিবাদ করে, "ছেলে পিলে গরু লাঙ্গল ঘরকন্নাওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোদের" সহিত তাঁহার এই প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিল।

পদ্মার জীবন যে কেবল কবিতা রচনা বা কাব্যসম্ভোগের দিন ছিল তাহা বলা সম্পূর্ণ সত্য হইবে না, কেননা জমিদারীর নানা প্রকার ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তিনি এক নূতন বিশ্বের পরিচয় পাইলেন। সঙ্কীর্ণ পরিসরে মানুষের বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার নীরস কঠিন দিনগুলি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সেই অপার শান্তি, প্রকৃতিদেবীর নিবিড় সাহচর্য আর তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। এই সময় হইতেই দেখি, তাঁহার কাব্যজীবনের ভিতর দিয়াই তাঁহার মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটিতে সুরু হইয়াছে। আপনার বেষ্টন ছাড়াইয়া খুব বড় একটা ত্যাগের জন্য, আপনার জীবনকে বিলাইয়া দিবার জন্য তাঁহার মনে এক আকুলতা জাগিতেছে। কবি লিখিলেন,

> "ওরে তুই ওঠ্ আজি।
> আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে
> জাগাতে জগৎ জনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
> শূন্যতল।" (২৩শে ফাল্গুন ১৩০০)

"এবার ফিরাও মোরে" (১৩০০) রচনার পর হইতেই আমরা দেখি যে মানবচিত্তের ঘাত প্রতিঘাতের কথা তাঁহার কবিতার মধ্যে বার বার দেখা দিতে লাগিল। তাঁহার মনে যে ডাক আসিয়া পৌঁছিল তাহা আর আরামের বা মাধুর্যের নহে। "অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছায় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়। ......এ আহ্বান—এ তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক—রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।" এমনি করিয়াই তাঁহার জীবনের মধ্যে কর্মকে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিবার দিন আসিয়া পৌঁছিল। ক্রমেই দেখা দিতে লাগিল পূর্বজীবনের সহিত আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ। তাই তাঁহার এই সময়কার একটি রচনাতে পড়ি, "অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্যআসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্র বেশে কে দেখা দিল?" এখন থেকে দেখি

কেবল তাঁহার মনে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়াছিল, এই সময়ে লেখা "বর্ষশেষ" কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে। এই উপলব্ধি যেন একটি ঝড়ের মত আসিয়া তাঁহার আভিজাত্যের কঠিন আবরণকে প্রবল বেগে ভাঙ্গিয়া দিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বাহির হইবার সময় আসিয়াছে। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না—তাই তিনি একেবারে কাজে নামিয়া পড়িলেন এবং তাহারই ফলে বোলপুরের উষর প্রান্তরে গড়িয়া উঠিল তাঁহার ধ্যানের "শান্তিনিকেতন।"

শান্তিনিকেতন মহর্ষির আশ্রম। একদিন মহর্ষি বোলপুর হইতে রায়পুরের সিংহ পরিবারের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। শ্রান্ত হইয়া তিনি বীরভূমের তৃণশূন্য প্রান্তরে এক সপ্তপর্ণদ্রুমতলে বিশ্রাম করিলেন। সেখানে তিনি কি যে অনুভব করিলেন, তাহা কেহ জানে কিনা জানি না, তবে গৈরিকমাটির রুক্ষতায় যে ঔদাস্য ও বৈরাগ্যের আহ্বান তিনি পাইলেন, তাহাতে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরটি তাঁহার সাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। এখানে তিনি তাঁহার "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তিকে" পাইলেন। সেই মরুভূমিতে বাড়ি উঠিল, মন্দির নির্মিত হইল এবং যাঁহারা তপস্যা করিবেন তাঁহাদের জন্য মহর্ষি একটি শান্তিধাম ট্রষ্টডীড করিয়া উৎসর্গ করিয়া গেলেন।

মহর্ষির এই সাধনভূমির সহিত কবির প্রথম পরিচয় ঘটে ১৮৭৩ সালে অর্থাৎ যখন তাঁহার এগারো বারো বৎসর বয়স। উপনয়নের পর বালক-কবি পিতার তপস্যাভূমি বোলপুরে বিশ্রাম করিলেন। "জীবনস্মৃতিতে" কবি লিখিতেছেন, "সন্ধ্যার সময়ে বোলপুরে পৌঁছিলাম। পালকীতে চড়িয়া চোখ বুঁজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সামনে খুলিয়া যাইবে, ইহাই আমার ইচ্ছা—সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।"

শান্তিনিকেতনে আসাটাও জমিদারী দেখাশুনা কাজের মত কবির জীবনে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেননা, এখানে আসিয়াই তিনি জীবনে প্রথম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ছাড়া পাইয়াছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই

সুযোগ যদি আমার না ঘটত। * * * সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম—এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ—দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তালশ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। তারপরে এই আকাশে, এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য।"

ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরের যে রূপটি তিনি মনে মনে কামনা করিতেন, ঠিক তেমনটিই মিলিল এই শান্তিনিকেতনে। অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া এ যাবৎকাল বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টি মেলিয়া দিয়া হৃদয় ও মন তৃপ্ত করিয়াছেন বালককবি। বোলপুরে আসিয়া দেখিলেন ঘনগম্ভীর শাল মহুয়ার বন, দূরে-স্তব্ধ সমুন্নত তালশ্রেণী, ঊষর প্রান্তরের রুক্ষতায় অজয় নদের স্নিগ্ধ প্রলেপ—বালকের কবিমন একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। উত্তর জীবনে যখন তপোবনের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিলেন তখন সহজেই তাঁহার মনে আসিল শান্তিনিকেতনের শান্তিময় ছবি। তাঁহার প্রতিভার পুষ্টি, প্রকাশ ও পূর্ণতার জন্য যে একটি অনুকূল ক্ষেত্রের প্রয়োজন ছিল তাহার সন্ধান মিলিল পিতার এই তপস্যাভূমিতে।

১৮৯১ সালে ২২ শে ডিসেম্বরে অর্থাৎ ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল। তখন কবির বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। সেদিন কলিকাতা হইতে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল শান্তিনিকেতনের এই মন্দির প্রাঙ্গণে। কবি সঙ্গীতকার্যে যোগদান করিয়া উপাসক মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। একদা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে মহর্ষি একাকী উপাসনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। কে ভাবিয়াছিল যে সেই নির্জন নিভৃত তপস্যা হইতে ক্রমে সাধনকামীদের এক সাধনামন্দির গড়িয়া উঠিবে? সত্য বলিতে কি, এই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে রবীন্দ্রনাথও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে বীরভূমের সেই শুষ্ক প্রস্তরময় গৈরিক মাটির মুক্ত প্রান্তর হইয়া উঠিবে তাঁহারও ধর্ম ও কর্মসাধনার কেন্দ্রস্থল।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ আবার জমিদারীতে ফিরিয়া আসিলেন। কোথায় শান্তিনিকেতনের শান্তিধাম আর কোথায়

জমিদারীর বস্তুতান্ত্রিক জগতের পরিবেশ। পূর্বেই বলিয়াছি জমিদারী দেখাশুনার কাজকে ভবিতব্য বলিয়াই ধরিতে হইবে। এই সময় হইতে দেশের সমস্যাগুলি হাজার রূপ লইয়া কবির সম্মুখে দেখা দিল। ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মন যে দেশের সমস্যাগুলি লইয়া একেবারে চিন্তা করে নাই তাহা নহে। কেননা, তরুণ কবির সর্বগ্রাসী চিত্তে তখন যেমন বিচিত্র সাহিত্য-জিজ্ঞাসা জাগিতেছে তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র সমস্যার কথাও জাগিতেছে। কিন্তু তখনও কোন কিছুই তেমন গভীরভাবে তাঁহার অন্তরদেশ স্পর্শ করে নাই। কবির তেইশ বৎসর বয়সে যখন বাংলাদেশে ইলবার্ট বিল সম্পর্কে তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছিল তখন ঠাকুর বংশের কাহাকেও এই আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইতে দেখি না। অবশ্য একথাও সত্য যে, কবি তখন কলিকাতা হইতে বহুদূরে কারোয়ারে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন, কাজেই সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণ ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার সাহিত্যে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবুও একথা বলিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির যুবকেরা এই নূতন রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে কিছু দূরে দূরেই থাকিতেন।

কবি ও তাঁহার ভ্রাতাদের আদর্শ ছিল অন্যরূপ। দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য দেশবাসীর সুপ্ত চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করাটাই তাঁহারা মনে করিতেন আসল কাজ। সে কাজ যে ইংরাজী ভাষার মারফতে হইবে না এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তবে একথাও সত্য যে তাঁহারা এ সকল আন্দোলন হইতে দূরে থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া, রবীন্দ্রনাথ দেশের শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থাকে ক্রমাগত সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিলেন যে দেশের উন্নতি করিতে হইলে যে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে হইবে এমন নহে, যাহাতে সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারিদিক হইতে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। যে আন্দোলন মানুষের সমগ্র সত্তাকে উদ্বোধিত করিতে পারে না তাহাতে কাজ কি? এই অল্প বয়সেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করিতে হইলে শিক্ষার প্রচারই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ইংরাজিতে যে সকল ভাব ও চিন্তা শিক্ষিতেরা জানেন, দেশের মধ্যে সেই কথা বাংলা ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। ১২৯০

সনে "ভারতী" পত্রিকায় কবি লিখিতেছেন, "বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।" রাজপুরুষদিগকে কেন্দ্র করিয়া স্বদেশের উন্নতিসাধনের জন্য সভাসমিতি করার ব্যর্থতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতের কোন অস্পষ্টতা ছিল না এবং অবশেষে এই "স্বাদেশিকতার শিক্ষা" ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনই উৎসর্গ করিয়া গেছেন।

"জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে তিনি লিখিতেছেন, "তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্র-নৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে দেশানুরাগের মৃদু-মাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল আমার মন কোনো মতেই তাহাতে সায় দিত না।" ১৩২৮ সনের "প্রবাসী" পত্রিকায় কবির এক পত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন, "তখন বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল বয়কট করে ইংরেজের লোকসান করা—আমিই একমাত্র তার প্রতিবাদ করেছি, বলেছি নিজের চেষ্টায় দেশের আত্মকর্তৃত্বের ভিত্তিস্থাপন করতে হবে। ছাত্রেরা আমার কাছে যখন এসেছেন, আমি তখনই তাঁদের এই পরামর্শ দিয়েছি, বলেছি গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেশের সেবা করুন—তাঁরা কর্ণপাত করেন নি। শেষকালে তোমাদের কজনকে শিলাইদহে নিয়ে নিজের চেষ্টায় যেটুকু পারি গ্রামে আত্মশাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলুম—কৃতকার্য হতে পারি নি, তার প্রধান কারণ বাংলা দেশ সেজন্য প্রস্তুত ছিল না।"

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক নবীন জমিদার রবীন্দ্রনাথ বাংলার হতভাগ্য পরমুখাপেক্ষী দেশবাসীদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই মর্মন্তুদ অবস্থার প্রতিকার চাই। সিংহনাদে তিনি বাংলার নেতা ও যুবকদের আহ্বান জানাইলেন, বলিলেন,

> "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" (১৩০০ সন)

এই সময় হইতেই তিনি এক বিশাল জাতিগঠনমূলক কার্যের পরিকল্পনা করিতে সুরু করিলেন। জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে তাঁহার আর কোন দ্বিধা রহিল না। পাবনা কনফারেন্সের (১৯০৮) বক্তৃতায় তিনি তখনকার কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব নীতির কঠোর সমালোচনা

করিয়া দেশ জুড়িয়া সংগঠনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে এক কর্মপ্রণালী দেশবাসীর কাছে তুলিয়া ধরিলেন। কেননা, তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে শিক্ষিত সমাজ ক্রমশই দেশের অন্তস্থল হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। বৃটিশ শাসন ও পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য আর এক রূপ ধরিয়া দেখা দিতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং ১২৯৯ সনে "ভারতী" পত্রিকায় "হাতেকলমে" প্রবন্ধে অত্যাচারে উৎপীড়িত, অপমানে লাঞ্ছিত, অন্নবস্ত্রাভাবে মৃতপ্রায় দেশবাসীর প্রতি শিক্ষিত সমাজের কর্তব্য কি তাহা অতি স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করিলেন।

দ্বিতীয়বার বিলাত ঘুরিয়া আসিবার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে ক্রমাগত নানা প্রশ্ন জাগিতে থাকে। এইবার য়ুরোপের উন্মাদজীবন—উৎসব কোলাহল তাঁহাকে একেবারেই তৃপ্ত করিতে পারে নাই। "য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী" পড়িলে সেকথা বেশ পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ সে সভ্যতা যতই বিদেশীয় বা মন্দ হউক না কেন, তাহা আমাদের উপরে সুনিশ্চিতভাবে আসিয়া পড়িয়াছে; তাহার তরঙ্গ আর কে রোধ করিতে পারে? তাই তিনি দেশবাসীকে উচিত ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে বটে কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি আমরা ত্যাগ করিব কোন কারণে? "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমাজ" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, দুই বিপরীত শক্তি আমাদিগকে দুই দিকে টানিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে দোলায়মান না হইয়া উভয় শক্তিকেই স্বীকার করিয়া লইয়া দেশবাসীকে যথাযথ পথে চালনা করাই দেশের নেতৃবর্গের কর্তব্য।

১২৯৯ সনে রাজসাহীতে বাসকালে তথাকার এসোসিয়েশন হইতে শিক্ষাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য কবিকে আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি এই এসোসিয়েশনে "শিক্ষার হেরফের" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মাত্র একত্রিশ বৎসর বয়সে কবি এই প্রবন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে সত্যসত্যই তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও মনস্বিতার পরিচয় পাই। তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে সে সময়ে যে কথা সত্য ছিল তাহার সত্যতা ও যথার্থতা আজ সত্তর বৎসর পরেও কোনরূপেই হ্রাস পায় নাই। ইংরাজী

ভাষা শিক্ষার তিনি মোটেই বিরোধী ছিলেন না কিন্তু ইংরাজী ব্যতীত কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না একথাও তিনি কোন মতেই স্বীকার করেন নাই।

"শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধটি তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনের কথা প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া তাহা প্রভূত সুখ্যাতি পাইল। এ যাবৎকাল দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে কোন সমালোচনা হয় নাই এবং এখন হইতে রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে নিজের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই একথা না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।" তিনি "সাধনা" পত্রিকায় ১২৯৯ সনের পৌষ সংখ্যায় "আচারের অত্যাচার" বলিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহাতে স্পষ্টই বলিতেছেন যে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার ফলে এবং তাহাই আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হওয়াতে বালকদের মন যথার্থভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানান্বেষণের ঔৎসুক্য বোধ করিতেছে না, আবার দেশীয় শাস্ত্রের শিক্ষায়, আচারের অত্যাচারেও তাহাদের মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। নূতনের অন্ধ অনুকরণ যেমন, প্রাচীনের মূঢ় অনুসরণ তেমনই বাঙ্গালীর চিত্তকে চাপিয়া মারিতেছে, একথা তিনি নানা ভাবে, নানা অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন এবং "কড়ায় কড়া, কাহনে কানা" প্রবন্ধেও এ সম্বন্ধে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন।

ভারতের শিক্ষিত সমাজ য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যেরূপ বাহবা দিতেছিলেন সে সময়ে, তাহা দেখিয়া কবি অত্যন্ত পীড়াবোধ করিলেন। তিনি লিখিলেন, "এক সময়ে লোকের মনে হইয়াছিল যে কেবল স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া তাহারা বীরপুরুষ হইবে। এবং পাশ্চাত্যদের নিকট হইতে স্বাধীন হইয়া শাসনের দাবী করিয়া ও তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবে। তজ্জন্য আমাদের যাহা কিছু ছিল সকলই ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু ভেদ সমানই রহিয়া গেল। ইংরেজ যদি আমাদিগকে একাসনে বসাইত তাহা হইলে ইংরেজের মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের গৌরব আরো কমিয়া যাইত। পৌরুষ দ্বারা যে আসন সে পাইয়াছে, আমরা প্রশ্রয়ের দ্বারা তাহা পাইলে অপমান বাড়িত। রাজনীতিকদের মন্ত্র হইতেছে বিদেশী শাসকদের

নিকট হইতে কিছু আদায় করা, কিন্তু পৃথিবীর সমক্ষে ভারতবর্ষেরও একটা উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। মুখে আস্ফালন করা আর শোভা পায় না।”

অন্যদিকে ঘোর নিষ্ঠাবান হিন্দুগণও বিজাতীয় শিক্ষাপ্রণালীকে কঠোর সমালোচনা করিতে লাগিলেন। এমন কি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় নিজে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিলেও “হিন্দুর একনিষ্ঠতা” প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১৩০৮ বৈশাখ) লিখিলেন যে, পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ করিয়া আর্যসন্তানেরা বহুনিষ্ঠ বর্ণাশ্রম বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ঋষিদিগের অভেদদৃষ্টি বর্ণধর্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব।” এইভাবে তাঁহারা পশ্চিমের শিক্ষাকে “ডালে মূলে” উপড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, “আমরা অনুকরণের এক প্রান্ত হইতে বর্জনের অপর প্রান্তে প্রবলভাবে গিয়া পড়িতেছি। প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ তাহা আমাদের জাতির অস্থি মজ্জায় মিশিয়া আছে তাহার প্রভাব এত ক্ষণভঙ্গুর নহে যে ভুলিতে চাহিলেই আমরা ভুলিতে পারিব আবার ইংরেজের নকল করিয়াও যে সাংস্কৃতিক উন্নতির পূর্ণতা পাইব তাহাও নহে। যখন আমরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইতে পারিব কেবল তখনই ইংরেজের কাছ হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা নূতন করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে পারিব। আমাদের ব্যাধি হইল অস্বাভাবিকতা, ইংরাজী সভ্যতাকে নিজস্ব করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, আবার ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহ্যিক অংশ লইয়া যে বাড়াবাড়ি হইতেছে তাহাও অস্বাভাবিক।” এই দুই দিকেরই বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথের মনকে এত পীড়িত ও বিড়ম্বিত করিয়াছিল যে তিনি প্রায় সমসাময়িক একখানি পত্রে স্ত্রীকে লিখিতেছেন, “আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ এবং সরল হোক, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক, আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আমাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক।” কবির অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা “নৈবেদ্যের” মধ্যে রূপ লইয়াছে। ভারতের এই আকাঙ্ক্ষিত জীবনের মহিমা তিনি প্রকাশ করিলেন তাঁহার বিখ্যাত কবিতাতে—

“হে ভারত তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন

দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।
হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড, সিংহাসন ভূমি।"

এই উপকরণবহুল আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাঁহার কি তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল তাহারই প্রকাশ দেখি তাঁহার "চিঠিপত্রে" প্রথম খণ্ড ৩৪ সংখ্যার চিঠিতে। "আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এ রকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূর থেকে কল্পনা করা যায় না।" কিছুকাল হইতেই শান্তিনিকেতনে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা তাঁহার মনে জাগিতেছিল। এই সময়ে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রকেও লিখিলেন, "শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া আরাম লাভ করিয়াছি। সেখানে একটা নির্জন অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি।"

এই সময় হইতে স্পষ্টরূপেই বুঝা গেল যে কবির মন কোনদিকে। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশীসমাজ" নামক এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার মধ্যেই তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০৮ সালে পাবনা কনফারেন্সের পর হইতে তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে সরিয়া গেলেন এবং স্বদেশ সেবায় নিজস্ব ভাব ও আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য গঠনমূলক কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই স্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতির আসন হইতে বাংলাভাষায় বক্তৃতা দেন। পূর্বে যাঁহারা ঐ সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদের ভাষণ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও স্বকীয় প্রেরণার ফলেই সেইদিন হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙলাভাষা যে তাহার নিজস্ব স্থান লাভ করিয়াছে, ইহা বলা অত্যুক্তি নহে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে আরও একটি দেশে জাতীয় আন্দোলনের আগুন জ্বলিতেছিল। সে দেশ হইল আয়ার্ল্যাণ্ড। রবীন্দ্রনাথ আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতা ও যুবকদিগের কর্মধারা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতেছিলেন। সে দেশে যখন একদিকে প্রবলভাবে "সিনফিন" আন্দোলন

চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আর একদল লোক স্যার হোরেস প্ল্যাঙ্কেট, জর্জ রাসেল প্রভৃতির নেতৃত্বে আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কার্য করিতেছিলেন। ইহার ফলে আইরিশ জাতীয়শক্তি কোনদিনও দেউলিয়া হইয়া পড়ে নাই। এই ভাবে ভারতীয় জাতীয়শক্তি যাহাতে নষ্ট না হইয়া যায়, যাহাতে আমাদের নষ্টপ্রায় চরিত্রবল আরও দুর্বল না হইয়া পড়ে, সেইজন্য কবি নিজের কর্মপন্থা একেবারে স্থির করিয়া ফেলিলেন। ভারতীয় সমাজ জীবনের গ্লানি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি লিখিলেন—

"এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করি দাও তুমি
সর্বতুচ্ছ ভয়, লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর"

যেখানে অসংখ্য ভয়ের দ্বারা মানুষের মন আচ্ছন্ন, যেখানে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় মানুষের মন পঙ্গু সেখানে জাতির জীবনে সাহস ও সংহতি কোথা হইতে আসিবে? এই বয়সে "নৈবেদ্য" কবিতার মধ্যে যে ভাবের প্রকাশ দেখি তাহা তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে প্রেরণা দেয় নাই কিন্তু কর্মের মধ্যে তাঁহার নিজের পথ খুঁজিতে বলিতেছে। কর্মহীন ধর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে দেখি তাঁহার ঘোর সন্দেহ, মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনার পথ হইল প্রতিদিন ছোট বড় কর্মের মধ্যে মানুষের সেবা করা। তাই কবি প্রার্থনা করিতেছেন—

"করো মোরে সম্মানিত নব বীর বেশে
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।"

এখন হইতেই দেখা যায় স্বদেশের দুঃখে কবির অন্তরে যে বেদনা তাহা দূর করিবার জন্য তিনি কোন পথ বাছিয়া লইয়াছেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমভূমিতে আরও একজন প্রতিভাশালী যুবক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ইনি মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সন্তান এবং বাল্যকাল হইতেই ঠাকুর বংশোচিত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। যুবকের নাম বলেন্দ্রনাথ। ইনি শান্তিনিকেতনে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য যে খসড়া প্রস্তুত করেন তাহাতে

স্পষ্টই লেখা ছিল যে "ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী" অনুসারে কার্য পরিচালিত হইবে। তবে এই কার্যে রবীন্দ্রনাথের কোন যোগ ছিল না। তিনি এই সময়ে শিলাইদহে নিজের সন্তানদের জন্য একটি গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৩০৬ সনে ভাদ্রমাসে বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই কিন্তু কবির মনে তাঁহার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্কল্পটি জাগিয়া রহিল এবং দুই বৎসর পরে তিনি বলেন্দ্রনাথের আরব্ধ কর্ম ব্যাপকতরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন তখন মহর্ষি তাঁহাকে খুবই উৎসাহ দিলেন। বুদ্ধি ও কল্পনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যাহা সত্যরূপে বুঝিতেছিলেন তাহা যাহাতে কর্মের দ্বারা জীবনে প্রকাশ করিতে পারেন তজ্জন্য পিতা পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন।

কবিগুরু এই আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার কর্মের উদ্দেশ্যটি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিতেছেন, "প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যালাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। আমি এ বিষয়ে কখনও কখনও বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতি-মধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না তখন আমার ভাবকে কর্মের আকার দান করবার জন্য নিজেই কৃতসঙ্কল্প হলাম, আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণ-নিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব। * * * আমার মনে হল যে, যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে।"

কিছুকাল পূর্বে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু মহর্ষির নিকটে শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতনের জন্য তোমাদের কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, সেখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং আছেন, সেখানকার কাজ কিছুই হইল না দেখিয়া

মরিলেও জানিব, কাজ হইবেই।" মহর্ষির তিরোধানের পূর্বেই তাঁহার প্রিয় পুত্রের দ্বারাই সে কাজের সূত্রপাত হইল দেখিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্ত হইলেন।

জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তায় এই সময়ে যাঁহারা ভরপুর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি আসিয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন। বিদ্যালয় আরম্ভ হইল। উপাধ্যায় মহাশয়ই ছাত্র ও অধ্যাপক জুটাইয়া আনিলেন এবং এইরূপে তপোবন বসিল। পড়াশুনা, সরল জীবনযাত্রা, গুরুসেবা ও অতিথিসেবার দ্বারা আশ্রমে ছেলেরা বাড়িতে লাগিল। বলেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত "ব্রহ্মবিদ্যালয়" রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের প্রযোজনায় হইল "ব্রহ্মচর্যাশ্রম"। আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে ও রোমান ক্যাথলিক সাধুর পরামর্শে আশ্রম স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল আদি হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রমী আদর্শে। রবীন্দ্রনাথের এই কার্যের রূপ ঠিক মত বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে সেই যুগের কথা। বিদেশী শাসকের সমস্ত হাব-ভাব-ব্যবহার এবং তাহাদের উগ্র শাসনপন্থা এমনই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল যে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বন্ধনদশামুক্ত ভারতের সামাজিক প্রকাশকে হিন্দুধর্মের সহিত এক করিয়াই দেখিতেন। তাঁহাদের বিচারে তখন "হিন্দুধর্ম" অর্থে প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং যদি তাহার প্রতিষ্ঠা হইত তাহা হইলে যে ভারতকে আমরা দেখিতে পাইতাম তাহা হইত "গোরার" প্রথম দিকের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ কিভাবে প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমী তপোবন হইতে আধুনিক ভারতের "মহামানবের সাগর তীরে" উপনীত হইয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইব কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আশ্রম বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম কঠোর ব্রহ্মচর্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত।

ব্রিটিশরাজের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া যখন কোন লাভ হইল না তখন দেখা গেল যে ভিক্ষুকের নৈরাশ্যে দেশের লোক একরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকেই তখন একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার স্রোত বহিতে সুরু করিল এবং প্রাচীনকালের মধ্যে ডুব দিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে আর একবার খাড়া করিবার চেষ্টাও চলিতে লাগিল অনেক দিকে। আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে কবির মনে যে এই চিন্তা একেবারেই ছিল না তাহা বলা চলে না। তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন, "তখন আমার মনে একটি দূর-কালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণ কথায় পড়া যায়

ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার মনে হয়েছে যে তপোবনের শিক্ষা-প্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন প্রকৃতির এই সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। * * * এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস ছিল না। * * * যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে।” তাই দেখিতেছি, প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া যেখানে শিক্ষালাভ করা যায়, এমনই একটি পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে চাহিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু কেবলমাত্র একটা বিজাতীয় “আইডিয়ার” সঙ্গে লড়াইয়ের বাহাদুরী করিবার জন্য কোন মানুষ এত দুঃখ, এত ত্যাগের ভিতর দিয়া, এত দুঃসহ বিরোধ কাটাইয়া চলিতে পারে না। বহুদিন হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে নিজেকে উজাড় করিয়া দিবার জন্য একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। একুশ বৎসর বয়সে সদর স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁহার সহসা এমন এক উপলব্ধি হয় যে তাঁহার মনের ভিতরটা তোলপাড় করিতে থাকে। খুব বড়ো একটা কাজের মধ্যে নিজেকে নিবেদন না করিতে পারিলে যেন তৃপ্তি নাই। এই অনুভূতি সম্বন্ধে তিনি “জীবনস্মৃতি”তে লিখিয়াছেন, “সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে

সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।" এই রাগিনীতেই কবির মনের সুরটি বাঁধা পড়িল চিরদিনের মত। তখন হইতে তাঁহার সমস্ত কর্মেই শুনি সেই একই সঙ্গীত—

"তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যতো দেবো প্রাণ ব'হে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।"

জগতের সেই আনন্দরূপের উপর আর কখনও যবনিকা পড়িয়া যায় নাই, কর্মেরও কোনদিন অবসান হয় নাই।

সেই যে একদিন তিনি গাহিয়াছিলেন,

"আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা"।

তাহাকে সত্য করিয়া তুলিয়াছেন গুরুদেব তাঁহার সমস্ত জীবন দিয়া।

জমিদারীর কার্যে পদ্মানদীর তটে ও বক্ষে শান্তি এবং আনন্দ পাইয়াছিলেন কবি আর তাহার সঙ্গে পাইয়াছিলেন জনগণের সান্নিধ্য। এই দুইয়ে মিলিয়া তাঁহার প্রতিভার দ্বার যেন চারিদিক হইতে খুলিয়া গেল। দেশের অবস্থা দেখিয়া ও জনসাধারণের দুর্দশায় তাঁহার মন করুণায় ভরিয়া উঠিল—তাহাদের অজ্ঞানতার পাষাণ-কারা ভাঙ্গিবার জন্য কাজে নামিলেন কবি। সুন্দরের জন্য, সম্পূর্ণতার জন্য নিজেকে উজাড় করিয়া দিবার জন্য তাঁহার আত্মার আকুলতাই তাঁহাকে একাকী এই বৃহৎ কার্যে প্রেরণা দিল। এই আত্মার

প্রেরণা, এই সুন্দরের উপলব্ধিই তাঁহার সকল কর্মের মূলশক্তি। ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের দেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়াই কেবলমাত্র তাঁহার কর্মের মূলশক্তি ছিল না। কেননা, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বিদেশী শাসন সরিয়া গেলেই যে দেশের মুক্তি হইবে তাহা নহে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা মনের গ্রন্থিমোচন হইলে তবেই দেশ সত্য সত্যই স্বাধীন হইবে।

এই যে কঠিন ব্রত গ্রহণ করিলেন কবি তাহা উদযাপনের জন্য বোলপুরের শান্ত পরিবেশটিকেই মনোনীত করিলেন তিনি। এখানে শান্তি ছিল বটে কিন্তু অরণ্যের নিভৃত ছায়াও ছিল না, শ্যামশস্প স্নিগ্ধ নিবিড়তাও ছিল না কোনদিকে। কবিগুরু তবুও এই রুক্ষ অনুর্বর ক্ষেত্রকেই গ্রহণ করিলেন তাঁহার সাধনভূমিরূপে। যে কঠিন জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাঁহাদের দিন কাটিয়াছে এখানে, মনে হয় ছাত্র ও অধ্যাপকদের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনকই হইয়াছিল। একদিকে যেমন তাঁহাদের শিথিল হইবার কোন অবসর ছিল না অন্যদিকে তেমনি আত্মনির্ভরতার একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টান্ত দেশের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিবার সুযোগ মিলিল। দেশের দুর্দশার দিনে এমন একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টান্তের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল।

এই স্থানটিকে মানুষের বাসযোগ্য করিতে তাঁহাদের কত যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা আজও কেহ ভুলিয়া যান নাই। কবিগুরু যেমন নিজের প্রাণপ্রবাহ ঢালিয়াছেন তাঁহার আশ্রম সৃষ্টিতে, তেমনি সেই সৃষ্টিতে কত অধ্যাপকের আত্মত্যাগ, কত ছাত্র ছাত্রীর অনুরাগ মিশিয়া আছে সে কথা আজ মনে করিবার দিন আসিয়াছে। সেই মরুসদৃশ প্রান্তরপরিবেশকে আশ্রমের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে তাঁহাদের কত স্বপ্ন কত নিষ্ঠা। দিনের পর দিন সেই ক্ষয়িষ্ণু পতিত জমিকে আপনাদের প্রাণ ঢালিয়া নয়নাভিরাম করিয়া তুলিয়াছেন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রাঙ্গণে, ভবনে, তোরণে, কুঞ্জে, বীথিতে বালকেরা সৃষ্টির যে সাধনা দেখিল তাহাই তাহাদের মনকে প্রস্তুত করিল বৃহত্তর সৃষ্টিসাধনার জন্য। এই সকল কার্যের দ্বারা যেমন তাঁহারা সকলে বাঁধা পড়িলেন প্রকৃতির সহিত, তেমনি বাঁধা পড়িলেন পরস্পরের সহিত এক নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে। এখানে এমন একটি সুন্দর সমন্বয়পূর্ণ জীবনের সূত্রপাত হইল যে সেই বিরাট প্রবাহময় জীবনের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষুদ্র জীবনের যেমন স্পন্দন অনুভব করিতে পারিলেন তেমনি প্রাত্যহিক মেলামেশায় পরস্পরের সুখ দুঃখে নিজেদের বিলাইয়া দিতেও

সুযোগ পাইলেন। সহরের বিদ্যালয়ের মত একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এরূপ জীবন রচনা করা তো কোন মতেই সম্ভব হইত না।)

(আজ এই আশ্রম, রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের প্রতিভূস্বরূপে আমাদের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। একদিন প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শে অল্পসংখ্যক অধ্যাপক ও ছাত্র লইয়া, বহু কষ্টে ও দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াও তিনি যে এই কঠিন দায়িত্ব ত্যাগ করেন নাই তাহার কারণ কবির পরিকল্পনাতে ছিল তাঁহার নিজের ও আশ্রমবাসীদিগের ঐকান্তিক বিশ্বাস, নিষ্ঠা, যত্ন ও অনুরাগ। তাঁহারা সর্বস্ব পণ করিয়া নিজেদের বক্ষের ধন রক্ষা করিয়াছেন—তিলে তিলে তাহা গড়িয়া তুলিয়াছেন দিনের পর দিন। এ সকলই সম্ভব হইয়াছিল কেননা একটি গভীর সত্য ছিল এই সকল দৈন্যদশার অন্তরালে। কবির সহিত আশ্রমবাসী বালক-বালিকা, অধ্যাপক, কর্মীবৃন্দ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রাণশক্তির রসসঞ্চারেই মানুষ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধতা কাটাইয়া শান্তিনিকেতন আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে; কেবলমাত্র কবির আত্মত্যাগে নহে।

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম কেবলমাত্র একটি আবাসিক বিদ্যালয় নহে কিন্তু কবির ভাষায় ইহা "একাধারে বিদ্যালয় এবং বহুজনের দ্বারা গঠিত একটি পরিবারময় গৃহ।" সর্বদিক দিয়াই ইহার শুভাশুভে ছাত্রেরা ইহাকে নিজের করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে দেখিতে শিখিবে যাহাতে আশ্রমের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিটিও অনুভব করে আশ্রমের সব সমস্যা তাহার নিজেরই সমস্যা, ইহাই ছিল কবির ইচ্ছা। তিনি বলিতেন, "আশ্রমের দায়িত্ব বহনে তাহাদেরও যে দায়িত্ব আছে একথা মনে করিয়াই তাহারা যাহাতে গৌরব বোধ করে, তাহাই আমাদের দেখা উচিত। তবেই তো এই সঙ্গীত সত্য হইয়া উঠিবে—

"আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন।

* * *

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।"

এই শান্তিনিকেতন হইতেই দেশের মৃতপ্রায় গ্রামগুলি সঞ্জীবনী সুধায় ভরিয়া উঠিয়া আবার প্রাণ পাইবে, নানা বিচিত্র মঙ্গলানুষ্ঠানের দ্বারা যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রকাশিত হইবে, সমস্ত সমাজসাধনার মধ্যে যাহা কল্যাণময়

তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাই কবি আশা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রাণ তাহার গ্রামে। শান্তিনিকেতন আশ্রম তাই গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হইল। এই আশ্রমের ন্যায় উদার মনোভাব লইয়া ভারতের পল্লীগুলি আবার গড়িয়া উঠুক; মানুষের মনের সকল প্রকার সংস্কার ও নিরর্থক আচারের বন্ধন খুলিয়া যাক ইহাই ছিল কবির অন্তরের সাধনা। সেই পুরাতনকালের ন্যায় প্রত্যেক গ্রামে ফিরিয়া আসুক শান্তিময় সচ্ছলতা, আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। গ্রামবাসীদের চেতনাকে যাঁহারা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন, চিত্তকে জড়তা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন নির্জনবাসী, বিরলবসন তপস্বী। কবিগুরু সেই কথা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছেন, "বর্তমানকালে দেশে এই রকম একটি তপস্যার স্থান, এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে এমনতরো আশা আমি করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্ততঃ তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য নানা বিরুদ্ধ ভাবের আন্দোলনের উর্দ্ধে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।"

তপোবনের কল্পনা তাঁহার মনে আরও বেশি করিয়া ভালো লাগিয়াছিল কেননা, সমুদ্রতীরবাসীরা যেমন বাণিজ্য সম্পদে ধনী, মরুভূমির সন্তানেরা দিগ্বিজয়ী, তেমনি ভারতবর্ষের সভ্যতার কেন্দ্রগুলি সহরে নহে, বনে। তপোবনেই বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ উদ্ভূত হইয়াছে এবং এখান হইতেই সেই সভ্যতার প্রবাহ নিখিলের সহিত যোগ স্থাপন করিয়াছে। তাই কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথের মনে তপোবনের কল্পনাই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুরাশ্রমের আদর্শের মত জীবনযাত্রার এমন পূর্ণাদর্শ আর কোথাও নাই। বাল্যে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়া বাড়িয়া উঠা, যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও কর্তব্যসাধন, বার্দ্ধক্যে শরীরের ও মনের শক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মলোকের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া এবং তাহার পরে পরলোকে প্রয়াণ—জীবনকে ক্রমে ক্রমে নির্বাণের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাওয়ার মত এমন আদর্শ আর কোন দেশে আছে? তাই দেখি অন্তরের এই ভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

যাহাই হউক, এই তপোবন রচনার সঙ্কল্পটি যতদিন কল্পনার মধ্যে

ছিল ততদিন তাহা বড়ই আশ্চর্য, বড়ই রমণীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু কার্যত: দেখা গেল যে এই তপোবন রচনায় বহু বাধা, বহু বিপত্তি। একদিকে রাজশক্তি অন্যদিকে দেশের বিরোধীদলের ক্রমাগত আক্রমণে কবি জর্জরিত হইতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার আর্থিক অবস্থাও তখন এই গুরুভার গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিল না। কাজেই আত্মীয় স্বজনেরাও তাঁহার এই অদ্ভুত খেয়ালের কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া বিরূপ হইলেন। কিন্তু কবিগুরু নিরাসক্ত চিত্তে, নিস্কাম কর্মের দ্বারা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন। যে আত্মার বেদনা তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া কাজে নামাইয়াছিল সেই বেদনাই তাঁহার প্রাণশক্তিকে উজাড় করিতে প্রেরণা দিল তাঁহার শান্তিনিকেতন-আশ্রমের রূপায়ণে। এইরূপে ভাবের দিক্ হইতে আশ্রম ও রূপের দিক হইতে বিদ্যালয় গড়িয়া রবীন্দ্রনাথ ভাব হইতে রূপে ও রূপ হইতে ভাবের মধ্যে বাধাহীন চলাচলের ব্যবস্থা করিলেন।)

সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আশ্রম পরিবেশে শিশু মানুষ হইলে সে কিভাবে সমাজ জীবনের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে এ প্রশ্ন তখন অনেকেরই মনে জাগিতেছে। কবির প্রতিভা ও সৃষ্টিধর্মী মনের উপরে যাঁহাদের আস্থা ছিল তাঁহারাও যে একথা একেবারে ভাবেন নাই তাহাও বলা যায় না। "রাজর্ষি" উপন্যাসে দেখি তরুণ লেখক বিল্বনের মুখে কবি নিজেই এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "বনে কি কখনো মানুষ গড়া যায়? বনে কেবল একটা উদ্ভিদ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্যসমাজেই গঠিত হয়।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রম বনে প্রতিষ্ঠিত করিলেও তাহা আরণ্য ছিল না, কাজেই "মানুষগড়ার" কাজ যে সেখানে ভালোই হইয়াছে, একথা জোরের সঙ্গেই বলা চলে। কেহ কেহ আবার কবির আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে তাঁহার শৌখিন কল্পনাবিলাস বলিয়াও পরিহাস করিয়াছিলেন। কবি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে একথা স্বীকার করিতে পারি না।"

এমনতর অপবাদ আরও কোন কোন মহলে প্রচারিত হইয়াছিল যে পাছে দেশের নানা ঝঞ্চাটে কবি জড়াইয়া পড়েন এই ভয়ে দূরে নিভৃতির মধ্যে একটি বন্দর গড়িয়া তাহার মধ্যে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের মধ্যে যথেষ্ট সাহস নাই, ভরসা নাই, প্রাণ তাঁহার এতই

ক্ষীণ যে শান্তিনিকেতনে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিয়া তিনি বাস্তব জগৎ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কেহ বা বলিলেন যে ইহা এক রকমের শৌখিন ধর্মসাধনা, আবার কেহ বা বলিলেন, "ইহা হইল কবির ভাবের ইন্দ্রপুরী বা ইউটোপিয়া, মর্ত্যলোকে যে-সকল ভাবুক ইন্দ্রপুরী রচনা করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন কবিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। আধুনিক কালের সহিত না চলিয়া প্রাচীনকালের একটা তপোবনের আদর্শ আধুনিক কালের মধ্যে জোর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা বাতুলতামাত্র।" এইভাবে কেহ কবিকেই সমালোচনা করিলেন কঠোরভাবে, কেহ বা তাঁহার সাধনাকে। তপোবনের আদর্শে বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে কবির কি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল তাহা সমালোচকেরা একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না।

গোরা উপন্যাসে একবার বিনয়ের মুখে কবি নিজের বক্তব্য যাহা তাহা বলিয়াছেন পাঠকসমাজকে। পরেশবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভারতবর্ষকে যে আমি জানি তা বলতে পারি নে এবং ভারতবর্ষ যে কী চেয়েছিলেন এবং কোনদিন তা পেয়েছিলেন কিনা তা আমি নিশ্চয় জানিনে কিন্তু যেদিন চলে গেছে সেই দিনে কী কখনো ফিরে যাওয়া যায়? বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়, অতীতের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলে কি কোনো কাজ হবে?

বিনয়— * * গোরা বলে যে অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে বসে আছি বলেই কি সে অতীত? বর্তমান হাঁকডাকের আড়ালে পড়ে সে আমাদের দৃষ্টির অতীত হয়েছে বলেই অতীত নয়—সে ভারতবর্ষের মজ্জার মধ্যে রয়েছে। কোন সত্য কোনোদিনই অতীত হতে পারে না। সেইজন্যই ভারতবর্ষের এই সত্য আমাদের আঘাত করতে আরম্ভ করেছে। একদিন একে যদি আমাদের একজনও সত্য বলে চিনতে ও গ্রহণ করতে পারে তাহলেই আমাদের শক্তির খনির দ্বারে প্রবেশের পথ খুলে যাবে—অতীতের ভাণ্ডার বর্তমানের সামগ্রী হয়ে উঠবে। আপনি কি মনে করছেন ভারতবর্ষের কোথাও সে রকম সার্থকজন্মা লোকের আবির্ভাব হয় নি?

সুচরিতা—আপনি যে রকম করে এ-সব কথা বলছেন ঠিক সাধারণ লোকে এ রকম করে বলে না—সেইজন্য আপনাদের মতকে সমস্ত দেশের জিনিস বলে ধরে নিতে সংশয় হয়।

বিনয়—দেখুন সূর্যের উদয় ব্যাপারটাকে শিক্ষিত লোকে এক রকম

করে ব্যাখ্যা করে আবার সাধারণ লোকে আর এক রকম করে ব্যাখ্যা করে তাতে সূর্যের উদয়ের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি করে না। তবে কিনা সত্যকে ঠিক মতো করে জানার দরুন আমাদের একটা লাভ আছে। দেশের যে-সকল সত্যকে আমরা খণ্ডিত করে বিক্ষিপ্ত করে দেখি গোরা তার সমস্তকে এক করে সংশ্লিষ্ট করে দেখতে পায়, গোরার সেই আশ্চর্য ক্ষমতা আছে সেইজন্যই কি গোরার সেই দেখাকে দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে করবেন? আর যারা ভেঙ্গে চুরে দেখে তাদের দেখাটাই সত্য?"

এইভাবে আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রম সম্বন্ধে সমালোচনা ও নানা তর্ক বিতর্কের যথাযথ উত্তর দিয়াছেন এবং কেবল তাহাই নহে তাঁহার মনের স্বাতন্ত্র্যবলে বেগবতী প্রেরণার দ্বারা সমস্ত কার্যেই একটি আশ্চর্য পরিণতিও দেখাইয়াছেন। প্রথমেই তিনি বলিলেন, রুশোর ন্যায় তিনি সমাজকে কলুষিত মনে করিয়া মানুষের শিক্ষার জন্য কেবলমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে বলেন না বটে, কিন্তু মানুষকে বেষ্টন করিয়া যে জগৎ-প্রকৃতি আছে তাহা যে অতি অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা ও সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে তাহাই বা কেমন করিয়া অস্বীকার করা যায়? কাজেই শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া যেমন মানুষের শিক্ষা হয় না তেমনি মানুষের লোকালয় যদি একান্ত মানবময় হইয়া উঠে, তাহার ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায় তবে মানুষের চিন্তা ও কর্ম যে কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া উঠিবে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

একথা সত্য বটে, বর্তমান সভ্যতা শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতা এবং সহরেই এ সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র, কাজেই শিশুকে যদি সভ্যসমাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় তবে তাহার শিক্ষা বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাকে ভারতীয় সভ্যতার অকৃত্রিম উপাদান বলিয়া মনে করেন নাই বটে, কিন্তু যে শিল্প-বিপ্লবের তরঙ্গ ভারতের তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাকেও তিনি অস্বীকার করেন নাই। সেইজন্য য়ুরোপে যেমন তাহাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের কোন বিরোধ নাই, তাহাদের সমাজের মধ্যে যে-সকল চেষ্টা ও চিন্তা জাগিতেছে বিদ্যালয়ে তাহা স্থান পাইয়া বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থিগণকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে তদ্রূপ শান্তিনিকেতনেও একটি শিল্পকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আমরা এখানে দেখি জাবন আর

শিল্পের অপূর্ব সমন্বয়। শিল্প এখানে শৌখিন বিলাসিতামাত্র নহে, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্ত পোষাকী বস্ত্র নহে কিম্বা যন্ত্রের অনুসরণমাত্র নহে, এখানে জীবনই শিল্প, শিল্পই জীবন। এই শিল্প অন্ধ অনুকরণমাত্র হইবে না কিন্তু দেশের ভাবে রসে চিন্তায় পূর্ণ হইয়া হৃৎপিণ্ডের মত সমস্ত সমাজের মর্মস্থানে বসিয়া প্রাণকে শোধন, পরিচালনা ও রক্ষা করিবে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশা। তাই তিনি শিল্প ও জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই এক অপূর্ব রসায়নে দুইটিকে মিশাইয়া জীবনকে সার্থক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ শহরে জনতার অভাব নাই বটে কিন্তু সেই জনতার সহিত সত্যকার যোগ আছে কয়জনের? কবি বলেন, "সেই জনতা এক হিসাবে ছায়াবাজির মত। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত-জনতা-সমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক একটি রবিনসন ক্রুশোর মতো আপনার প্রাইভেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এত বড়ো নির্জনতা আর কোথায় পাওয়া যাইবে?" তাই তিনি বলিতেছেন শহরের মধ্যে বাস করিয়া আমরা যে সত্যসত্যই সামাজিক গুণগুলি অর্জন করিয়া প্রকৃত নাগরিক হইতে পারি তাহারই বা সুযোগ কোথায়? কিন্তু আশ্রম পরিবেশে এক মানুষ অন্য মানুষ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করিয়া রাখিতে পারে না কেননা, "একশো দুশো মানুষকে এক আশ্রমে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জনবাস বলা চলে না। এই যে একশো দুশো মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে, ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গে লইলাম, আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম এমনটি হইবার যো নাই; এই একশো দুশো মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে, ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা?"

অনেকে আবার এরূপ কথাও বলিয়াছেন যে সংসারে চারিদিকেই ভালো-মন্দের তরঙ্গ উঠা-পড়া করিতেছে। সেই সংসারের মধ্যেই সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়াই তো ভালো। "কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ—আর বারবার অতি যত্নে চোলাই করিয়া

ওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিষ।" আশ্রম পরিবেশের সমাজে সকলে ভালোটিকেই প্রবর্তন করেন এবং মন্দটিকে উপেক্ষা করার দরুন তাহা বালকবালিকাদিগের নিকটে অচেনা থাকিয়া যায়, ফলে তাহারা সংসারের উপযুক্ত হইয়া বড় হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নেরও বেশ যথাযথ উত্তর দিয়া লিখিতেছেন, "আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না, সে দিব্য ভদ্রলোকের মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহাকে তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না, কারণ ভালো মন্দ সেখানে একপ্রকার আপোষ করিয়া মিলিয়া মিশিয়াই থাকে। এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব বড়ো করিয়া দেখা দেয়।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে সাধারণ স্থূল সমাজের সহিত "আশ্রম সমাজের" বহুবিধ ঐক্য যেমন আছে তেমনি উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যও আছে। যেখানে তাহার সূক্ষ্ম ব্যবধান সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। এবং সেই সূক্ষ্ম স্থানেই "আশ্রম সমাজের" আদর্শ বিরাজ করিতেছে। এই আদর্শ বাসনার দিকে নহে কিন্তু সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। তাই "এই আশ্রম যদি বা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে; সে আপনাকে যদি বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইয়া যাইতেছে; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের ঊর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।"

মানুষ সমাজের উপযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তাহাকে সাধনার দ্বারা নিজের বাসনাকে খর্ব করিয়া স্বার্থকে বলি দিয়া সমাজের উপযুক্ত হইতে হয়। এই সাধনার জন্য শিশুর গৃহই হইল সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে এইরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে তাঁহার নিজের জীবনে। নিজের সন্তানদের তিনি কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া "গৃহ বিদ্যালয়ে" শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে তিনি একথাও বলিয়াছেন, "শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে যে দূরে পাঠানো উচিত

নহে—একথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়।” কিন্তু এইরূপ গৃহ রচনা করা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই তো মানুষ পৃথিবীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। গৃহের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের প্রভাব আছে তাহা শিশুর মনোবিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুকূল নহে বলিয়াই সমাজে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে। মানবশিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য এই যে বিদ্যালয়—তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু তাহা যে একটি কৃত্রিম সমাজ তাহা তো অস্বীকার করা চলে না। বিদ্যালয়ের কৃত্রিমতা যে কতদূর পীড়াদায়ক হইতে পারে তাহার বর্ণনা কবির নানা রচনাতেই দেখিতে পাই। বালকদের গৃহ হইতে দূরে পাঠানো যে কতদূর অস্বাভাবিক তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি, “আমাদের গৃহ এক জায়গায়, বিদ্যালয় আর এক জায়গায়। প্রয়োজনের খাতিরে গৃহের সঙ্গে শিক্ষার এই বিচ্ছেদ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে মস্ত একটা দুঃখ আছে। সুতরাং এই বিধানকে কোনো-মতেই আমরা চরম বলে স্বীকার করে নিতে পারি নে। আমাদের বলতেই হবে যে শিশুশিক্ষার সমস্যা মানুষের মধ্যে ঠিকমতো সমাধান করা হয় নাই। তাই স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধে আমাদের যেতে হয়েছে। পাখীর ছানা নীড়ের মধ্যে পক্ষিমাতার কাছেই তার প্রথম শিক্ষা পায়। সেই শিক্ষায় তার আনন্দ। মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়। সেই কান্নায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার একটা নিরন্তর প্রতিবাদ রয়েছে।”

এই একই যুক্তির সুর শুনিতে পাই আমরা—শিক্ষাবিদ্ স্যার পারসি ন্যান ও জন ডিউয়ির উক্তির মধ্যে। (১) বিদ্যালয় যে একটি কৃত্রিম সমাজ এ সম্বন্ধে কেহই দ্বিমত নহেন। ডিউয়ি বলেন, বিদ্যালয়ের দ্বারা সমাজের উদ্দেশ্য উপযুক্ত ও সম্পূর্ণরূপে সাধন করিতে হইলে বিদ্যালয়-পরিবেশটি ভালোবাসা, স্নেহ ও সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। গৃহের প্রাত্যহিক প্রয়োজন, সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয় এখানে জাগিয়া থাকিবে অর্থাৎ বিদ্যালয়কে সমাজের নিকটে আনিতে হইবে। পুঁথির শিক্ষাদানের সহিত বালকদের হৃদয়

(১) "The school must be a society; it must be a society of special character. It must be a natural society in the sense that there should be no violent break between the conditions of life within and without it. * * But on the other hand it must be an artificial society in the sense that while it should reflect the outer world truly, it should reflect only what is best and most vital there." Percy Nunn—Education, its data and first principles. P. 250.

ও মনকে গড়িয়া তুলিবার ভারও বিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইবে এবং কবিগুরু বলিতেছেন যে আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রিগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না কিন্তু তাহারা নানা প্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্ব ও সেবার দ্বারা প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার সাহায্যে আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবে। এইভাবে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা ক্রমে ক্রমে দূরে যাইবে।

বালক-বালিকাগণ যাহাতে নানাভাবে সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের স্বাদ পায় সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই সচেতন থাকিতেন। আশ্রম-বালকেরা গুরুগৃহে অবাধে যাতায়াত করিত এবং গুরুপত্নীদিগের নিকটে সন্তানের ন্যায় স্নেহ যত্ন পাইত। এখানে সহশিক্ষার যে প্রচলন হইয়াছিল তাহাও তপোবনের আদর্শেই, কেননা বিদ্যালয়কে সমাজের নিকটে আনিতে হইলে সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশটিও বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করিতে হইবে। কাজেই আশ্রমের শিক্ষা কোন জাতিতে, ধর্মে বা কেবল পুরুষের মধ্যে আবদ্ধ রহিল না। স্ত্রী-পুরুষের সহশিক্ষা যথার্থভাবে সার্থক হইল উৎসবে, অনুষ্ঠানে, ক্রীড়ায়, কর্মে, শ্রেণীকক্ষে ও বনভোজনে।

এ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, "পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী, বালক-বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু ও জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধে ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়।" বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার তিনি চিরকালই স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার আশ্রমে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ণ সুযোগও দিয়াছেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমাজের রীতি ও প্রয়োজনে স্ত্রী ও পুরুষকে কোন কোন বিষয় পৃথকভাবে শিখিতে হইবে তাহাও তিনি অস্বীকার করেন নাই। প্রাচীন ভারতে তপোবনেও তো তেমনই ব্যবস্থা ছিল। "আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে এবং বালিকারা গো-দোহন কার্য সারিয়া কুটির প্রাঙ্গণে গৃহকার্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।"

কবি তাঁহার বিদ্যালয়টি আবাসিক করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বোর্ডিং স্কুল বলিতে ব্যারাক, হাঁসপাতাল, জেল বা পাগলাগারদের মত যে ছবিটি মনে

জাগিয়া উঠে ইহা তাহা ছিল না। বোর্ডিং স্কুল য়ুরোপের আমদানী—সেখানে গৃহ হইতে বিদ্যালয় বিচ্ছিন্ন, গুরুশিষ্যের মধ্যেও আছে বিরাট দূরত্ব। কিন্তু আশ্রম ভারতের নিজস্ব, এখানকার শিক্ষাদান চলে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায়, গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে য়ুরোপকে নকল করা যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাচীনকে পূর্ণমাত্রায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে তাহাও একটা নকল হইবে মাত্র। অতএব বর্ত্তমানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষা দিলেই শিক্ষা সার্থক হইবে। বিশেষ একটি কক্ষের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা বাস করিলেই যে বিদ্যাশিক্ষাটা সমাধান হইবে এই ধারণা দূর করিতে হইবে। তাই বলিয়া বোর্ডিং স্কুল বানাইলেও যে সমস্যা দূর হইবে এমনও নহে। তিনি বলিতেছেন, "নীতি উপদেশের দ্বারা জীবন গড়া যায় না—চর্যার দ্বারা চরিত্র গড়িতে হয় এবং গুরু ও শিষ্য একই স্থানে সাধনার আসন পাতিয়া জ্ঞানচর্চা ও জীবনচর্যা করিবেন তবেই ঘর ও বিদ্যালয়ের বিচ্ছেদ দূর হইয়া তাহা আশ্রমের রূপ লইবে।"

মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার ও মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা—এগুলি কম ক্ষমতা নহে। এই আশ্রম-জীবনের উপরে কবির যে গভীর আস্থা ছিল তাহার প্রমাণ পাই যখন দেখি তিনি নিজের সন্তানদেরও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত একত্রে একই বাসস্থানে অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার রচনাতে পড়ি, "উঁচুদরের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় খুলি নাই। এমন জায়গায় সুখী লোকের ছেলের স্থান নাই। * * রথীও এখানকার মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে। মেয়ে ইস্কুলে মীরাও সকলের সঙ্গে একত্র খায়—থাকে। নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাহিরের লোকের কোন পার্থক্য রাখি নাই।"

কবির আশ্রম-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আরও একটি সমালোচনা শুনা গিয়াছিল যাহা সত্যই নূতন ও চমকপ্রদ। চট্টগ্রাম হইতে কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত "ভাণ্ডার" পত্রিকায় কবির জাতীয় শিক্ষার যে আদর্শ—সে সম্বন্ধে লিখিলেন, "আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবানুযায়ী শিক্ষাদানপ্রণালী পরিবর্তন করিলে তেমন সার্বজনীন সাম্যভাব রক্ষা হইতে পারিবে কিনা তদ্বিষয়ে সংশয় আছে। আশা ছিল তাঁহার প্রবন্ধে হিন্দু-

মুসলমান বালক-বৃন্দের শিক্ষায় একটি সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। দুঃখের বিষয়, আমাদের সে আশা তেমনভাবে পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার অভীপ্সিত ব্যবস্থা কেবলমাত্র হিন্দুসন্তানগণেরই জন্য সর্বাংশে উপযোগী ও কল্যাণকর হইলেও হইতে পারে।"

এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম যুগে বোধ হয় তেমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রগতিপরায়ণ মন বিদ্যালয়কে এই খর্বতার মধ্যে আবদ্ধ রাখে নাই ইহাও আমরা জানি। কিছুদিন পরেই তিনি অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে এই আদর্শ কেবলমাত্র ভারতীয় বা হিন্দুদের জন্য নহে, "ইহাই একমাত্র সভ্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষের পক্ষে মঙ্গলের হেতু।" এই উক্তি তিনি সত্য করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সাধনার দ্বারা। তাঁহার শেষ বয়সে আশ্রমে দেখি সব মানুষই এখানে সম্মানিত, মনুষ্যত্বই পরস্পরের মিলনক্ষেত্রের উপাদান—স্বাভাবিক মনুষ্যধর্মে জ্ঞানী, কর্মী, ছাত্র, ছাত্রী, অতিথি-পরিজন সকলেই অতি সহজ-ভাবেই গৃহীত ও মিলিত।

আশ্রমের পরিণতির দিনে এই বিশ্বমানবতা-বোধ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিলেও, আশ্রমের প্রথম দিকে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় জাতিবিচার দূর করা সম্ভব হয় নাই। "শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" পুস্তিকায় পড়ি রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "রন্ধন-শালায় বা আহার-স্থানে হিন্দু-আচার-বিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।" ১৩২১ সনে গান্ধীজি যখন বোলপুরে আসেন তখন কবির সহিত আশ্রম-সংস্কার সম্বন্ধে নানা কথা হয়। শান্তিনিকেতনের পাকশালায় ও ভোজনগৃহে তখন পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের জাতিবিচার মানিয়া চলা হইত; ইহা মহাত্মাজীর ভালো লাগে নাই। আশ্রমের সকলে সমানভাবে থাকিবে, আহারে বিহারে অশনে বসনে কোন পার্থক্য থাকিবে না ইহাই মহাত্মাজীর অভিমত। তিনি বলিলেন ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা পৃথক পংক্তিতে ভোজন করিবে এ কেমন কথা? ইহা তো আশ্রম-ধর্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার! রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলেন যে তিনি কোনদিন ছাত্রদের ধর্ম বা সমাজের বিশেষ কোন মত লইয়া নির্দেশ দেন নাই। এসকল সম্বন্ধে তিনি বল প্রয়োগ করাও পছন্দ করিতেন না, কেননা তাহাতে বালকেরা বা কর্মিগণ আপাতদৃষ্টিতে নিয়ম

পালন করিবে বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী ও আন্তরিকভাবে ফলপ্রসূ হইবে কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য, গান্ধীজি কবির এই মতবাদ গ্রহণ করেন নাই।

এ কথাও আমরা জানি যে গান্ধীজি আশ্রমে আসিবার কিছুদিন পূর্বে আশ্রমে একটি মুসলমান ছাত্র পড়িতে আসিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। ছাত্রটি মুসলমান বংশজাত হইলেও ব্রাহ্ম, আগরতলার ডাক্তার কাজি সাহেবের পুত্র রবীন্দ্র কাজি। ছাত্রাবাসে অহিন্দুদের প্রবেশের সম্ভাবনায় নানা সমস্যা ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল এবং এই ভাবী ছাত্রটি কোথায় খাইবে, পংক্তিতে বসিবে কিনা, পাচকেরা পরিবেশন করিবে কিনা, এইরূপ অসংখ্য সামান্য ও তুচ্ছ প্রশ্নে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল— কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া গেল না। প্রাচীনকালে গৌতমের আশ্রমে ভর্তৃহীনা জবালার সন্তান সত্যকাম স্থান পাইয়াছিলেন কিন্তু শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বালক রবীন্দ্র কাজি স্থান পাইলেন না। কবির আদর্শ শান্তি-নিকেতনের আশ্রমবাসিগণ কিছুতেই মানিয়া লইলেন না—কবিও জোর করিয়া কিছু করিবেন না ইহাই ছিল তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত।

মহাত্মাজী যখন আশ্রমে বাস করিতেছিলেন তখন সৈয়কত আলি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। সৈয়কত আলি "খিলাফৎ" আন্দোলনের কাজে বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার শান্তিনিকেতনে আসা আশ্রমের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এতদিন এখানে মুসলমানদের সম্বন্ধে যে গোঁড়ামী ছিল তাহা সেদিন রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় স্বয়ং সৈয়কত আলিকে সাধারণ ভোজনাগারে লইয়া আহার-স্থানে বসাইলেন। সাময়িক উত্তেজনায় সহসা কি অসম্ভবই না সম্ভব হইল! তবে এই ঘটনাতে যে সত্যকার মনের মুক্তি আসে নাই, কবি ইহা অতি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মানুষের মনের মুক্তি না হইলে যে স্বাধীনতা লাভের পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে না ইহাও ক্রমে ক্রমে তিনি পুরামাত্রায় বুঝিতে পারিতেছিলেন। তিনি লিখিলেন, "মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবে মানুষের এতকালের চেষ্টা সার্থক হইবে, নহিলে ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্।"

এই সময় হইতে তিনি মিলনমূলক বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের কাজে মন দিলেন। ইহাই হইল তাঁহার বিশ্বভারতীর প্রথম সোপান। অনেকদিন

হইতেই কবির মন স্বাদেশিকতার গণ্ডি ছাড়াইয়া বাহিরে আসিতেছিল। ১৯১৯ সালে দেশের প্রভূত রাজনৈতিক সমস্যার মুখে রবীন্দ্রনাথ ভারতের চিরন্তন মৈত্রীর বাণী ঘোষণা করিলেন। উন্মত্ত জাতিপ্রেমের ফলাফল দেখিয়া তিনি মর্মাহত হইলেন এবং "ন্যাশনালিজম" নামক বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিলেন। তিনি কেবল সমালোচনা করিয়াই নিজ কর্তব্য ও দায়িত্বকে পাশ কাটাইয়া গেলেন না, কিম্বা কেবলমাত্র পথনির্দেশ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না কিন্তু পথ উন্মোচন করিয়া পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য অনুসন্ধানের পথিক হইলেন—সঙ্গে চলিবার জন্য আহ্বান করিলেন ভারতবাসীকে, সাদর আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা জানাইলেন বিদেশীকে।

ক্রমে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বাংলার বাহির হইতে ছাত্র আসিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার আশ্রম যে উহার বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র সীমানা ছাড়াইয়া বাহিরের ছাত্রদের আহ্বান করিতে পারিয়াছে ইহাতে কবি খুব খুসী হইলেন। ১৯১৬ সালে শিকাগো হইতে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ২৮শে তারিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে—তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" তাঁহার এই অনেক দিনের ইচ্ছা এখন সফল হইবার পথে—ইহাতে কবি নূতন করিয়া শিক্ষাদানকার্যে প্রেরণা পাইলেন। তিনি আশ্রমবাসী সকলকে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজকে বিশ্বধর্ম ও বিশ্বসমাজের পটভূমিতে দেখিতে নানাভাবে সাহায্য করিলেন, বলিলেন, তপোবনে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের যে একাত্মতা ছিল তাহা যেন শান্তি-নিকেতনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। যে মন্ত্র প্রাচীন ভারতে ঋষিদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা আশ্রমবাসীদের কণ্ঠে আর একবার ধ্বনিয়া উঠুক।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

অগ্নিতে জলেতে বিশ্বভুবনে যিনি অনুপ্রবিষ্ট, ওষধিতে বনস্পতিতে যিনি, তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

এইভাবে তিনি বিশ্বকে শুনাইলেন যে সকল সমাজের, সকল দেশের, সকল মনুষ্যের কাছে যাহা সর্বোচ্চ সত্য বলিয়া হৃদয়ে অনুভূত হইয়াছে তাহাই তাঁহার আশ্রমে স্থান পাইবে। এবং তাঁহার শেষ বয়সে তিনি তদগতচিত্তে

সাধনা করিলেন যাহাতে পরিপূর্ণ শতদলের ন্যায় এই বিশ্বমানবতাবোধ তাঁহার আশ্রমে ফুটিয়া উঠে। তাই দেখিতেছি আশ্রমের যে চিত্র ছিল অস্পষ্ট সাধারণ লোকের মনে, কবির অনন্যসাধারণ মনে তাহা অচিরেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রচণ্ড গতিশীল মন জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রশস্ত হইয়া সম্মুখে চলিয়াছিল যেমন চলে নদী সাগরের অভিমুখে। অন্তরের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে যে অসংখ্য ভাবস্রোত ও সংস্কৃতির ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল তাহা বাংলাদেশের অনেকেই সে সময় ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই, কাজেই কবির সৃষ্টি-কর্মে তাঁহারা নানা অসঙ্গতি দেখিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ বুঝিতেছি যে এই পথে কবির প্রতিভা যথার্থ পরিণতি লাভ করিয়াছে, নিন্দুকের মুখর নিন্দা, সমালোচকের তীব্র সমালোচনা কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই।

একদিন কবি বলিয়াছিলেন, "পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু আজ চারিদিকে বিভীষিকাময় রাজনীতি ছাড়া কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সাক্ষাৎকার পূর্ব ও পশ্চিমের উভয়ের পক্ষেই প্রচণ্ড বোঝার মতো হইয়াছে। এই মিলনের মধ্যে মহা ভবিষ্যতের বীজ সুপ্ত—এই কথা যখন অন্তরে অনুভব করি, তখন প্রত্যক্ষ বর্তমানের মর্মন্তুদ মনোবিকার হইতে নিরাসক্ত মনকে ফিরাইয়া পাই। আমরা ভারতীয় আত্মিক সাধনা হইতে এইটি জানিতে পারিয়াছি যে দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতম্ প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব ও পশ্চিমের দ্বৈতভাবের মধ্যেও এই ঐক্য, এই অদ্বৈতম্ রহিয়াছে। সুতরাং পরস্পরের মিলনে উভয়েই একদা সার্থক হইবে।" আজ রাজনৈতিকগণের মুখে কি এই একই কথা শুনিতেছি না? তাই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ ক্রান্তদর্শী কবি।

কবিগুরু আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার আশ্রমে সকল সংশয়ের সমাধান হইবে। ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। বিদেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে তত্ত্ববিদ্যার সমন্বয়দৃষ্টি লাভের জন্য সাধনা করিতেছেন তাহাতে এদেশের বৈজ্ঞানিকগণের সর্বপ্রকারে যোগ ও সহায়তা থাকিবে এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধানের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে তাঁহার বিশ্বভারতী আশ্রমে। আশ্রমের যজ্ঞক্ষেত্রে দেশ বিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় আহৃত হইবে, যাহা বিরুদ্ধ তাহা মিলিত হইবে, যাহা বিচিত্র তাহা ঐক্য লাভ করিবে। বিশ্বকলার নিগূঢ় তত্ত্ব সাহিত্য, সঙ্গীত,

নৃত্য, নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার মাধ্যমে বিকশিত হইয়া বিশ্বভারতীর সাধনভূমিতে নূতন পরিচয়ে দেখা দিবে। কবি পথ কাটিয়া গিয়াছেন—সেই পথে চলিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন দেশ বিদেশের তাপসবর্গকে, বলিয়াছেন, "আয়ন্তু সর্বঃ স্বাহা।"

একদা দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব দেখিয়া তাঁহার কবিমন ব্যথিত হইয়াছিল। শিক্ষার দ্বারা মানুষের আত্মমর্যাদা জাগাইবার জন্য কবি ভারতবর্ষের চতুরাশ্রমের আদর্শে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রথমে ইহার পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ, ক্ষেত্র ছিল সীমায়িত। কিন্তু মহর্ষির বাণী সত্য করিয়া সেই পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে বিশ্বের প্রান্তসীমায়। বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়া ধ্বনিত হইয়াছে, "ভারতবর্ষের যাহা সত্য সম্পদ তাহা নষ্ট হয় নাই। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হইতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের।"

দেশের মহা দুর্দিনে আমরা মুখ্য জিনিষটাকে হারাইয়া গৌণ জঞ্জাল কোলে করিয়া বসিয়াছিলাম। সেই বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার জন্য কবি প্রাচীন ভারতের যাহা নিত্য পদার্থ, যাহা শাশ্বত তাহাই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন আমাদেয় অনুকরণ-অন্ধ চক্ষের সম্মুখে। তাঁহার এই প্রচেষ্টা অতীতকালের মধ্যে পলায়নের চেষ্টা নহে—কাপুরুষের বাঁচিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়মাত্র নহে—যাঁহারা একথা বলিবেন তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা কবিকে বুঝিতে পারেন নাই। তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি নূতনভাবে পরিবেশন করিয়াছেন আমাদের কাছে। গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবার দায় আমাদের।

আশ্রমের ইতিহাস ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস। কবিগুরুর সৃষ্টিকর্মে কত বাধা, কত বিপর্যয় আসিয়াছে তবুও তাঁহার সৃষ্টির অখণ্ডতা কেহ নষ্ট করিতে পারে নাই—পরিপূর্ণ মঙ্গলের আদর্শ কি কখনও নষ্ট হইতে পারে? তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ, জীবনের সমস্ত সাধনা বিগলিত হইয়া শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই তাঁহার দেশমাতৃকার পদে আত্মনিবেদন।

॥ ৩ ॥

গুরু

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাহাতে গুরু আপনার চিত্তের গতিবেগে শিষ্যের চিত্তে গতি সঞ্চার করিতে পারেন সেইজন্য গুরুর নিকটে শিষ্যেরা সমবেত হইবে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিলাষ। শিষ্যের মনুষ্যত্ব উদ্বোধন করাই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়া তাহা উদ্বোধিত করা কোনমতেই সম্ভব নহে। নিজের জীবনকে জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপে শিষ্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে, স্নেহের দ্বারা তাহার হৃদয়কে অভিষিক্ত করিতে হইবে তবেই তাহার মনে শিক্ষার বীজ বপন করা সম্ভব হইবে। শিষ্যকে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্যে অগ্রসর করাইয়া দেওয়া গুরুর দায়িত্ব। সেই লক্ষ্য কি? রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।" এই শিক্ষা কি ইস্কুল মাষ্টার দিতে পারেন? কবিগুরু বলিতেছেন, "শিক্ষক তো কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জুটে কিন্তু গুরু তো ফরমায়েস দিলেই পাওয়া যায় না। যিনি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, সৌজন্য, সরলতা, নিরাড়ম্বরতা ও শিষ্যের প্রতি অকৃত্রিম হৃদ্যতার পরিচয় দেন তিনিই প্রকৃত গুরু। এই যে গুরু তিনি যন্ত্রমাত্র নহেন তিনি মানুষ। যাহাতে শিষ্য জগতকে জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে ও আনন্দরূপে উপলব্ধি করিতে পারে আদর্শগুরু নিজের জীবন দ্বারা তাহার নির্দেশ দিবেন। তাঁহার অব্যবহিত সঙ্গ হইতে শিষ্য প্রেরণা পাইবে, তাঁহার কর্মানুষ্ঠানে শিষ্য যোগ দিয়া নিজের চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করিবে, ইহাই আশ্রমগুরুর দান।

শিষ্যকে গুরুর এই যে সঙ্গদান, ইহাই শিক্ষার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান—এই উপাদান অধ্যাপনার বিষয়, পদ্ধতি ও উপকরণ হইতেও প্রয়োজনীয় এমন কি, অনেক ঊর্দ্ধে কেননা, পরস্পরের সঙ্গলাভে শিষ্য যেমন গুরুর জ্ঞানতপস্যার অংশী হইবে তেমনি গুরু পাইবেন শিষ্যের অন্তরের সন্ধান।

তাহার অন্তরের সন্দেহ নিরসন করিয়া গুরু তাহাকে সত্যের আলোকে পথ দেখাইয়া চালনা করিবেন তাহার জীবন পথে। তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনে প্রবৃত্ত। এই লক্ষ্যে পৌছাইতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ-গুরু যে তপস্যা করিতেছেন—সেই তপস্যার গতিমান ধারায় তিনি তাঁহার শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করিয়া তুলিবেন। তাঁহার মন যেমন প্রতি মুহূর্তে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকিবে—প্রতি মুহূর্তেই শিষ্য যদি তাহা গ্রহণ করিতে পারে তবে ইহা অপেক্ষা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান আর কি হইতে পারে? এই অব্যবহিত সঙ্গদানের জন্যই গুরু আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া গুরু ও শিষ্য একত্রে মনুষ্যত্বলাভের সাধনা করিবেন—ইহাই হইল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য।

এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে যাঁহারা দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করিতে চান, বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করাই হইল তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রথম ও প্রধান কাজ। কেননা, ছেলেরা যাঁহাদের কাছে শিক্ষা পায় তাঁহারা যে কারণেই হউক না কেন এখন গ্রামোফোনের ন্যায় যন্ত্র-বিশেষে পরিণত হইয়াছেন। যন্ত্রের কাছে তো মনুষ্যত্বলাভের শিক্ষা পাওয়া যায় না। মানুষ মানুষের কাছেই শিখিতে পারে, যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হয়। শিশু-বয়সে নির্জীব শিক্ষার মত ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয়, তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশী। তাই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় সেই গুরুর প্রয়োজন যিনি প্রতিনিয়ত আপনার সঙ্গদানে, শিষ্যের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।

মানুষকে বাদ দিয়া যে শিক্ষা, তাহা তো যান্ত্রিক। নানা প্রকার শিক্ষা প্রণালীর উদ্ভাবনা অবশ্যই উত্তম, কিন্তু তাহা প্রয়োগ করিতে গিয়া আমরা যদি কলের মত হইয়া যাই তাহা হইলে প্রণালীর দ্বারা যে শিক্ষা তাহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ করা সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে তাহা লইয়া সকলেই ব্যস্ত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষ প্রণালী বা পদ্ধতিকে তেমন মূল্য দেন নাই যেমন দিয়াছেন শিক্ষকের উপর। শিক্ষকের যদি অধীত বিদ্যা নিজের আয়ত্তে থাকে, এবং

প্রত্যেক ছাত্রের ক্ষমতা কি তাহা তাঁহার জানা থাকে তবে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীর জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না। অসম্ভব সস্তা পথের দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা হয় না। শিক্ষালাভ করিতে যেমন সাধনা করিতে হয়, শিক্ষাদানেও তেমনি সাধনা করিতে হয়। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে কাজেই আমরা যেমন করিয়াই চলি না কেন, রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না।"

বাল্যকালে যে-সকল শিক্ষকের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহারা কবির বালকহৃদয়কে বুঝিতে পারেন নাই। ফলে বালক-রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারাও বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। ঋষি-প্রতিম পিতার যে আদর্শ তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত ছিল, যাঁহার শিক্ষায় তাঁহার জীবনোন্মেষ হইয়াছিল সেই শিক্ষকের রূপ তিনি কোন বিদ্যালয়েই খুঁজিয়া পান নাই। তাহার পরিবর্তে পাইয়াছিলেন, বিধিনিষেধে ভরা শাসন-তর্জন-গর্জনপূর্ণ, আনন্দসম্পর্কশূন্য শিক্ষা ও শিক্ষকের সঙ্গ। এইরূপ শিক্ষা ও পরিবেশে বালকের জীবন কিভাবে বিড়ম্বিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার নানা চিত্র তাঁহার কথাসাহিত্যে বার বার দেখা দিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে নর্মাল স্কুলের স্মৃতি হইতে রবীন্দ্রনাথ "গিন্নি" গল্পটি লিখিয়াছিলেন। কাহিনীটিতে শিবনাথ পণ্ডিতের যে চরিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা শিক্ষকদের মধ্যে দুর্লভ নহে। গল্পে আছে, "শিবনাথকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত। প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের দুই-ই একত্র ছিল। এ-দিকে কিল চড়-চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত। ও-দিকে তীব্র বাক্য জ্বালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত তাঁহার নাম যম।

বালকদের পীড়ন করিবার জন্য শিবনাথ পণ্ডিতের আর একটি অস্ত্র ছিল —সেটি শুনিতে যৎসামান্য, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে নিদারুণ; তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বই আর কিছু নয়, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে আপনার নামটা ভালোবাসে। মানবস্বভাবের এই সকল অন্তর্নিহিত নিয়মবশতঃ পণ্ডিত মহাশয় যখন শশিশেখরকে 'ভেটকি'

নাম দিলেন তখন সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইতেছে জানিয়া তাহার মর্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।"

কিন্তু এইখানেই গল্পের শেষ নহে। কাহিনীর মর্মস্থল বালক আশুকে ঘিরিয়া। আশু ছিল নিতান্ত বেচারা ভালো মানুষ, বড়ো লাজুক, বয়সে সকলের ছোট। পণ্ডিত মহাশয় একদিন আবিষ্কার করিলেন যে সে তাহার ছোট বোনের সঙ্গে পুতুল খেলা করে। এই অপরাধে তাহার নামকরণ হইল "গিন্নি"। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা তাহাকে "গিন্নি" বলিয়া ক্ষেপাইতে সুরু করিল। রবীন্দ্রনাথ বালকটি সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে তেমনি করিয়া হাসিয়া চারিদিকের কৌতুকহাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল; এমন সময়ে ঘণ্টা বাজিল, অন্য সকল ক্লাস ভাঙ্গিয়া গেল এবং শাল পাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া বাড়ীর দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া আশুর হাসির অন্তরালে যে কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা আর কোনোমতেই বাধা মানিল না। হাসিতে হাসিতে তাহার মুখ কান টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল এবং অপমানের অশ্রুজল অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িল।"

পাঠ্যাবস্থায় এরূপ ঘটনা আমাদের অনেকের জীবনেই ঘটিয়াছে। হয়তো বা বালক রবীন্দ্রনাথেরও ঘটিয়াছিল। প্রাণের সেই গভীর বেদনা স্মরণ করিয়াই দরদী লেখক উপসংহারে লিখিয়াছেন, "ছুটির দিনে ছোট বোনটির সঙ্গে খেলা জীবনের একটি সর্ব প্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবীর লোক কোনো কালেও যে সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইবে, এ তাহার বিশ্বাস হইল না।"

বালক-হৃদয়ের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা অনভিজ্ঞ তাঁহারাই বালকদের না বুঝিয়া এমন গভীরভাবে আঘাত করিয়া থাকেন। অপমানসূচক নামকরণের যে মানসিক বেদনা তাহা দৈহিক বেদনা অপেক্ষাও যে গভীর ও ক্ষতিজনক একথা এই সকল শিক্ষক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন না। জীবনযুদ্ধে পরাস্ত, তিক্ত-বিরক্ত শিক্ষক যেন যন্ত্রে পরিণত হন এবং নিজেদের পরাজয়ের ক্ষোভ এই সুকুমার শিশুদের দুঃখ দিয়া মিটাইতে চাহেন। দুর্বল বালকের কোমল

হৃদয়ে এইরূপ আঘাত দিয়া তাহাদের কতদূর তাঁহারা ক্ষতি করিলেন একথা বুঝিতেও পারেন না। এইভাবেই বালক ক্রমে শিক্ষা ও শিক্ষককে ঘৃণা করিতে শিখে—ইহা যে কিরূপ অন্যায় ইহাও হয়তো তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন না।

"অপরিচিতা" গল্পে—নায়ক বলিতেছে, "কলেজে যতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিবার আমি সব চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাকে শিমূল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড় লজ্জা পাইতাম, কিন্তু বয়স হইয়া একথা ভাবিয়াছি যে যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে স্বরূপ এবং পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে বিদ্রূপ যেন এমনই প্রকাশ পায়।"

তাহার পর রবীন্দ্রনাথ বোধ করি নর্মাল স্কুলেরই কথা স্মরণ করিয়া "ডিটেক্‌টিভ" গল্পে শিক্ষক সম্বন্ধে আবার তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ছাত্রদের অধ্যয়নে আনন্দ নাই, শিক্ষকদের অধ্যাপনাতেও আনন্দ নাই। পড়া ও পড়ানো যেন একটা মহামারী কাণ্ড। ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলনটা যেন একটা লড়াই। শিক্ষক পাঠনাকালে এতই তিক্ত-বিরক্ত, এতই বিড়ম্বিত হইয়া পড়েন যে যখন তিনি শ্রেণীকক্ষ হইতে বাহির হন তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া দারুণ দুষ্কৃতিকারীর মত দেখায়। নবীন ডিটেক্‌টিভ লোকের মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার চরিত্র নিরূপণ করিতেছেন, "পথিকদের মধ্যে সব চেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে—এমন কি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই মনে করিয়াছি যে এইমাত্র সে কোন একটা উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে—সন্ধান করিয়া জানিয়াছি, সে একটা ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনি অধ্যাপনা-কার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে।"

ছাত্রের প্রকৃত শক্তি ও বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে শিক্ষকগণ অবহিত থাকেন না বলিয়া অন্যমনস্ক বালককে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা মূঢ় ও নির্বোধ বিবেচনা করিয়া হাল ছাড়িয়া দেন। কখন কখন এমনও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যাহাতে ছাত্রের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ বা সদয়ভাব প্রকাশ পায় না। "পাত্র ও পাত্রী" গল্পের উচ্চশিক্ষিত নায়ক বলিতেছে—"আমি কোনোদিন পড়ার বই কিনিনি সেইজন্য শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি।

আমার সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও আমি পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম।”

নূতন ছাত্র রাখাল স্কুলে ভর্তি হইল বটে, কিন্তু তাহার পড়াশুনা কোনোমতেই অগ্রসর হয় না দেখিয়া

“গুরু মশাই বলেন তারে—
বুদ্ধি যে নেই একেবারে ;
দ্বিতীয়ভাগ করতে সারা ছ’মাস ধরে নাকাল
রেগে মেগে বলেন, “বাঁদর নাম দিনু তোর মাকাল।”

এ কথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু রচনার মধ্যে প্রচলিত স্কুল ব্যবস্থা ও স্কুল মাষ্টারদের প্রতি তীব্র মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আবার ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে কয়েকটি দেব-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা সমাজে গুরুর আসনেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মানস-পটে শিক্ষকের যে মূর্তি অঙ্কিত ছিল তাহার একটি চিত্র পাই আমরা তাঁহার “জীবনস্মৃতি” গ্রন্থে “প্রত্যাবর্তন” প্রবন্ধে।

তিনি লিখিয়াছেন, “সেণ্ট জেবিয়ার্সে’র” একটি পবিত্র স্মৃতি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে অম্লান হইয়া রহিয়াছে—তাহা সেখানকার অধ্যাপকদের স্মৃতি। * * * * ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশী ছিল না ; বোধ হয়, কিছুদিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদলিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। * * * তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ছিল না কিন্তু আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল! তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন, অন্তরে বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আধ ঘণ্টা আমাদের কপি লিখিবার সময় ছিল, আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহা তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডি পেনেরাণ্ডা এই ক্লাশের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুই তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন আমার কলম সরিতেছে না। এক সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে হাত রাখিলেন এবং সস্নেহ স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “টাগোর তোমার কি শরীর ভালো নাই ?” বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য

ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।"

দরিদ্র শিক্ষকদের প্রতি কবির অশ্রদ্ধা ছিল একথা বলিলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। কিন্তু যেখানে শিক্ষক সংসারের তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতে তাঁহার মহান আদর্শলোক হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন সেখানেই কবি আঘাত দিয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। শিক্ষকের শিক্ষাদানের অসুবিধা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন এবং "একরাত্রি" গল্পের নায়কের মুখে সেই কথাগুলি আমরা শুনিতে পাই। গল্পের নায়ক বলিতেছে—"বহু চেষ্টায় নোয়াখালি-বিভাগের একটি ছোট শহরে এণ্ট্রান্স স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারির পদপ্রাপ্ত হইলাম। মনে করিলাম আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া এক একটি ছাত্রকে ভারতের এক একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব। কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগজামিনের তাড়া ঢের বেশী। ছাত্রদিগকে গ্রামার, অ্যালজেব্রার বহির্ভূত কোন কথা বলিলে হেড্-মাষ্টার রাগ করে। মাস দুয়েকের মধ্যে আমার উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।"

অনাবিষ্ট ও জড়বুদ্ধি ছাত্রকে পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্য শিক্ষকদের প্রাণপণ চেষ্টার কথা রবীন্দ্রনাথ বেশ সরস করিয়া "তপস্বিনী" গল্পে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাণের সমস্ত দরদ ঢালিয়া শিক্ষকসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন তাঁহার "মাষ্টার মশায়" গল্পে। হতভাগ্য দরিদ্র শিক্ষকদের ভাগ্যে যে কত অপমান ও তাচ্ছিল্য জমা হইয়া থাকে তাহার তিনি পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন এই কাহিনীতে। তবুও সকল শিক্ষক যে অমানুষ নহেন তাহারও প্রমাণ কবি এই গল্পেই ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তখন তরুণ মাষ্টার হরলাল বেণুর ভার লইল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। * * * বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহাকে সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর একটা জিনিস আছে সে যখন তাহা পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না।" শিক্ষক-ছাত্রের এইরূপ মধুর ঘনিষ্ঠতা বাড়ীর লোকদের ভাল লাগিল না, "কারণ গোয়াল ঘরে ছেলেকে দুধ যোগাইবার

জন্য যেমন গরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা যোগাইবার জন্য একটা মাষ্টারও রাখা হইয়াছে। ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন, এত বড় স্পর্দ্ধা, যে বাড়ীর চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থ সাধনের একটি চাতুরী বলিয়া জানে।"

তাহার পর কবি আরও লিখিতেছেন, বেণু কিন্তু শিক্ষকের সস্নেহ আচরণে এমনি বশীভূত হইয়াছে যে সে এক মুহূর্তও শিক্ষকের সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু শিক্ষকের আর বেণুর বাড়ীতে থাকা চলিল না। * * * শিক্ষক অন্যত্র চাকুরী লইল এবং কায়ক্লেশে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল। বেণু হরলালের বাসায় যাতায়াত করিত। মাঝে মাঝে হরলাল অফিসের ক্যাশ টাকা ব্যবসায় কার্যে বাড়ীতে আনিত। একদিন বেণু হরলালের বাড়ী হইতে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়া পলাইল। পাছে তাহার স্নেহাস্পদ ছাত্র বিপদে পড়ে এই ভয়ে হরলাল একথা কোথাও প্রকাশ করিল না—টাকা আত্মসাৎ করার দায় নিজের ঘাড়েই লইল এবং অবশেষে ছাত্রের জন্য নিজের জীবনটাই দান করিয়া দিল। কবি যে শিক্ষকদের অশ্রদ্ধা করিতেন না তাহার চরম নিদর্শন হইল যে তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষকতা কার্যে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহার শিক্ষকসমাজের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন।

আদর্শ শিক্ষক সম্বন্ধে আলোচনাকালে যাঁহাদের কথা রবীন্দ্রনাথের বিশেষভাবে স্মরণে ছিল তাঁহাদের নাম এই স্থানে উল্লেখ করিব। কবি বলিতেছেন, "এই প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারিনে। একদিন সতীশ এসে বল্লেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারও মধ্যে পাই নি। যে সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে, তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজী ভাষার সোপান শ্রেণীর সব নীচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সঙ্কীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাষ্টারীতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্য তিনি যা পাঠ দিতেন তা

জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠতো ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন স্নান। তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশী। আশ্রমে যাঁরা শিক্ষক হবেন তাঁরা মুখ্যত হবেন সাধক আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলন সতীশ।"

"তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ রায়। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল "সাধনা" পত্রে তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবে ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর এতটুকুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষ্যেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে রাখেন নি। আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায় কখনো লাইন টেনে চলতেন না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সখা ছিলেন। তাঁর ক্লাশে গণিত শিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হতো সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করতো। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তর্জন গর্জন শুনতে অতিশয় ভয়জনক ছিল, কিন্তু তাঁর স্নেহ তাঁর ভর্ৎসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলতো, ছাত্রেরা তা প্রতিদিন অনুভব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে আপনাদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, জগদানন্দ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না।"

মনে হয় কবি ৺জগদানন্দ রায় মহাশয় ও তাঁহার মত দুই এক জন শিক্ষককে স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছিলেন, "গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তাহলে তিনি ছেলের ভার নেবার অযোগ্য হন শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি

প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদী যোগেই তিনি পূর্ণ নন। তাঁর প্রথম আরম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরণার প্রবাহ পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাতশিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপনার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণেভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে আবার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে ছেলেদের আঙিনায় চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক।"

শিক্ষককে নদীর সহিত তুলনাকালে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকজন নিষ্ঠাবান গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন, "এদেশে পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারে, পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ দিনে ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার—ইঁহারা শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না।"

নোটের বোঝা সম্বন্ধে কবির তীব্র প্রতিবাদ পাওয়া যায় তাঁহার নানা প্রবন্ধের মধ্যে—"মাষ্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে।" তিনি আরও বলিতেছেন, "আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয় মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে। ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই স্কুলের শিক্ষক তৈয়ারী করা যাইতে পারে। ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে

থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়। মাষ্টারকলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্রেরা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তাহার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিদ্যালয়ে যে গুরুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার রূপ অন্য প্রকার, তাই তিনি "শিক্ষা সমস্যা" প্রবন্ধে বলিতেছেন, "এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয় ও মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য যাহা তাঁহার সাধ্য তাহার চেয়ে বেশী তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। এক পক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবী না উত্থাপিত হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে বিদ্যাদান আমাদের দেশের একটি চিরন্তন ব্রত তাই বিদ্যাদানের পদ্ধতি নানা আড়ম্বরে কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে নাই। মন্দাকিনীর ধারার ন্যায় গুরু বিদ্যাদান করিয়া গিয়াছেন পরম ঔদার্য্যে, অব্যাহতভাবে। তাঁহার দান কোথাও চাপা পড়িয়া যায় নাই। তখনকার দিনে গুরু মনে করিতেন যে বিদ্যাদানের নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিষ, সমস্ত মন প্রাণ দিয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই তিনি দান করিতেন সমস্ত প্রাণ মন ঢালিয়া, কাজেই বাহিরের কোন স্থূল উপাদানের গুরুভারে বা আড়ম্বরে বিদ্যার আসল দিকটি কোথাও ব্যাহত হইয়া পড়ে নাই।

এই আদর্শ লইয়াই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রম বিদ্যালয়ে এক জীবন্ত শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন ছাত্রেরা তো পণ্যবস্তু নহে যে যেমন করিয়াই হউক তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার করাইয়া দিলেই কাজ হইবে। পণ্যবস্তুর প্রাণ নাই কাজেই হাইড্রলিক জাঁতার চাপে তাহাদের কষ্ট হয় না কিন্তু শিক্ষাদান কার্য নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠিলে তাহা এমনই যান্ত্রিক হইয়া পড়ে যে তাহার নীরস পদ্ধতিতে ছাত্রদের মন নিরন্তর পীড়িত হয় এবং শিক্ষা কোনমতেই পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে না। প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের

প্রাণগত স্পর্শ থাকিবে তাহাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ এবং সেই আনন্দময় শিক্ষা হইতেই রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, জাগে খুশি। এই যে খুশি ইহারই ভিতরে নিহিত আছে বালকের ও গুরুর সৃষ্টি করিবার শক্তি।

আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। এইরূপ দানের মাহাত্ম্য এই যে গুরু স্বেচ্ছায় তাহা দান করেন। জ্ঞানের অধিকারী বলিয়াই তিনি জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কেননা, তিনি যাহা পাইয়াছেন তাহা শিষ্যকে দিতে না পারিলে তাঁহার পাওয়াই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কাহাকেও নিজের বিদ্যার অংশ দিতে না পারিলে, যথাকালে, যথাস্থানে ও যথাপাত্রে দান করিতে না পারিলে তাঁহার সাধনা পূর্ণ হইবে না। কেননা, জ্ঞান বিতরণ জ্ঞানার্জ্জন-সাধনার একটি অংশ। সেইজন্যই গুরু, যিনি জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য তপস্যা করিতেছেন তিনি যেমনি পূর্ণ হইবেন তেমনি প্রতি মুহূর্ত্তে শিষ্যকে সেই সাধনার অংশ দিয়া সার্থক হইবেন। গুরুর আসনের পাশে শিষ্য আপনার আসনটি পাতিয়া শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত গুরুর আয়ত্ত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই তাহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। গুরু খুশির সহিত বিদ্যাদান করিবেন এবং শিষ্য খুশির সহিত তাহা গ্রহণ করিবে—তবেই বিদ্যালাভ সার্থক হইবে। শিষ্য ও গুরু একত্রে মিলিয়া সৃষ্টি করিবেন তাঁহাদের পরিবেশের উপযোগী সম্ভার, ইহারই মধ্য দিয়া গভীর যোগের সৃষ্টি হইবে—কেবল নিজেদের মধ্যে নহে, কিন্তু সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সহিত, সমস্ত সমাজের সহিত। ছাত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য গুরু নিয়ত তাহার সহিত নানারূপ সৃষ্টিমূলক কাজে রত থাকিবেন, সমস্ত দিনের কাজের মধ্যে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে যেমন আয়ত্ত করিবে বিদ্যা ও দক্ষতা, তেমনই অর্জ্জন করিবে লোকব্যবহার। সামাজিক রীতি নীতি, মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক, মনের যে আদান প্রদান, তাহা সুন্দর ও সুসহ করিতে শিক্ষার প্রয়োজন। এ শিক্ষাও দিবেন আশ্রমের গুরু, তাই কবি আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে আনিয়া বসাইয়াছেন, যেমন ছিল সেই প্রাচীনকালে ভারতের তপোবনে।

শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে যে চরম অবনতি ঘটিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "আজকাল ছাত্রের কাছে আসা শিক্ষকের গরজ কেননা তাঁহারই প্রয়োজন অধিক কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যেরই গরজ গুরুকে লাভ করা। এখন হইয়াছে ঠিক তাহার বিপরীত—

শিক্ষক হইয়াছেন যেন দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসা। তিনি খরিদদারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোক বস্তু কিনিতে পারে; কিন্তু তাহার পণ্য-তালিকার মধ্যে স্নেহ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন তো কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না।" কাজে কাজেই বিদ্যালয় হইয়াছে একটি ছাপ দিবার কারখানা এবং শিক্ষক সেই কারখানার একটি অংশ বিশেষ। ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে, কথার কল কতকগুলি জীর্ণ-অজীর্ণ বুলি আওড়াইয়া যায়। যেমন করিয়াই হউক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা পাশের তিলকটি ছাত্রের কপালে আঁকিয়া দিতে পারিলেই শিক্ষকের কর্তব্য শেষ হইল। তাহার জীবনকে গড়িয়া তোলার আর কোন দায়িত্ব নাই শিক্ষকের, সুতরাং জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগও এখানে অসম্ভব। কল কেবল কাজ করে, দান তো করে না কাজেই এখানে খুশির প্রশ্নও ওঠে না। তাই এখানে গুরুও আজ ডাক দিয়া বলেন না—

"যথাপঃ প্রবতা যান্তি, যথামাসা অহর্জরম, এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা।"

জল সকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা। সত্য বটে, প্রাচীনকালে গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিতেন কিন্তু সেই আহ্বানের স্বর ছিল অন্যরূপ। ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য্য প্রকাশ করি।

তেজস্বিনাবধীতমস্তু।

তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক।

মা বিদ্বিষাবহৈ।

আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।

ভদ্রম্নো অপি বাতয় মনঃ।

হে দেব আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ কর।"

গুরু শিষ্যকে আপন সন্তানের ন্যায় আহ্বান করিতেন এবং শিষ্য গুরুগৃহে সন্তানরূপে বসবাস করিত। অন্যপক্ষে গুরু শিষ্যকে নিজ পুত্রের ন্যায় মনে

করিয়া তাহাকে ব্যক্তিগত পবিত্রতার, আচার বিচার, সূর্যোপাসনা ও দৈনন্দিন ধর্মপালনের শিক্ষা দিতেন এবং নিজ আয়ত্ত সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপূর্ণ মনোনিবেশে ও নিঃশেষে দান করিতেন। ইহা ছিল তাঁহার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করিলে তিনি ধর্মে পতিত হইতেন। ধনিদরিদ্রনির্বিশেষে শিষ্যগণের শিক্ষাকালীন সমুদয় ভার গুরুই বহন করিতেন। শিক্ষান্তে গুরু শিষ্যের নিকটে দক্ষিণা ব্যতীত অন্য কোন বেতন গ্রহণ করিতেন না।

আশ্রম বিদ্যালয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত করেন নাই। তাঁহার মত ছিল, "বেতন কর্মের মূল নহে, আনন্দই কর্মের মূল—বেতনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আমরা সেই আনন্দকেই আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। গঙ্গা হইতে যেমন আমরা পাইপে করিয়া কলের জল আনি, বেতন তেমনি করিয়াই আনন্দকে ঠেলা দিয়া তাহার একাংশ হইতে শক্তির সম্বল সঞ্চয় করিতে থাকে।" (ধর্মের অর্থ—সঞ্চয়) ছাত্রদের সহিত দেনাপাওনার সম্বন্ধ রাখিবেন না, তাহাই ছিল তাঁহার অভিলাষ। কিন্তু অবশেষে অবস্থা বিপর্যয়ে বেতন লইতে হইয়াছিল। তাহাতে কবি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখবোধ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি বলিয়াছেন—"গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর্থিক দেনা পাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে, এই মত একদা সত্য হইয়াছিল অতি সহজ উপায়ে। পুরাকালে রাজস্বের ষষ্ঠভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে, আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে নিত্য প্রবাহিত দান দাক্ষিণ্য। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ, ইহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোন ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না।" বর্তমান সমাজে এই প্রথা প্রচলিত না থাকায় ছাত্রদের সম্পূর্ণ ভার একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ শক্তির উপরেই নির্ভর করিয়াছিল এবং তাহা শেষ পর্যন্ত বহন করিতে না পারায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "শিক্ষক জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশী ছাত্রকে দান করিবেন—এইভাবে আপনার কর্তব্যকে মহিমান্বিত করিলে অর্থ বিনিময়ে জ্ঞানদানের যে অমর্য্যাদা তাহা কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইবে।" তিনি বলিয়াছেন শিক্ষাদান-কার্যে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। ইহাই শিক্ষাদানের আদর্শ। গুরু সত্য জ্ঞানলাভের জন্য যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, যে সাধনায় রত হইয়াছেন তাহা তখনই উদ্‌যাপিত হইবে যখন তিনি বিদ্যার যে সম্পদ পাইয়াছেন তাহা নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া মুক্ত হইবেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই অঙ্গ। আপন সাধনায় সার্থক হইতে যদি শিক্ষাদানকার্য একটি বিশেষ অঙ্গ হয় তাহা হইলে সেখানে অর্থগ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রাচীনকালে এই সত্যটি স্বীকৃত হইয়াছিল তাই গুরু স্বয়ং শিষ্যের সমস্ত ভারগ্রহণ করিয়া তাহাকে আপন সন্তানের ন্যায় গৃহে স্থান দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আধুনিক ব্রাহ্মণসমাজে সেই আদর্শই নাই। সেইজন্যই ব্রাহ্মণের ছেলে ইংরাজি শিখিলেই ইংরাজি কেতা ধরে পিতা তাহাতে অসন্তুষ্ট হন না। কেন এম-এ পাশ করা মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানবিৎ চট্টোপাধ্যায় যে বিদ্যা পাইয়াছেন তাহা ছাত্রকে ঘরে ডাকিয়া আসন হইয়া বসিয়া বিতরণ করিতে পারেন না? সমাজকে শিক্ষাঋণে ঋণী করিবার গৌরব হইতে কেন তাঁহারা নিজেকে ও ব্রাহ্মণসমাজকে বঞ্চিত করেন?"

"তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন খাইব কী? যদি কালিয়া-পোলোয়া না খাইলেও চলে, তবে নিশ্চয়ই সমাজ আপনি আসিয়া যাচিয়া খাওয়াইয়া যাইবে। তাহাদের নহিলে সমাজের চলিবে না, পায়ে ধরিয়া সমাজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। আজ তাঁহারা বেতনের জন্য হাত পাতেন, সেইজন্য সমাজ রসিদ লইয়া টিপিয়া টিপিয়া তাঁহাদিগকে বেতন দেয় ও কড়ায় গণ্ডায় তাঁহাদের কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া লয়। তাঁহারাও কলের মতো বাঁধা নিয়মে কাজ করেন, শ্রদ্ধাও দেন না, শ্রদ্ধাও পান না।"

রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে ব্রাহ্মণকে বা শিক্ষকসমাজকে তাঁহাদের আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন করাইয়া দিতেছেন অন্যদিকে তিনি সমস্ত মানবসমাজকেও শিক্ষকের প্রতি তাহার দায়িত্ব স্মরণ করাইতে ভুলিয়া যান নাই। তিনি বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণদিগকে নিজের যথার্থ গৌরবলাভ করিবার জন্য যেমন প্রাচীন আদর্শের দিকে যাইতে হইবে, সমস্ত সমাজকেও তেমনি যাইতে হইবে; ব্রাহ্মণ কেবল একলা যাইবে এবং আর সকলে যে যেখানে আছে সে সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। সমস্ত সমাজের একাদকে গতি না হইলে তাহার কোনো এক অংশ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যখন দেখিব আমাদের দেশের কায়স্থ ও বণিকগণ আপনাদিগকে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজের সহিত যুক্ত করিয়া বৃহৎ হইবার, বহু পুরাতনের সহিত এক হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতকে সম্মিলিত করিয়া আমাদের জাতীয় সত্তাকে অবিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন

তখনই জানিব আধুনিক ব্রাহ্মণও প্রাচীন ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষীয় সমাজকে সজীবভাবে যথার্থভাবে অখণ্ডভাবে এক করিবার কার্যে সফল হইবেন। নহিলে কেবল স্থানীয় কলহবিবাদ, দলাদলি লইয়া বিদেশী প্রভাবের সাংঘাতিক অভিঘাত হইতে সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, নহিলে ব্রাহ্মণের সম্মান অর্থাৎ আমাদের সমস্ত সমাজের সম্মান ক্রমে তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতম হইয়া আসিবে।”

সমাজকে শিক্ষকের নিকট থেকে কিছু দাবী করিতে হইলে, শিক্ষককেও সমাজের কিছু দিতে হইবে। চাষী, কামার, কুমোর সকলেই সমাজকে সেবা করে। সমাজের সহিত তাহাদের সম্পর্ক তাহাদের দেওয়া নেওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সমাজের সহিত শিক্ষকের সম্পর্ক কেবলমাত্র দেওয়া নেওয়া নহে, এ সম্পর্ক আরও গভীর, আরো দায়িত্বপূর্ণ। যে শিশু সমাজের ভাবী নাগরিক তাহাকে গড়িয়া তোলার ভার শিক্ষকের। এই জন্যই তাঁহার শিক্ষাদানকার্য শুধু জীবিকা অর্জনের একটি উপায়মাত্র নহে, তাঁহার দায়িত্ব আরও গভীরে নিহিত। তিনি বর্তমান সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন এবং ভাবী সমাজকে গড়িয়া তোলেন। সমাজ গঠনের কার্য কেবলমাত্র বেতনের বিনিময়ে যে করা যায় না—একথা সমাজকে মনে রাখিতে হইবে। ইহার জন্য যেমন একদিকে চাই আদর্শবাদী, ত্যাগী, নিষ্ঠাবান মানুষ, তেমনি সমাজেরও চাই তাঁহাদের প্রতি দায়িত্ববোধ। শিক্ষকদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিতে হইবে। “শ্রদ্ধা না পাইলে শিক্ষক মানুষ না হইয়া মাষ্টারমশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়।” কেবল তাহাই নহে শিক্ষক যাহাতে দৈনন্দিন অন্ন বস্ত্রের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া সম্মানের সহিত স্বীয় কর্তব্য পালন করিতে পারেন সেদিকে সমাজকে দৃষ্টি রাখতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষক বা গুরু যেরূপ নির্ভাবনায় জ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন তাহা কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল? গুরুর অন্নবস্ত্রের অভাব যে তাঁহার জ্ঞানার্জনের অন্তরায় হইয়া উঠে নাই তাহার কারণ সমাজই তাঁহার স্বচ্ছন্দভাবে দিনযাপনোপযোগী জীবিকার সংস্থান করিয়া দিয়া তাঁহাকে দায়মুক্ত করিয়াছিল। রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা উদঘাটিত হইলে প্রথমেই তপোবনের সেই পবিত্র গৃহের দৃশ্যটি আমাদের চোখে পড়ে। সেই তপোবনে বনান্তর হইতে কুশ, সমিৎ, ফল আহরণ করিয়া তপস্বীরা গৃহে ফিরিয়া

আসিতেছেন। রৌদ্র পড়িয়া আসিতেছে, নীবার ধান্যে কুটিরের প্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিয়াছে, কাছেই হরিণেরা শুইয়া রোমন্থন করিতেছে। আবার কাদম্বরী কাব্যেও যে তপোবনের বর্ণনা পাই তাহাতেও দেখি কুটিরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান্য শুকাইতেছে—আমলকী, লবঙ্গ, কদলী, বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হইয়াছে, বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেববলিপিণ্ড আহার করিতেছে, নিকটে জলাশয় হইতে কলহংস শাবকেরা আসিয়া নীবার-বলি খাইতেছে। এই সকল বর্ণনা হইতেই জানা যায় যে তপোবনবাসী জ্ঞানতপস্যারত সাধকগণ তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের জন্য নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আর্য্যসভ্যতার জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এই ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু ভারতে বিদ্যার সমাদর কোনদিনই হ্রাস পায় নাই বলিয়া গুরু বা শিষ্যের অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নাই বা অন্নের চিন্তায় শিক্ষাদান কার্যে ব্যাঘাত ঘটে নাই। তখন গুণমুগ্ধ রাজাদের দানে শিষ্যগণের অভাব-মোচন হইতে থাকে। ইতিহাসে পড়ি, অনেক ক্ষেত্রে জনপদের পরিষদগুলি সাধারণ ভাণ্ডার হইতে নিয়মিতভাবে এই আশ্রম বিদ্যালয়গুলিকে অর্থসাহায্য করিত। কোন কোন স্থানে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য দেশের ধনী পুরুষেরা নিষ্কর-ভূমি দান করিতেন, এমন উদাহরণ বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

বৈদিকযুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কিভাবে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন তাহার বহু উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। উপনিষদেও আছে যে রাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জীবিকানির্বাহে সহায়তা করিতেন। যাজ্ঞবাল্ক্যসংহিতায় তো ব্রাহ্মণগণের বসতি ও বৃত্তির ব্যবস্থা রাজাদের কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মহাভারতে দেখি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নগরের মধ্যে শিক্ষার্থিগণের জন্য আশ্রম নির্মাণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কৌটিল্য বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অরণ্য দান করা হইবে এবং বৈদিক পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট উৎপাদনযুক্ত কর ও দণ্ড হইতে মুক্ত ব্রহ্মদেয় ভূমি দান করা হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি ব্রাহ্মণকে দেয় ব্রহ্মবৃত্তি, বংশানুক্রমিক বৈদ্যকে দেয় "বৈদ্যার্থ", গুরুশিষ্যের ব্যয় নির্বাহার্থে দেয় "অগ্রহার গ্রাম" ও পাঁচশত হইতে সহস্রপণ পর্যন্ত অর্থবৃত্তির বিধান দিয়াছেন। শুক্রনীতিসারে আছে যে রাজা দান ও মানের দ্বারা পাণ্ডিত্যের উন্নতি করিবেন। ব্রাহ্মণ যেমন এইভাবে সমাজ কর্তৃক প্রতিপালিত হইতেন—তেমনি তিনি এসকলের পরিবর্তে নিষ্কামভাবে সমাজকে আপনার পুণ্যফল দান করিতেন। কিন্তু যদি রাজা মূর্খ ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিতেন

তবে তাহা দস্যু প্রতিপালনের ন্যায় গর্হিত কার্য বলিয়া গণ্য হইত। এ কথাও আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ভারতে হিন্দু-বৌদ্ধ উভয় রাজগণই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের সম্মান ও পরিপোষণ করিতেন। অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বহু স্থানে ভিক্ষুদের জন্য মঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বসুমিত্র, চরক প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণের সহিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কণিষ্করাজার নাম ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নবরত্ন পরিপালন করিয়া বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গুপ্তরাজগণ নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা এবং আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতিগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন বিদ্যার কিরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন সে কথা কে না জানেন? তিনি "হর্ষচরিত" রচয়িতা বাণভট্টের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, হিউয়েনৎসাংকে বিদ্যোৎসাহী, গুণী জ্ঞানী বলিয়া সমাদর করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং জাতক-সঙ্কলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন রাজকরলব্ধ অর্থের একপাদ পণ্ডিতগণের পুরস্কারের জন্য পৃথকভাবে ব্যয় করিতেন। পালরাজগণ অতীশ, বীরদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দিয়া তাঁহাদের জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহ দিতেন। ধর্ম্মপাল বিক্রমশীলা ও গোপাল ওদন্তপুরী প্রতিষ্ঠা করেন এ কথাও আমরা জানি।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেকালের শিক্ষকগণ, রাষ্ট্র ও সমাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত ছিলেন না। সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষার ও শিক্ষকের সমাদর, সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত সুতরাং তৎকালীন শিক্ষকগণ নিশ্চিন্তমনে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া দেশের ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলিকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও আশা করিয়াছেন, আমাদের বৃহৎ শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে দুই চারিটি লোক নিশ্চয় উঠিবেন যাঁহারা বিদ্যাব্যবসায় ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে অনেক শিক্ষক নানা প্রতিকূল অবস্থাতেও দেনা পাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া নিজেদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে খুশির সহিত ছাত্রকে বিদ্যাদান করেন। এইরূপ মহত্ত্বের যাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহারাই প্রকৃত গুরু, শিষ্যের নিকটে তাঁহাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এইরূপ শিক্ষকের উদাহরণ খুঁজিতে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসেই বা

ফিরিয়া যাইতে হইবে কেন? উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও কি আমাদের মধ্যে এইরূপ শিক্ষক ছিলেন না? যাঁহারা স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আদর্শকে মুহূর্তের জন্যও তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যাঁহারা আপনাদের ন্যায়সঙ্কল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে কেশাগ্র পরিমাণেও হেলিয়া পড়েন নাই, যাঁহারা আপনাদের প্রশস্তবুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দ্বারা বহু ছাত্র-ছাত্রীর জীবনকে ন্যায়পথে চালনা করিয়াছেন এমন অনেক শিক্ষক তো আমাদের মধ্যেই ছিলেন এবং এখনও আছেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সভ্যতার তরঙ্গ যখন প্রবলভাবে বঙ্গদেশের উপরে আসিয়া পড়িল তখন দেখি তাহার সংঘাতে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রথা ভাঙ্গিয়া পড়িতে সুরু করিল। ইংরাজী শিক্ষার মদিরা মধুসূদন দত্ত প্রমুখ হিন্দু কলেজের বহু ছাত্রকেই উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলিল। তাঁহারা স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হারাইয়া দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম এমন কি পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। আচারে ব্যবহারে, ভাবে ভাষায়, অশনে বসনে সাহেব সাজিবার কি উৎকট আগ্রহই না এই সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রতীচ্যের সব কিছু এমন কি মদ্যপান পর্য্যন্ত ছাত্রসমাজে প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে লাগিল। যাঁহারা এই হীন আত্মবিস্মৃতির যুগে আত্মস্থ থাকিয়া দেশবাসীকে এই সকল কুআদর্শ, কুশিক্ষা ও কদাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই শিক্ষক। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার, রামতনু লাহিড়ীর নাম কি বাংলা দেশ কখনও ভুলিয়া যাইবে? রসময় মিত্র, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ শিক্ষকগণ প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ রাজত্বে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করিয়া দেশকে উন্নতির উচ্চ শিখরে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিষ্কলুষ মহান চরিত্র, ত্যাগ ও কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা বহু ছাত্রছাত্রীকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন; ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সমপাঠীদের ন্যায় তাঁহারাও বড় বড় কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন কিন্তু বাংলাদেশে উত্তম শিক্ষকের গুরুতর অভাবমোচন করিবার জন্য তাঁহারা ধন ও মানের অভিলাষ ত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকার্য্যে আত্মনিবেদন করেন।

বালকদিগকে শিক্ষাদানকালে রসময় মিত্র মহাশয়ের যে-সকল অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন,

"বালকদিগের প্রীতিলাভের মূলমন্ত্র কি? আমি চিরদিন শিক্ষকতা করিয়া বুঝিয়াছি, বালক হৃদয় স্বভাবতঃই কোমল ও স্নেহপ্রবণ; তাহাদিগকে স্নেহ করিলে, অন্তরের সহিত তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিলে, তাহারা ভক্তির প্রতিদান করিতে জানে। কোন দুষ্টতা বা অপরাধ করিলে তাহাদের তিরস্কার কর, তাহাদের দণ্ডবিধান কর ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহারা যেন বুঝিতে পারে, তিরস্কার ও দণ্ড তাহাদের মঙ্গলের জন্য, তোমার স্নেহ প্রণোদিত, তোমার ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আক্রোশ প্রণোদিত নহে। অনেক সময়, অনেক বালক আমা কর্তৃক তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু দেখিয়াছি তাহারাই আবার পরবর্তী জীবনে আমার প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। এই সকল বালকেরা আপন আপন কনিষ্ঠ সহোদরদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে আসিয়া আমাকে বলিয়াছে, "আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ কৃপাদৃষ্টি করিয়া সংশোধিত করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রতিও সেইরূপ কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।" আমি অমনোযোগ ও দুষ্টতার জন্য সময় সময় বালকদিগকে দণ্ডিত বা তিরস্কৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু পড়াশুনায় পশ্চাৎপদ হইয়া থাকার জন্য কাহাকেও তিরস্কার করিয়া নিরুৎসাহ করি নাই—বরং আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিয়া সর্বতোভাবে তাহাকে অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবজ্ঞাসূচক ও বিরক্তিব্যঞ্জক ভাষা প্রয়োগ করিয়া বালকদিগের আত্ম-মর্যাদাহানি করা ও তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করা অতীব অন্যায়।"

আরও এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "বালকেরা অতি অল্পেই শিক্ষকের প্রকৃতি ও মনোভাব বুঝিতে পারে। কর্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল শিক্ষক সহজেই বালকগণের অনুরাগভাজন হইয়া থাকেন. অপর দিকে যে শিক্ষক কর্তব্যে অবহেলা করেন, শ্রেণীতে গিয়া শিক্ষাদান অপেক্ষা তিরস্কারেই যাঁহার অধিকতর সময় অতিবাহিত হয়, যিনি নিজে আগ্রহসহকারে পরিশ্রম না করিয়া ছাত্রদের একটা কার্যের উপদেশমাত্র দিয়া আপনি বিশ্রামসুখ বা নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন, হেডমাষ্টার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া যাঁহার কণ্ঠস্বরের উচ্চতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বালকেরা অনায়াসেই তাহার চরিত্র বুঝিয়া লয়।"

বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম কি কেবল তাঁহার ছাত্রগণ ভক্তিভরে স্মরণ করেন? রোগীর পরিচর্যায়, অগ্নি নিবারণে, দেশসেবায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জগদীশচন্দ্রের

প্রেরণায় ও কালীশ পণ্ডিতের নেতৃত্বে যে কর্মকুশলতা ও সেবানৈপুণ্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা সেই সময়কার লোকেরা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত মনে করিয়া থাকেন। একদিন সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, "এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।" "মানব জমিন" ঠিক মত আবাদ করিতে পারিলে যে সত্যই সোনা ফলে তাহা সত্য করিয়া গিয়াছেন জগদীশচন্দ্র। তিনি ছাত্রদের স্বভাব এতদূর পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে পরীক্ষাগৃহে বাৎসরিক হউক বা ষান্মাসিক হউক কোন পরিদর্শক থাকিতেন না এবং ছাত্রেরাও কোনরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিত না। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, "কুটীরাশ্রমবাসী আচার্য্যদেবকে দেখে পুরাণ ভারতের ঋষিচরিত্রের একটা মধুরস্পর্শ যেন আমার মনে পেয়েছিলাম।" এখন দেশে ছাত্র-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সভাসমিতিতে দেশের নেতারা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন, ছাত্রদিগকে নানা রাজনৈতিক দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহারা যদি তরুণ বালকবালিকাদের একাধারে বন্ধু, শিক্ষক ও শাস্তা হইয়া তাহাদের সুশিক্ষায় মন-প্রাণ-দেহ ঢালিয়া দেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফলের চেয়ে অনেক বেশি কাজের কাজ হইবে।

এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে দেশের নানা জটিল সমস্যায় আমরা সংশয়াকুল হইয়া নিজেদের অভাব অসুবিধাগুলিকে নিতান্তই বড় করিয়া দেখিয়া থাকি কিন্তু যে কয়েকজন শিক্ষকের নাম করিলাম তাঁহাদের বা তৎকালীন শিক্ষকদের কি সেইরূপ নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই? সাংসারিক অভাব অনটন, দারিদ্র্য, পারিবারিক শোক দুঃখ তো ছিলই উপরন্তু নানা সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তাঁহাদের দাঁড়াইতে হইয়াছিল। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, অস্পৃশ্যতানিবারণ, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, বিদেশ ভ্রমণ, আন্তর্জাতিক-বিবাহ প্রভৃতি যে সমস্ত সংস্কার এখন আর দেশে নূতন বলিয়া মনে হয় না, সে-সকলই ইঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দূর করা সম্ভব হইয়াছে। সংস্কারকের দলকে এই সকল কুসংস্কার দূর করিবার জন্য কি কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহাদের কিরূপ সামাজিক লাঞ্ছনা ও পারিবারিক নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছিল তাহার ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি।

শিক্ষকমহাশয়গণের অগ্নিপরীক্ষা এইখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। তাঁহাদের ছাত্রগণ সকলেই 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "গোপালের" ন্যায় সুবোধ

ছিল না। সুরাপান ও ধূমপান ছাত্রগণের মধ্যে এমনভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল যে তাহা নিবারণ করা প্রায় অসাধ্য-সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া "সুরাপান নিবারণী" সভা স্থাপন করেন এবং এই প্রতিবাদই পরে প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ শিক্ষকগণের সহায়তায় একটি বিপুল আন্দোলনে পরিণত হয়। ইহাদেরই প্রচেষ্টায় ছাত্রগণ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন যে তাঁহারা কখনও মদ্যপান করিবেন না বা মদ্যপানে প্রশ্রয় দিবেন না। এই সমিতির উদ্যোগেই আবগারী আইনের ৪৩ ধারা পরিবর্তিত হয় যাহার ফলে চিকিৎসকের উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত ঔষধালয়ে মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

শিক্ষকের কর্তব্য কেবল বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। মহামতি ডেভিড্ হেয়ারের প্রকৃত উত্তরসাধকরূপে এই শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রদের সহিত মেলামেশা করিতেন, সভাসমিতিতে যোগ দিতেন, ছাত্রদের যাহাতে প্রকৃতভাবে মঙ্গল হয় তাহার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় যখন বরিশালের জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন তিনি সন্ধ্যার সময় প্রাচীন ঋষির ন্যায় স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া ছাত্রদের সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেন। খেলার মাঠেও তিনি উপস্থিত থাকিতেন, কখনও কখনও ছাত্রদের সহিত খেলা করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার নিজের এবং প্রত্যেক ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ছিল। বালকেরা তাঁহার সঙ্গে স্বহস্তে ফল ও ফসল ফলাইয়া প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিখিত। এত শত কাজের মধ্যেও তাঁহারা প্রায় সকলেই একাধারে জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত, বিদ্বান, বাগ্মী ও সুলেখক ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"তিনি যে শিক্ষকতাকার্যে অসাধারণ কৃতকার্যতালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ভিতরকার কথা এই বুঝিয়াছি যে তিনি নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন।"

অনেকের আবার ধারণা যে তখনকার দিনের ছাত্রেরা এখনকার ছাত্রদের ন্যায় দুষ্ট ও দুর্বিনীত ছিল না। এই ধারণা যে কত ভুল তাহার কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি। হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবচন্দ্রবাবু যখন বীরভূম হইতে আসিয়া স্কুলের কাজে যোগ দেন তখন দুষ্ট ছেলেরা

তাঁহাকে শুনাইয়াই "বন্য" "আরণ্য" ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া আনন্দ পাইয়াছিল, এমন কি তাঁহার ক্লাশেই উচ্চরবে শৃগাল-ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পরীক্ষার সময় সত্যচরণ নামে এক উদ্ধত ও ধনী বালক অসদুপায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করায় তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক বাধা দিলে বালকটি তাঁহাকে মারিতে উঠে কিন্তু অন্য শিক্ষক বাধা দেওয়াতে ছাত্রটি মারিতে পারে না। বাৎসরিক পরীক্ষার পরে বালকেরা আপন আপন নম্বর জানিবার জন্য শিক্ষকগণকে উত্যক্ত করিত, ফেল করিয়াছে শুনিলে শিক্ষকগণের অনিষ্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইত। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের পরিশ্রমে ও যত্নে এই বালকেরাই যখন পড়াশুনায় আনন্দ পাইল্ তখন তাহাদেরই মধ্যে অনেকে অনুতপ্ত হইয়া প্রধান শিক্ষককে বলিয়াছে, "মহাশয় আমরা চিরদিন পাঠে অবহেলা করিয়াছি। অনেক সময় শিক্ষকদের সহিত প্রতারণা ও অশিষ্ট আচরণ করিয়াছি। শিক্ষকের সম্মুখস্থ বালকেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ছলে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরপ্রাচীর তৈয়ারী করিয়াছে, আমরা তাহাদের পশ্চাতে বসিয়া তাস খেলিয়াছি বা চাল-কড়াই ভাজা খাইয়াছি, পড়াশুনায় যে বিমল আনন্দ আছে তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।"

কাজেই দেখা যাইতেছে যে শিক্ষাজগতের সমস্যা কোন কালেই কম ছিল না। ছাত্রেরা চিরকালই ছাত্র থাকিবে; তাহাদের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, আবেগ-অনুভূতিগুলি যুগ পরিবর্তনে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে নাই, কিম্বা তাহাদের দেবশিশুতুল্য প্রকৃতি একালে পশুপ্রকৃতিতে পরিণত হয় নাই। বয়ঃসন্ধিকালে তাহারা এক-একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসিবেই। ইহাই মানবপ্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং বালকদিগের জোয়ার-ভাঁটার নিয়ম ধরিয়া কখনও ধৈর্য ও সহানুভূতির সহিত, কখনও স্নেহের দ্বারা, কখনও বা শাসনের দ্বারা মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষকের কাজ। অভাব হইয়াছে সেই শিক্ষকের যিনি আত্মজের ন্যায় এই বালক-বালিকাদের সযত্নে গড়িয়া তুলিবেন। এই যে-সকল শিক্ষকের নাম করিলাম তাঁহারা কেহই বিত্তশালী ছিলেন না। বিত্তের সন্ধানে নিজেদের জীবনও ক্ষয় করিয়া ফেলেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যে অজেয় পৌরুষ ছিল, স্বভাবের মধ্যে যে মহত্ত্ব ছিল তাহার দ্বারাই শিক্ষার ইতিহাসে তাঁহারা স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। দারিদ্র তাঁহাদিগকে দরিদ্র করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়ের জন্য এইরূপ শিক্ষকই খুঁজিতেছিলেন

যাঁহার সহিত শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং এই সম্বন্ধসূত্রের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের ন্যায় চলাচল করিবে। এই প্রসঙ্গে "আশ্রমের শিক্ষা" প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে শিক্ষার মাধ্যস্থ হইল গুরুশিষ্যের আত্মীয়ভাব। শিশুদের রক্ষণ, পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপরে। পিতামাতার সে যোগ্যতা বা সুবিধা না থাকাতেই বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতার স্থান লইতেই হইবে নতুবা শিক্ষাকার্য কখনই সার্থক হইতে পারে না, যাহাতে আশ্রম-বিদ্যালয়ে মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয় তাহার জন্য তপোবনের আদর্শে ছোটবড়তে একত্রে মিলিয়ামিশিয়া থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গুরুপল্লী, শ্রীপল্লীতে অধ্যক্ষ ও কর্মচারিগণ একই ধরনের বাসগৃহে পাশাপাশি বাস করিতেন। ছাত্রদের লইয়া মাঝে মাঝে বনভোজন তো ছিলই; ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে এক এক বর্গকে এক এক গুরুগৃহে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হইত। ইহাতে শিক্ষকেরা ছাত্রদের সহজ অবস্থায় ঘরের ছেলের মতই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং ছাত্রেরাও নানা বালকসুলভ উপদ্রব করিয়া গুরুগৃহে আপনাদের স্নেহের আসনটিকে দখল করিয়া বসিয়াছে। সান্ধ্যবিনোদনে, গল্পগুজবে, গানে, অভিনয়ে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে যে সম্বন্ধটি গড়িয়া উঠিয়াছে সেদিন, তাহা আজও শিথিল হয় নাই। সেই যে নিবিড় আত্মীয়ভাব স্থাপিত হইয়াছে বাল্যকালে, তাহারই টানে আজও শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা দূর-দুরান্তর হইতে একবার তাঁহাদের আনন্দধামে শান্তি ও বিশ্রামলাভ করিতে আসেন।

গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এই সত্য সম্বন্ধটি গড়িয়া তুলিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। পিতা ও সন্তানের মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে তাহারই বলে পিতা সন্তানের জন্য নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া সার্থক হন। সেইরূপ গুরু পিতার আসনে বসিয়া শিষ্যকে আপন সন্তানের ন্যায় অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলে তাহাকে সংসারের দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করা তাঁহার পক্ষে সুগম হয়। নিজের আয়ত্ত বিদ্যা নিঃস্বার্থভাবে দান করা তখনই সহজ ও মহনীয় হইয়া উঠে কেননা এই দানের পশ্চাতে কোন স্বার্থ থাকে না।

এই আদর্শ কার্যকরী করার মত শিক্ষকের একান্ত অভাব বোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বাধা হচ্ছে লোকের অভাব। ছেলেদের উৎসাহ

সর্বদা সজীব রাখতে পারেন এমন অনুরাগী ও কর্মশীল লোক পাওয়া চাই। যিনি নিজে উদাসীন—তিনি কেবল নিয়মে বাধ্য হয়ে এই সকল কাজে ছাত্রদের আনুকূল্য করতে পারেন না। শুধু অর্থোপার্জন যাঁদের লক্ষ্য তাঁদের দিয়েও এ-কাজ হবে না—কারণ যে আদর্শের কথা গোড়ায় বলেছি, তাকে রক্ষা করতে হলে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না, যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, এইরূপ গুরুর বৈশিষ্ট্য কি? প্রথমতঃ, তিনি স্বয়ং বিদ্যার চর্চা ও শিক্ষাদান কার্য আপনার সাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আপনার হৃদয়ের প্রীতি ও জ্ঞানের দ্বারা ছাত্রকে আকর্ষণ করিবেন এবং আপনার অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মনন-শক্তির সঞ্চার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, গুরু স্বয়ং শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যাদান করিবেন এবং শিষ্যকে শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যাগ্রহণের জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করিবেন—ইহা তাঁহারই দায়িত্ব। ছাত্র বালক-সুলভ চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে গুরুকে ধৈর্যবান হইতে হইবে। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁহাদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁহাদের পক্ষেই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিতেছেন যে, শিক্ষকগণ যাহাদের লইয়া কাজ করেন তাহারা তাঁহাদের সমকক্ষ নহে। তাহাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাহাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া খুবই সহজ। শিক্ষাদান কার্য সফলভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে ছাত্রদের ব্যবহার ও আচরণে শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এই ব্যাপারে শিক্ষকদের যথেষ্ট সতর্ক ও সজাগ থাকিতে হইবে। নিজেদের আচরণ মর্যাদাপূর্ণ হইলে—ছেলেদের পাঠ দিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈয়ারী থাকিলে এবং তাহাদের সর্বদাই আনন্দময় কার্যে রীতিমতভাবে নিযুক্ত রাখিলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কিছু কঠিন কাজ নহে। তবুও সময়ে সময়ে শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। তখন ছেলেদের জেলের কয়েদী বা ফৌজের সিপাহি হিসাবে দেখিলে চলিবে না। ছাত্রেরা যে সজীব মানুষ, একটি বিশেষ প্রকৃতির অধিকারী এবং সজীব তন্তুজালে বড় বিচিত্র করিয়া গড়া, একথা মনে রাখিলে শিক্ষক পুলিসের দারোগা, ড্রিল-সার্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হইয়া উঠিবেন না। ছাত্রদের শ্রদ্ধা করিতে না পারিলে তাহাদের শিক্ষার ভার নেওয়া কোন লোকের পক্ষেই উচিত নহে।

ছাত্রশাসন সম্পর্কে তিনি আরও বলিতেছেন, "তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়েও ছাত্রেরা নানা অপরাধ করিয়া থাকে, কারণ অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকের ধর্ম। যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল-আশঙ্কায় অসহিষ্ণু হন ও তাহাদিগকে সদ্যই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র-অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।

আমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়োদের মাপ-কাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে, ছোট ছেলেরা নির্বোধের মতো বেগে চলে, সে জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই। কেননা সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে, বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এইজন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে।"

তাহার পর তিনি আরও বলিতেছেন, যাহাকে বিচার করা যায় তাহার যদি কোন শক্তিই না থাকে তবে অবিচার করাই সহজ হইয়া উঠে। ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাভাবিক যোগ্যতা যাহাদের নাই অক্ষমের প্রতি অবিচার করিতে তাহাদের একটি আনন্দ থাকে। ছেলেরা অবোধ হইয়া, দুর্বল হইয়া মায়ের কোলে আসে, এইজন্য তাহাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করিয়াও মাতাকে ছেলেদের উপরে অন্যায়-অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তাহার প্রমাণ দেখা যায়। ছেলেদের মানুষ হওয়ার পক্ষে এমন বাবা অল্পই আছে। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত দেখিলে আমরা জানি যে ইহার জন্য মূলতঃ শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁহারা দুর্বলমনা বলিয়াই কঠোরতার দ্বারা নিজেদের কর্তব্যকে সহজ করিতে চান। পাঠশালায় মূর্খতার জন্য ছাত্রদের উপরে যে নির্যাতন ঘটে তাহার বারো আনা অংশ গুরুমহাশয়ের নিজেরই প্রাপ্য এবং রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রাষ্ট্রতন্ত্রেই হউক কি শিক্ষাতন্ত্রেই হউক কঠোর শাসন-নীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা—ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।"

স্নেহ ও ভক্তির দ্বারা যে সেতুবন্ধন হয় গুরুশিষ্যের মধ্যে, তাহার সাহায্যেই বিদ্যার আদানপ্রদান হওয়া সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ; কেননা তাহাই

সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক উপায়ে গুরু কেবল কতকগুলি সংবাদ বিতরণ করেন না কিন্তু জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাহাই শিষ্যের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করিয়া বিশ্বের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।

শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে প্রাচীনকালে শিক্ষকেরা মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্রেরা তাহা খাতাতে নহে কিন্তু মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। শিক্ষক যদি প্রকৃত দরদী হন এবং শিক্ষাদানের জন্য একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁহার থাকে তবে এইরূপ শিক্ষাদান কার্য যে সরস ও সফল হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন, "অন্যের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ মুখের কথা তো শুধু কথা নহে; তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা সঙ্গীত ও আকার লাভ করিয়া দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে; শুধু তাই নয় আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।"

শিক্ষকের যে সকল গুণ থাকা উচিত বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন সেইরূপ শিক্ষক পাওয়া যে অত্যন্ত কঠিন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই কিন্তু তিনি তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়ে সেইরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ দিব। তিনি লিখিয়াছেন, "একসময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে একজন হেড্ মাষ্টার নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, "অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে।" তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখেশুনে বললেন, "ছেলেরা গাছে চড়ে চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়—এতো ভালো না।" আমি বললাম, "দেখুন আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলেই বা।" তিনি

আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। * * * তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না। তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেড্‌মাস্টার রাখি নি।"

একজন ইংরাজ শিক্ষককে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ছেলেদের ইংরাজী শিখাইবার জন্য। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় থাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অন্তরে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাশে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন, তারা বাঙালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা—তাদের বয়স নয় দশ বৎসর হইবে। তবু তাঁর ক্লাশে যাওয়া ছাড়িল। হেড্‌মাস্টারের তাড়নাতেও কোন ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত হইল। এই হেড্‌মাষ্টারটিকে "White men's burden" হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন—"তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরস্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাশে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম শিক্ষক যেমনই দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজত না—কিন্তু তাদের অ্যাকসেণ্ট বিশুদ্ধ হইত।" কিন্তু এই শিক্ষককে তাঁহার বিদ্যালয়ে রাখা সম্ভব হয় নাই, কেননা তাঁহার দানের মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই, সেখানে আদান-প্রদান সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জ্ঞানের আদান-প্রদান ব্যাপারটি সাত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহ-জীবনে তাহার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ-শিক্ষক-বিদ্বেষী ছিলেন মনে করিলে ভুল করা হইবে। এই সম্পর্কেই তিনি বলিতেছেন, "আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে।" বুঝিতে বাধা হয় না যে এঁরা দুজন ছিলেন পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ।

এইরূপ "স্বার্থত্যাগপর ভৃতিনিরপেক্ষ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনারত নিষ্ঠাবান" গুরুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। যে-সকল অধ্যাপক ও কর্মিগণ তাঁহার আশ্রমের কাজে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই প্রাচীন গুরুর আদর্শেই অনুপ্রাণিত ছিলেন। আজিকার শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার পিছনে আছে এই অধ্যাপকগণের গভীর অনুরাগ ও আত্মত্যাগ। দুর্লভ আদর্শ ও নিষ্ঠার দ্বারা তাঁহারা এই আশ্রম-বিদ্যালয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধনার মধ্যে সত্য ছিল বলিয়াই আজ তাঁহাদের বিদ্যালয় সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

এই সৃষ্টি-তপস্যায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সমাজ-ব্যবস্থায় যে গুরু আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন সেই গুরুর স্থান তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অজিত চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, "ইহার পর রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং আসিয়া বিদ্যালয়ে বাসা বাঁধিলেন। তিনি স্থায়িভাবে এখানে থাকিয়া সকল কর্মের ভার লইবার জন্য এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁহার যোগ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইবার জন্য বিদ্যালয়ের মাথার উপর হইতে সংশয়ের মেঘ একটু একটু করিয়া কাটিতে লাগিল। অধ্যাপকদিগের প্রত্যেককে অধ্যয়নে অনুশীলনে ও রচনাকার্যে উৎসাহ দিলেন, যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ তাঁহাকে সেই বিষয়ে পুস্তক আনাইয়া দিয়া পরামর্শ দিয়া আলোচনা করিয়া সেই অনুরাগকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া দিলেন। অধ্যাপকগণকে লইয়া একটি সায়ংসভা গঠিত করিলেন, তাহাতে নানা বিষয়ে আলোচনা এবং পাঠ হইত। সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্রধর্ম সকল বিষয়ে পাঠ এবং কথাবার্তা হইত।

ক্লাসে ক্লাসে গিয়া রবীন্দ্রবাবু বসিতেন এবং নিজে পড়াইয়া কী ভাবে ভালো পড়ানো যাইতে পারে তাহা দেখাইতেন। ইংরেজি বাংলা দুই ভাষাই তিনি নিজে কোনো কোনো ক্লাসে পড়াইতেন। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপকদিগের সহিত পাঠ-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

এ বিদ্যালয়ের একটি ভাব ইহার আরম্ভকাল হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে এখানে অধ্যাপকদের মধ্যে কোন উচ্চনীচের অসামঞ্জস্য নাই। সেইজন্য কাহাকেও হেডমাস্টার বা কর্তৃপদ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য রবীন্দ্রবাবু

নিজে ভারগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবটি কিছু কিছু আঘাত পাইয়াছিল। কবি নিজে কোনোদিন কোনো অধ্যাপককে অনুভবমাত্র করিতে দেন নাই যে, তিনি প্রভু এবং অধ্যাপকেরা তাঁহাকে সেইভাবেই দেখিবেন। তাঁহার ভাব এই যে আমরা সকলে মিলিয়া বিদ্যালয়ের কাজ করিতেছি—ছাত্র, অধ্যাপক এবং স্থাপয়িতা সব আমরা এক জায়গায় বসিয়া গিয়াছি সুতরাং অধ্যাপক কেবল শাসন করেন, ছাত্র শাসিত হয়; অধ্যাপক উচ্চে, ছাত্র নীচে; এ ভাবটি এ বিদ্যালয়ের ভাব নয়। কারণ বয়সে জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় অধ্যাপক বড়ো হইলেও সাধনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান, সেখানে সকলেই সকলের সহায় ও বন্ধু। বিদ্যালয়ের সকলের মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটি যাহাতে স্থাপিত হয় তজ্জন্য এখানে প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে হয়। কী করিয়া সকলের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠতর হয় সেই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এখানে কাহারও কাজ মাথার, কাহারও কাজ হাতের, কিন্তু তাই বলিয়া কোনো অঙ্গের সঙ্গে কোনো অঙ্গের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নাই, সবাই যে এক কলেবরবদ্ধ, এ বোধের কোথাও ব্যত্যয় নাই। ইহার অনেক দিকেই অনেক অসুবিধা আছে তাহা জানি। কিন্তু তথাপি এ ভাবকে না রক্ষা করিলে আশ্রমের আদর্শই পীড়া পায়; আশ্রম আর আশ্রম থাকে না, তাহা আপিস হইয়া দাঁড়ায়। তখন মঙ্গলের স্থানে যন্ত্রের আবির্ভাব হয়।”

যে সঙ্কল্প লইয়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র, ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করে দেব শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞান-চর্চার যে সঙ্কীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়।” কিন্তু এ কথা বলিতেই হইবে যে কবি চালক ও নিয়ন্তা হইয়া নিজের আদর্শকে কখনও কাহারও স্কন্ধে চাপাইয়া দেন নাই। নানা বিরোধ ও অসঙ্গতির

মধ্যে, নানা সমস্যা, অভাব, অনটনের মধ্যেও তিনি যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশ সহকারে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার নিজের হৃদয় যতই ভরিয়া উঠিয়াছে ততই সেই পরিপূর্ণতার আনন্দ নিঃশেষে চারিদিকে ঢালিয়া দিয়াছেন আপনার প্রাণের আবেগে। "অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া যেমন দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া উঠে না কিন্তু সে যে পরিমাণে উজ্বল হইয়া উঠে, সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে" —ঠিক সেইরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরের দীপশিখাটি অনির্বাণ রাখিয়াছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এবং সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয় নিজের পথটি ঠিক চিনিয়া লইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিয়াছেন তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়কে। তিনি স্বভাব কবি। তাঁহার কবি-প্রতিভাকে মাঝে মাঝে উপবাসী রাখিয়াও তিনি শিক্ষা-বিজ্ঞানের গবেষণার সময় ও ক্ষমতা ব্যয় করিয়াছেন। ইহাতে কেবল তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই কিন্তু সমস্ত শিক্ষা-জগতই লাভবান হইয়াছে। তিনি শিক্ষক-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা যদি মনে করি যে, আমরা বালকদিগকে শিক্ষা দিব, আমরাই তাহাদের উপকার করিব, তাহা হইলে আমরা নিতান্ত সামান্য কাজই করিব। এভাবে যন্ত্র গড়া যায় এবং সে যন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও হয়। মনে রাখিতে হইবে যে বালকদিগের সাধনার এবং গুরুর সাধনার একই সমতল আসন—এখানে গুরু-শিষ্য সকলে একই ইস্কুলে মহাগুরুর ক্লাসে ভর্তি হইয়াছেন তখন আপনা হইতেই কাজ হইবে। যখন আমরা মনে করি আমরা দিব, অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহাদের চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোন সত্য পদার্থ দিতে পারি না।" রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই কথাগুলি পরিপূর্ণভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই আজ দেশ তাঁহাকে "গুরুদেব" বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছে।

নিজে ভারগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবটি কিছু কিছু আঘাত পাইয়াছিল। কবি নিজে কোনোদিন কোনো অধ্যাপককে অনুভবমাত্র করিতে দেন নাই যে, তিনি প্রভু এবং অধ্যাপকেরা তাঁহাকে সেইভাবেই দেখিবেন। তাঁহার ভাব এই যে আমরা সকলে মিলিয়া বিদ্যালয়ের কাজ করিতেছি—ছাত্র, অধ্যাপক এবং স্থাপয়িতা সব আমরা এক জায়গায় বসিয়া গিয়াছি সুতরাং অধ্যাপক কেবল শাসন করেন, ছাত্র শাসিত হয়; অধ্যাপক উচ্চে, ছাত্র নীচে; এ ভাবটি এ বিদ্যালয়ের ভাব নয়। কারণ বয়সে জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় অধ্যাপক বড়ো হইলেও সাধনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান, সেখানে সকলেই সকলের সহায় ও বন্ধু। বিদ্যালয়ের সকলের মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটি যাহাতে স্থাপিত হয় তজ্জন্য এখানে প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে হয়। কী করিয়া সকলের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠতর হয় সেই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এখানে কাহারও কাজ মাথার, কাহারও কাজ হাতের, কিন্তু তাই বলিয়া কোনো অঙ্গের সঙ্গে কোনো অঙ্গের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নাই, সবাই যে এক কলেবরবদ্ধ, এ বোধের কোথাও ব্যত্যয় নাই। ইহার অনেক দিকেই অনেক অসুবিধা আছে তাহা জানি। কিন্তু তথাপি এ ভাবকে না রক্ষা করিলে আশ্রমের আদর্শই পীড়া পায়; আশ্রম আর আশ্রম থাকে না, তাহা আপিস হইয়া দাঁড়ায়। তখন মঙ্গলের স্থানে যন্ত্রের আবির্ভাব হয়।”

যে সঙ্কল্প লইয়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহার মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র, ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করে দেব শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞান-চর্চার যে সঙ্কীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়।” কিন্তু এ কথা বলিতেই হইবে যে কবি চালক ও নিয়ন্তা হইয়া নিজের আদর্শকে কখনও কাহারও স্কন্ধে চাপাইয়া দেন নাই। নানা বিরোধ ও অসঙ্গতির

মধ্যে, নানা সমস্যা, অভাব, অনটনের মধ্যেও তিনি যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশ সহকারে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার নিজের হৃদয় যতই ভরিয়া উঠিয়াছে ততই সেই পরিপূর্ণতার আনন্দ নিঃশেষে চারিদিকে ঢালিয়া দিয়াছেন আপনার প্রাণের আবেগে। "অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া যেমন দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া উঠে না কিন্তু সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে" —ঠিক সেইরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরের দীপশিখাটি অনির্বাণ রাখিয়াছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এবং সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয় নিজের পথটি ঠিক চিনিয়া লইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিয়াছেন তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়কে। তিনি স্বভাব কবি। তাঁহার কবি-প্রতিভাকে মাঝে মাঝে উপবাসী রাখিয়াও তিনি শিক্ষা-বিজ্ঞানের গবেষণার সময় ও ক্ষমতা ব্যয় করিয়াছেন। ইহাতে কেবল তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই কিন্তু সমস্ত শিক্ষা-জগতই লাভবান হইয়াছে। তিনি শিক্ষক-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা যদি মনে করি যে, আমরা বালকদিগকে শিক্ষা দিব, আমরাই তাহাদের উপকার করিব, তাহা হইলে আমরা নিতান্ত সামান্য কাজই করিব। এভাবে যন্ত্র গড়া যায় এবং সে যন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও হয়। মনে রাখিতে হইবে যে বালকদিগের সাধনার এবং গুরুর সাধনার একই সমতল আসন—এখানে গুরু-শিষ্য সকলে একই ইস্কুলে মহাগুরুর ক্লাসে ভর্তি হইয়াছেন তখন আপনা হইতেই কাজ হইবে। যখন আমরা মনে করি আমরা দিব, অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহাদের চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোন সত্য পদার্থ দিতে পারি না।" রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই কথাগুলি পরিপূর্ণভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই আজ দেশ তাঁহাকে "গুরুদেব" বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছে।

॥ ৪ ॥

ছাত্র

আমাদের শাস্ত্রে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ আছে তাহা হইল "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।" এই শব্দ তিনটির মধ্যে যে ভাব-ব্যঞ্জনা আছে তাহা আজ আমরা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, যদি বালকেরা বেশ মন দিয়া পড়া-শুনা করিয়া কতকগুলি পাঠ্য-পুস্তকের অন্তর্গত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলেই আমরা মনে করি বুঝি কাজ হইল। ছেলেরা যদি এইটুকুও যত্নের সহিত করে তাহা হইলে লাভ বই ক্ষতি নাই, কিন্তু "অধ্যয়ন" শব্দটির অর্থ সুদূরপ্রসারী। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষায় তৃপ্ত হন নাই; তিনি বলিয়াছেন পাঠ্য-পুস্তক মুখস্থ করিয়া বালকেরা যেন তোতাপাখি বনিয়া যায়—ইহাতে তাহাদের মন খাটে না। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন ছেলেদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় পাস করিয়া কাজে ঢুকিতে হইবে। ছেলে মেয়ে কাহাকেও রেহাই দিই না। মেয়েদের যে আরও একটি মহান দায়িত্ব আছে জীবনে, তাহাদের শরীর ও মন ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে হইবে সেই কাজের জন্য, তাহাও আমরা ভুলিয়া যাই। "শিশুকাল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে, দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া, পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।"

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ বারান্দার কোণে একটি ক্লাশ খুলিয়াছিলেন। রেলিংগুলি ছিল তাঁহার ছাত্র। একটি কাঠি হাতে করিয়া চৌকিতে বসিয়া রেলিংগুলিকে লইয়া মাস্টারি করিতেন। রেলিংগুলির মধ্যে কে ভাল ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে তাহা একেবারে স্থির করাই ছিল। এমন কি ভাল-মানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান রেলিং ও বোকা রেলিংএর মুখশ্রীর প্রভেদও যেন তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন এবং তাহাদের মারিয়া ধরিয়া মাথার মধ্যে কিছু বিদ্যা ঢুকাইবার চেষ্টা করিতেন—কি করিয়া যে তাহাদের যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে তাহা যেন ভাবিয়া কূল পাইতেন না। একদিন রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের দুষ্ট ও মূর্খ মনে করিয়া মাস্টার সাজিয়া কল্পনায় তাহাদের

উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু যৌবনে সেই ছেলেদের জন্য তাঁহার হৃদয়ে কি অপরিসীম করুণা। তিনি লিখিয়াছেন, "বাঙালি ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনরূপ মসলা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতে হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধূলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গ-সন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি-এ, এম-এ পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধি-বৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া, সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না।"।

মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ তপস্যার দ্বারাই হইয়া থাকে। মানুষের শক্তির দুইটি দিক আছে; একটি তাহার সহজাত ক্ষমতা যাহার সাহায্যে সে অনেক কিছু সহজেই পারে, আর একটি দিকের নাম যাহা সে "করিতে পারিবে।" রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "পারের" দিকটাই মানুষের সহজ আর "পারিবের" দিকটাতেই তাহার তপস্যা। আমাদের পিতামহগণ যখন বলিয়াছিলেন "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" তখন তাঁহাদের মনে এই কথাই ছিল—কেবল পড়া মুখস্থ করার কথা তাঁহাদের মনে ছিল না। মনুষ্যত্বলাভের ইচ্ছা যাহাতে বালকের মনে জাগে তাহার জন্য তাঁহারা রীতিমত ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। সেকালে শিক্ষার যে প্রথা ছিল তাহাতে ছাত্রকে বাল্যকালেই নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া গুরুসন্নিধানে যাইতে হইত। যত বড় ধনীর পুত্রই হউক না কেন, প্রত্যেকেই একান্তমনে গুরুকে সেবা করিত,

আপনাদের দেহ ও মন পবিত্র রাখিতে প্রয়াস পাইত। কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিলে তাহাকে অধ্যয়ন স্থগিত রাখিতে হইত। তাহারা সর্বপ্রকার সাজ-সজ্জা বিলাস ব্যসন ত্যাগ করিয়া সমস্ত মনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিত কেবল সত্যের সন্ধানে, দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে ও নিজের নিজের অন্তর্নিহিত সমস্ত গুণগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে। এই যে অধ্যয়নের কাল তাহা বালকদিগের পক্ষে ছিল একটি ব্রত উদ্‌যাপনের কাল। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহাকে ঋষিগণ ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। সংযমের দ্বারা, ভক্তি-শ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠার দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ-সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।"

সুতরাং মনুষ্যত্বলাভের জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন—সেই প্রস্তুতিকালকে ব্রহ্মচর্যার সময় বলা হইয়াছে। উপনিষদ বলিয়াছেন, "ওঁ আপায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি।" অর্থাৎ আমার অঙ্গসমূহ বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। আমাদের ইন্দ্রিয়-সমূহ জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান। শিশু নানা জিনিস ছুঁইয়া, চাখিয়া, শুঁকিয়া সর্বানুভূতির দ্বারা একটি জিনিস লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছে—তাহা জ্ঞান। কিন্তু সে শুধু চোখ কান হাত পা লইয়া মানুষ নহে তাহার একটি মানসিক দিক আছে। নানা প্রকারের বৃত্তি-প্রবৃত্তি সেই মানসিক দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই বৃত্তিগুলিই আপনার বাহিরে প্রকাশিত হয় নানা কারণে অকারণে। স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, দ্বেষ প্রভৃতি মনের বৃত্তি-প্রবৃত্তি। ইহাদের যথার্থ ব্যবহারে মানুষ পরিবারতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া তোলে, যেখানে বাধিয়া যায়—সেখানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবার গড়ে, এইভাবে কত বিপ্লবের মধ্য দিয়া তাহাকে যাইতে হয়। প্রত্যেক মানুষকে আপনার মনটিকে বেশ ভালো রকমে বৃহৎ মনঃশরীরের সহিত মিলাইতে হয়, তাহা না হইলে মানুষ রক্ষা পায় না। যে পরিমাণে সে ভাল রকম মিলিতে পারে সেই পরিমাণেই তাহার পূর্ণতা লাভ হয়। সেই পূর্ণতার শিক্ষাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য—আশ্রমের শিষ্যের নিকটেও ইহাই তাহার তপস্যার লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "আমি চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে বাল্য-

কালে ব্রহ্মচর্যব্রত অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া শান্ত-সমাহিত-ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র উপায়।" আজ ছাত্র-শাসন-সমস্যার দিনে রবীন্দ্রনাথ আবার আমাদের শিক্ষালাভের, মনুষ্যত্বলাভের পথ কোন দিকে তাহার নির্দেশ দিতেছেন। ছাত্রকে এই পথে প্রেরণা দিবার দায় গুরুর।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই ছাত্রজীবনের বীজমন্ত্র।

"আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমতঃ সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণা করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না, কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্ল চিত্তে প্রসন্ন মুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্যলাভে ধর্মলাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্ব প্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মত পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভাল হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্য নিজের সুখ ও স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে—তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়। প্রত্যহ অন্ততঃ একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ

ক'রে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য তুমিও আমার সঙ্গে একবার উচ্চারণ করো :

ওঁ ভূর্ভুর্ব স্ব তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

রবীন্দ্রনাথ এই স্থানেই ক্ষান্ত হন নাই। পিতামাতা ও স্বদেশের প্রতি ছাত্রদের কর্তব্য কি সে সম্বন্ধেও অতি সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়াছেন। "পিতা-মাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা, তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা এমন কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্রেরা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারি না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ব ছিল, সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না, অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছুই নহে।"

ছাত্রগণ যাহাতে সর্বপ্রকার কর্মে নিষ্ঠাবান হইতে চেষ্টা করে সে সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন যে, তাহারা উঠা-বসা, লেখা-পড়া, স্নান-আহার প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে পরিচ্ছন্ন, শুচি ও সুরুচিসম্পন্ন হইবে। ঘরে বাইরে, শয্যায়, অশনে বসনে কোন প্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দিলে ছাত্রধর্ম ও জীবনধর্মকে খর্ব করা হইবে। যথাসম্ভব তাহারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজ নিজেদের হাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কেবল মুখে বলিয়া নহে কিন্তু লিখিত ভাবেও নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই সমস্ত পরামর্শ, নির্দেশ ও উপদেশ "শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্য-প্রণালী" পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে।

এই যে ছাত্রজীবন, এই সময়ে ছাত্রদের সকল প্রকার বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত না হইলে বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি, দরিদ্র গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এ সকল কোথা হইতে আসিবে? অনুকূল অবসরে ছাত্রদের

শিক্ষা দিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে—ইহা কবিগুরুর আশ্রমের একটি লক্ষ্য ছিল। জীবনে নিরাড়ম্বরতায় যে কোন লজ্জা নাই—এই কথা তাহাদের বার বার শিখাইতে হইবে।

প্রথম বয়সে বালকেরা আশ্রম-বিদ্যালয়ে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা জীবনের সুর উঁচু তারে বাঁধিবে, সমস্ত শিক্ষা আনন্দের সহিত আয়ত্ত করিয়া যৌবনে সংসারের মঙ্গলসাধন উদ্দেশ্যে কর্মে প্রবৃত্ত হইবে ইহাই ছাত্রদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কবিগুরু বলিতেছেন, অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উঠিবে —"এ যে বড় কঠোর সাধনা। ইহার দ্বারা না হয় খুব একটা শক্ত মানুষ তৈরী করিয়া তুলিলে, না হয় বাসনার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া মস্ত একজন সাধু পুরুষ হইয়া উঠিলে, কিন্তু এ সাধনায় রসের স্থান কোথায়? * * * মানুষকে যদি পুরা করিয়া তুলিতে হয় তবে সৌন্দর্যচর্চাকে তো ফাঁকি দেওয়া চলে না।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ইহা তো ঠিক কথাই, আত্মহত্যা তো সাধনার বিষয় হইতে পারে না—আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। জমিকে মরুভূমি করিয়া তুলিবার জন্য চাষী খাটিয়া মরে না। চাষী লাঙল দিয়া মাটি কর্ষণ করে। মই দিয়া ঢেলা গুঁড়া করে, নিড়ানি দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপড়াইয়া জমিটাকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলে—তখন কি আমাদের মনে হয় জমিটার উপরে উৎপীড়ন চলিতেছে? আমরা জানি যে এমনি করিয়াই ক্ষেত্রে ফসল ফলাইতে হয়। সত্য বলিতে কি, শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্যপালন শুষ্কতার সাধনা নহে। কেননা, যথার্থভাবে রসগ্রহণের ক্ষমতা লাভ করিতে হইলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই প্রয়োজন। রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে। সে পথে সমস্ত বিপদ এড়াইয়া পূর্ণতা লাভ করিতে যে চায়, নিয়ম সংযম তাহারই বেশি আবশ্যক। রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"

আমাদের বেশি দূর যাইতে হইবে কেন? চিত্রকলা কি সঙ্গীতকলা আয়ত্ত করিতে কি সাধনা করিতে হয় না? রূপের দ্বারা অরূপের দ্বারে পৌঁছাইতে কি কঠিন সাধনার প্রয়োজন, সুরের অতীতকে জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে অনুভব করিতে কি কঠোর তপস্যা করিতে হয় তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। শিক্ষার একটি অঙ্গ আয়ত্ত করিতে যদি এত কঠোর তপস্যা করিতে হয় তবে সমগ্র জীবনকে প্রস্তুত করিতে মনুষ্যত্বলাভের যে সাধনা তাহা কঠোর

হইলে ভয় পাইবার কি আছে? শিল্পসাধনায় যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ জীবনসাধনায় আছে কিনা তাহাই এখন বিচারের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "ব্রহ্মচর্য পালন বলিতে শুধু কৃচ্ছ্রসাধন মনে করিলে ভুল করা হইবে। নিয়মটা তো পুণ্য নহে পুণ্যলাভের পথ মাত্র।" বাহিরের নিয়মে মানুষ গড়া যায় না, ভিতরের শক্তির পূর্ণ উদ্বোধন না হইলে নিয়মের নিগড় শৃঙ্খলের ন্যায় ঝঞ্চন করিয়া বাজিতে থাকে, তাহাতে জীবনের সুর বাজে না। সংসারে নিয়ম তো থাকিবেই, কিন্তু যতক্ষণ না তাহার রূপ আনন্দের রূপ হয় তাহার মূল্য সামান্যই। তখন কবির মতে "নিয়মলোলুপতা ষড়্‌রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়। এটা মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ। কৃচ্ছ্রসাধনটাকেই লাভ মনে করিয়া শেষকালে আত্মঘাতে দাঁড়ি টানিতে হয়। ইহা আর কিছু নহে, নিবৃত্তিকেই একটা প্রচণ্ড প্রবৃত্তি করিয়া তোলা, গলার ফাঁস ছিঁড়িবার চেষ্টাতেই গলায় ফাঁস আঁটিয়া মারা।"

তাই দেখিতেছি রবীন্দ্রনাথ না ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি আবাসিক ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন নাই। কেবল ভাবের দোলায় দুলিয়া, প্রাচীনের অন্ধ অনুকরণে একটি তপোবন রচনা করিয়া আধুনিক যুগের সমস্ত প্রগতি একটি জায়গায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই। প্রাচীনকালে জীবনসাধনার ভিত্তিটা যে আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা আজও যে অব্যাহত আছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তিনি একথাও জানিতেন যে সেই আদর্শের "যত ঐশ্বর্য যত সৌন্দর্যই থাক, তাব গতিশক্তি যদি না থাকে তাহলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায় তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র, কলারও বৈকল্য।" তাই কবিগুরু আশ্রম-জীবনে যে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন তাহাতে সেখানকার বালকেরা তাহাদের শিক্ষাকাল "কৃচ্ছ্রসাধ্য" বলিয়া মনে করিয়াছে বলিয়া কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই।

ব্রহ্মচর্য ছাত্রজীবনের ভিত্তি। আমরা জানি, ভিত্তির কাজ ধারণ করা, কোন কিছুকে আকৃতিদান করা, তাই তাহা শক্ত করিয়া গড়িতে হয়, নতুবা তাহা কোন কিছুকেই আশ্রয় দিতে পারে না। শরীরে হাড়ের পত্তন যদি না থাকিত তবে পরম সুন্দর মানবদেহও পিণ্ডবৎ হইত। কোন চেহারাই খুলিত

না। তেমনি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত, আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তো সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত, আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তাহা নিতান্তই পাগলামি মাত্‌লামি হইয়া উঠিত।"

এই যে শক্ত ভিত্তি—ইহাই সংযম। ছেলেদের যে-সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা, সংসারের মাঝখানে থাকিলে তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবল শক্তিরই অপব্যয় হয়, মন দুর্বল এবং লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে না। একটুতেই আগুন লাগিতে পারে বলিয়া লোকে আগুনের উপর দখল রাখিয়া প্রদীপ জ্বালে। সেইরূপ প্রবৃত্তিগুলিকে অসময়ে জ্বলিয়া উঠিতে দিলে বালকের ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

এইজন্য যাহাতে বালকেরা জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্তই আবশ্যক। সংসারের মাঝখানে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংস্পর্শে, নানা চিন্তার সংঘাতে তাহারা অনাবশ্যক ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে। কবি বলিতেছেন, "প্রবৃত্তির অকালবোধন ও বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে নবোদ্গম অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।" তাঁহার মতে এইরূপ স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারিলে বালকদের উপকারই হইয়া থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাদের জন্য ইহা অতি সুখের অবস্থা। এই সময়ে তাহাদের অন্য কোন চিন্তা না থাকায় তাহাদের মনের ও শরীরের পূর্ণ বিকাশে কোন বাধা থাকে না এবং তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আস্বাদ ও আনন্দলাভ করে। নবাঙ্কুরিত সতেজ মনের যে বিমল আনন্দ তাহা তাহাদের শরীরের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ লাবণ্য সঞ্চার করে এবং ক্রমে তাহাদের আকৃতিতে ফুটিয়া উঠে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্তি ও হৃদয়ের তৃপ্তি।

শান্তিনিকেতনে ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার সহিত সংযম শিক্ষা না হইলে যাহা শান্ত, যাহা সুন্দর, যাহা শিব তাহা ক্ষণে ক্ষণে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রবৃত্তির বিক্ষোভ

চিত্তের অসংযমের সহিত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, শান্তি ও মঙ্গল কখনই একত্রে টিকিতে পারে না। সেইজন্য আশ্রম-বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সংযমবোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা discipline নহে; কেননা discipline বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয়। তাহা বহিরাগত বলিয়াই আত্মস্বীকৃত নহে,—কাজেই তাহা বিশেষ কোন কাজেরও হয় না, তাহার ফলও বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু যাহার ভিতরে ব্রহ্মচর্যের কঠোর সংযমের ভিত্তি শৈশব হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সমস্ত কর্মের প্রকাশ হইবে প্রাণময়, রসময়, গতিভঙ্গিময়, কোমল অথচ সরল সতেজ স্বাধীন ও সত্য। সংযম-শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ।

উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন স্বাধীনতা নহে, কৃচ্ছ্রসাধনও তেমনি সংযম নহে;—কেননা উভয়েই নেতিধর্মী। বালকের শিক্ষাকালে তাহার জীবনে যেন আনন্দ ও সংযম দুইটি একত্রে বিরাজ করে তাহাই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। অথচ এই শব্দ দুইটি শুনিলেই মনে হয় যেন তাহারা আপাতবিরোধী। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে এই দুইটি গুণ একত্রে প্রকাশিত হইলে মানুষের জীবনে দেখা দেয় সৌসম্য। যখন মানুষের প্রত্যেক কর্মে মনের সুষমা প্রকাশ পায় তখনই জানিতে হইবে তাহার মন পূর্ণ হইয়াছে, তাহার শিক্ষা সার্থক হইয়াছে। যেখানেই মাত্রাজ্ঞান ছাড়াইয়া যায়, সেখানেই ছন্দ ভাঙ্গিয়া যায়, সেইখানেই অসংযম দেখা দেয়। এইজন্য শুধু ব্রহ্মচর্য পালন করিলেই চলিবে না—জীবনের মধ্যে আনন্দেরও প্রয়োজন, সেই আনন্দের অজস্র প্রকাশ আছে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে। তাই বালকের শিক্ষায় চাই বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য। এই যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যানুভূতি, এই সুষমাময় জীবন শহরে পাওয়া সহজ নহে। কেননা, শহর মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈয়ারী হইয়াছে; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নহে। কবিগুরু বলিতেছেন, "ইট-কাঠ-পাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইব বিধাতার তো এমন বিধান ছিল না। * * * যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না—তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ-সংস্রব হইতে প্রতিদিনই দূরে চলিয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মধ্যে যে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম, উদার বিশ্বমৈত্রী, স্বার্থবিক্ষোভবর্জিত শম-দম-ত্যাগ ও তিতিক্ষা ছিল তাহা ভারতবর্ষের তপোবনেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।" চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়া ভারতবর্ষের যে সুষম মনটি তৈয়ারী

হইয়াছিল, সেই মনটিকে আবার আয়ত্ত করিতে হইবে। কবিগুরু মনে করেন ইহাই মানবসভ্যতার সার্থকতম পরিণাম।

তাঁহার মতে জীবনের প্রতি কর্মে ও ভাবনায় সংযম শিক্ষা দেওয়া দশটা-চারিটার মধ্যে ও গোটাকতক পুঁথির বচনে কখনই সম্ভব নহে এবং তাহা আশা করাও ভুল। সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আছে হাজার রকমের অসভ্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতি মুহূর্তে মানুষের রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে সুকুমার শিশুদের পক্ষে সুরুচির পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আশ্রম-বিদ্যালয়ে সংযম শিক্ষা প্রকৃতরূপে মনে ভিত্তি গাঁথিয়া বসিলে বালকেরা ভিতর হইতে যে শক্তি সঞ্চয় করিবে তাহারই উপরে নির্ভর করিবে তাহাদের জীবনের প্রত্যেক আচরণে সুষমা। তাহারা যদি বোঝে সুখ জিনিসটা কেবল নিজের, কিন্তু কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের, তখন নিয়মিত-জীবন নিগড়ের ন্যায় কঠিন হইয়া চাপিয়া বসিবে না। যেখানে বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণ লইয়া কথা, সেখানে নিজের উপস্থিত সুখ-সুবিধা অনেকটাই বাদ দিতে হয়। এই শিক্ষা ছাত্রদের যেদিন পূর্ণ হইবে সেই দিন নিয়ম আর তাহার বাহিরের জিনিস হইবে না—সম্পূর্ণ ভিতরের জিনিস হইয়া তাহাদের মুক্তির আস্বাদ দিবে।

আবাসিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের নিয়মের মধ্যে অবস্থান কেন প্রয়োজন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে সুস্পষ্ট মত ছিল তাহা আমরা তাঁহার নানা রচনাতেই পড়িয়া থাকি। তাঁহার মতে, "ভ্রূণকে পরিপূর্ণ ও সফল হইতে হইলে গর্ভের মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। সে সময়ে তাহাদের একমাত্র কাজ খাদ্য শোষণ করিয়া নিজেদের আলোকের জন্য, আকাশের জন্য প্রস্তুত করা। সে সময় তাহাদের আহরণ করিবার সময় নহে, চারিদিক হইতে শোষণ করিবার সময়। কাজেই প্রকৃতি-মাতা তাহাদের অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া ঘিরিয়া রাখে—বাহিরে নানা ঘাত, প্রতিঘাত ও অপঘাত হইতে দূরে রাখে—আপনার সস্নেহ বেষ্টনে তাহাদের রক্ষা করে যাহাতে কোন আকর্ষণেই তাহাদের শক্তি বিভক্ত না হইয়া পড়ে।"

শিক্ষাকালে বালকদেরও এই একই রূপ মানসিক অবস্থা থাকে। কবি বলিতেছেন, "এই সময়ে তাহারা একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে

যাপন করিবে; ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয় জানিয়া ও না জানিয়া খাদ্য-শোষণ করিয়া শক্তি সঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টি-সাধন করা।"

আশ্রম-বিদ্যালয় এবং আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে "আশ্রম" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে—তবুও এই অধ্যায়ে ছাত্রধর্ম আলোচনাকালে সেই একই চিন্তা আর একবার ভাবিয়া দেখিতে হইল, কেননা আজ ছাত্র-সমস্যা জীবনের অন্যান্য সকল সমস্যারই ন্যায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—এমন কি, মনে হয় বেশিই হইয়াছে। অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-ঘটিত যে সমস্যা আছে আমাদের সম্মুখে—শিশুর শিক্ষাসমস্যা, বালকের জীবন-প্রস্তুতি সমস্যা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। মানবশিশুকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা, তাহাকে কল্যাণের পথে চালনা করা আরও প্রয়োজনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ—একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। দেশের ভাবী নাগরিকগণ, একটি যুবসমাজ জাতির মেরুদণ্ড, তাহারাই যদি নিষ্ঠার সহিত তাহাদের জীবন নিয়মিত করিতে না পারে তাহা হইলে দেশের আর বাকী রহিল কি? যাহাই হউক, কবিগুরু মনে করিতেন যে আশ্রম-বিদ্যালয়েই ছেলেরা শিক্ষাকালে অক্ষুণ্ণভাবে শক্তিলাভ করিয়া পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারিবে।

রবীন্দ্রনাথের এই মতের সহিত অনেক শিক্ষাবিদের মতের মিল হয় নাই। বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থকগণ বলেন যে শিক্ষালাভের জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন মহাত্মাজীও স্বীকার করিতেন কিন্তু পরিবেশের জন্য যে গৃহ হইতে দূরে যাইতে হইবে কিংবা একটি আশ্রম গড়িয়া সেখানে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইবে ইহাতে তিনি একমত ছিলেন না। তাঁহার মতে গৃহের পার্শ্বেই শিক্ষার পরিবেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে গৃহ ও সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগে শিক্ষা বাস্তব ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। এ ছাড়া দেশের সকল শিশুকেই শিক্ষার জন্য আশ্রমে পাঠানো সম্ভব নহে এবং সম্ভব হইলেও সেই আশ্রমই একদিন নগরে পরিণত হইয়া একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। এই কৃত্রিমতার মধ্যে শিক্ষা বাস্তবতাবর্জিত হইতে বাধ্য এবং সেই অবাস্তব শিক্ষা হৃদয় ও মনকে ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। গৃহের বর্তমান পরিবেশ যে বালকদিগের শিক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে সে-কথা বুনিয়াদী

শিক্ষাবিদগণ অস্বীকার করেন না কিন্তু তাঁহারা ইহাও বলেন যে এই সমস্যা এড়াইয়া গেলেও চলিবে না। গৃহ-পরিবেশকে সুন্দর করিয়া তোলা শিক্ষা-প্রচেষ্টারই একটি অঙ্গ।

মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একদিকে যেমন নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে প্রয়োজন স্বাধীনতা ও মুক্তি—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়ে কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাও আলোচনার বিষয়। তিনি ছেলেদের ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।" "ছাত্রস্বরাজ" বা বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন-পদ্ধতি তখন পাশ্চাত্য বিদ্যালয়সমূহে বেশ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ভারতবর্ষে তখনও এই প্রথা অনুসরণ করা শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ উপযুক্ত বোধ করেন নাই। দুই একটি মিশনরী স্কুলে অল্প অল্প করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছিল মাত্র। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ কি সাহসের সঙ্গে ছাত্রদের এই স্বাধীনতা দিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। পরীক্ষাস্থানে কোনরূপ পাহারা বসানো আশ্রমে রীতি ছিল না। কবিগুরু বলিতেন ছাত্রদের অবিশ্বাস করিয়া তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত করার অর্থ হইল তাহাদের ব্যক্তিপুরুষকে অপমান করা। ছাত্রেরা আপন আপন প্রশ্নপত্র লইয়া যেখানে সেখানে বসিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিত। এমনও শুনিয়াছি যে নীচের ক্লাশের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উপরের ক্লাশের ছাত্রেরা সাইক্লোস্টাইল করিয়াছে কিন্তু প্রশ্নপত্র out হইয়া আশ্রমে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, এমন কথা তো কখনও শোনা যায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করিয়া থাকি, শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তাহারই একটি সম্পূর্ণ রূপ দিলে বালকেরা স্বাধীনতার দায়িত্ব বুঝিবে। রাশিয়ার চিঠিতে দেখি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "এখানকার ব্যবস্থা-ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার—সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের দেশের সমস্ত সমস্যার পূরণ হতে পারবে।"

ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে বড়রা অসুবিধাজনক আপদ ও ঔদ্ধত্য মনে করিয়া তাহা দমন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে তাহাদের স্বাধীন-

ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা এবং আপনাদের অসুবিধা দূর করিতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা পুষ্ট হয় না। এই শিক্ষা যথার্থভাবে হইলে একজনের শৈথিল্যে অন্যের যে অসুবিধা ও ক্ষতি ঘটিতে পারে এবং এই বোধটি যে সভ্য-জীবনযাত্রার ভিত্তি—সে সম্বন্ধে বালকেরা জীবনের প্রথম হইতেই সচেতন হইয়া উঠিবে। এই "সহযোগিতা-মূলক সভ্যনীতি" ছাত্র-ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথ বলেন যে দেশের লোকেরা যদি কর্ম-সমবায়ে ও সম্মিলিত শক্তিতে নিজেদের পরিবেশের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিতে পারে তবে সকলেই সুস্থভাবে বাস করিতে পারিবে। এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই আরম্ভ হওয়া উচিত এবং আশ্রমই তাহার প্রশস্ত ক্ষেত্র।

আশ্রম-বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ নিয়মনিষ্ঠা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল। আশ্রমের নিয়মপালন সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কর্তৃত্বভার তাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাহাদের নায়ক, অধিনায়ক নিজেরাই ভোটের দ্বারা নির্বাচন করিত এবং নিজেদের মনোনীত নায়কদের উপরে আশ্রমে নিয়মরক্ষার ভার দিয়া তাহাদের কথা শুনিতে প্রস্তুত থাকিত। এ সম্বন্ধে কোন অন্যথা হইবার উপায় ছিল না। ছাত্রদের নিজেদের "বিচার-সভা" ছিল। সেইখানেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও নিয়ম-শৈথিল্যের বিচার হইত।

বালকদিগকে কবি যেভাবে জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই বলি, "ব্রহ্মচর্যকাল হইতে সংযম-নিয়মের দ্বারা সবল ও নির্মল হইয়া চিত্তকে শান্ত ও প্রসন্ন করিয়া, অন্তঃকরণে ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বারা জগতের মধ্যে সজীব সরস ভাব ব্যাপ্ত করিয়া, কল্যাণ-কর্মের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান দ্বারা মঙ্গলভাবকে জীবনের মধ্যে সহজ করিয়া তুলিয়া অহিংসা ও দয়া-প্রেমের দ্বারা সকল চেতন জীবের সহিত যুক্ত হইয়া ঐশ্বর্যবিলাসকে তুচ্ছ জানিয়া, লোকভয় মৃত্যুভয়কে ঘৃণা করিয়া, ত্যাগ-নিষ্ঠ আত্মদমনের দ্বারা ধৈর্য বীর্য শিক্ষা করিয়া তবে আমরা সত্যভাবে সংসারের মধ্যে মানবজীবনকে ব্রহ্ম উপলব্ধির দ্বারা সার্থক করিতে পারি।" এই উক্তি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে এইরূপ শিক্ষা কেবল সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়। ইহারই অর্থ "অধ্যয়নং তপঃ।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে আমাদের দেশে সাধনা বলিতে সাধারণতঃ মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা বলিয়া মনে করে। কিন্তু তিনি যে সঙ্কল্প লইয়া শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করিয়াছিলেন,

তাহাতে চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাহিরে তাহার লক্ষ্য ছিল না। ব্যাপকভাবে যাহাতে ছেলেরা ভারতের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারে তাহারই একটি ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করিবার তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্য-পুস্তকের পরিধির মধ্যেই জ্ঞানচর্চা আবদ্ধ, ইহাতে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট ছিলেন না। সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত-বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত-সাধনের শিক্ষা ও চর্চাও বালকদের শিক্ষাসাধনার অন্তর্গত হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করিতেন এবং এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন, "যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে, তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই আমি অনেককাল চিন্তা করেছি।"

কাজে কাজেই যাঁহারা মনে করেন যে ব্রহ্মচর্যের কাল বড় কঠিন, বড় শুষ্ক তাঁহাদের এখানেই ভুল ভাঙিয়া যাইবে। সত্য বটে, আশ্রমে সত্যের অনুশীলনকর্মে বালকদের একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করিতে হইত; কিন্তু জীবনের কোন সাধনা নিষ্ঠা ব্যতীত সার্থক হইয়াছে? শিক্ষাজীবনে এই ব্রহ্মচর্যই নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠাই ব্রহ্মচর্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমরা সমস্ত দিন কত রকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই কত বাজে কথায় কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, এই যে জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে বলো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চলো না। * * * সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। * * * * গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল।"

কবি-গুরু আরও বলিয়াছেন, "কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন।" কিন্তু বালকদের পক্ষে প্রত্যেক দিন সেই সাধনার পথে স্থির থাকা, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা—কলম্বসের ন্যায় কম্পাসের দিকে চাহিয়া থাকা, হাল ধরিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব নহে একথাও রবীন্দ্রনাথ জানিতেন। ছেলেরা প্রতিদিনই একটি সফলতার মূর্তি দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, একটা কিছু না পাইলে তাহাদের শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, যতই দিন যায় নূতন কিছু না পাইলে তাহারা অধৈর্য হইয়া পড়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ

বালকদের জীবন স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহার সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার দ্বারা। তিনি লিখিয়াছেন, "একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদান-ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্রে, আহ্বান করেছিলুম এখানকার জলস্থল আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞান-সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী-গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎসব-প্রাঙ্গণে উদ্বোধিত করেছিলুম।" এইভাবে তিনি হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া বালকদের সাধনার পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বালকদিগের ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যেমন সুস্পষ্ট মত আছে তেমনি ছাত্রদের অন্যান্য কর্তব্য সম্বন্ধেও তাঁহার পরিষ্কার নির্দেশ আছে। যে-সময়ে তিনি তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন—সে সময়ে বাংলা-দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আগুন জ্বলিতেছিল। সেই অগ্নিময় যুগে বহু দেশভক্ত বাঙালী যুবক জীবন-মরণ পণ করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন। অনেক কিশোর-কিশোরীও এই সকল গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়া দেশের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করিয়াছেন বটে তবে হুজুগও যে তাহার মধ্যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না। এই সময়ে অনেক দেশপ্রেমিক অনুভব করেন যে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে এই বালকবালিকাগণকে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিতে হইবে। এই বোধ যাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে জাগিয়াছিল পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

ছাত্রগণকে রাজনীতি হইতে নিরস্ত থাকিতে যে-সকল উপদেশ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছিলেন তাহার বহু উদাহরণ তাঁহার লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। ১৯৩৭ সালে ১৪ই আগস্ট আন্দামানের অনশন-ব্রতী বন্দিগণের সহিত সহানুভূতি দেখাইবার জন্য শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও কর্মিগণ যে বিশেষ সভা আহ্বান করেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাহা এখানে উল্লেখ করিব। এই ভাষণ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-কালে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার যে মতামত ছিল তাহা জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়াও পরিবর্তিত হয় নাই।

সেদিন তিনি ছাত্র ও কর্মীদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন," আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার জন্যে তোমরা সভা আহ্বান

করেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো থাক কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পোলিটিক্যাল দশা-পাওয়ার উত্তেজনা উদ্রেক করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গত বলে আমি মনে করিনে।

দেশের বিশেষ অনুরোধে ও প্রয়োজনে আমার যা বলবার সে আমি আশ্রমের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, আজ আমার এখানে যদি কিছু বলতে হয় তবে বলব প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য।”

১৯২১ সালে বিদেশ হইতে এনড্রুস সাহেবকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রধারা লেখেন তাহা পড়িলেই বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে তিনি বিদ্যালয়ে সক্রিয়-ভাবে রাজনীতি চর্চার কোনমতেই পক্ষপাতী ছিলেন না। পাছে আমরা রবীন্দ্র-নাথকে ভুল বুঝি সেইজন্যে এই সঙ্গেই বলা উচিত যে ১৯৩৭ সালে ২রা আগস্টে কলিকাতার টাউনহলে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ ছিল যে ইংরাজ-শাসক-সম্প্রদায় অনশন-ব্রতীদের প্রতি যে কঠোর ব্যবহার করিতেছিল তাহা অনতিবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। শাস্তিদানের হৃদয়হীন পদ্ধতি যাহা পৃথিবীর অনেক স্থানেই চলিতেছে তাহা আধুনিক সভ্যতাকে লজ্জিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট এবং ইহা যে কতদূর অন্যায় ও অসঙ্গত তাহা রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাষায় প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারি যে পরিণত-বয়স্ক লোকেরা রাজনীতিতে যোগদান করিয়া আপনাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করিলে রবীন্দ্রনাথ তাহাতে আপত্তি করেন নাই কিন্তু, বালকেরা যে নানারূপ উত্তেজনায় যোগ দিয়া তাহাদের জীবনের প্রস্তুতিকালটি নষ্ট করিবে ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র মত ছিল না। উত্তেজনাকে সাময়িকভাবে উপভোগ করিবার নিরতিশয় লোভ সম্বরণ করা নেতাদের পক্ষে কঠিন এবং তাঁহাদেরই প্ররোচনায় অপরিণত-বুদ্ধি স্বল্পমতি বালক-বালিকারা সহজেই উত্তেজিত হইয়া এমন বিষম উৎপাত আরম্ভ করে যে তখন তাহাদের সামলানো দায় হইয়া উঠে। এই সকল উত্তেজনার অন্তে আসে অবশ্যম্ভাবী অবসাদ ও ক্লান্তি, দেশের কোন স্থায়ী কর্মে তাহাদের কোন ঔৎসুক্য থাকে না—কিন্তু দেশসেবার গঠনমূলক কার্যে

তাহাদের চিন্তা ও কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করিতে পারিলে যে সত্য সত্যই কাজ হইবে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যার সময়টিকে শক্তিসঞ্চয়ের কাল বলিয়াছেন—এই সময়ে বালকেরা রাষ্ট্র-সমস্যা সম্বন্ধে জানিবে, তাহার নানাদিক আলোচনা করিবে এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের পর তাহারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে কোন বাধা নাই।

"ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" প্রবন্ধে যে-সকল কথা তিনি বলিয়াছিলেন আজ তাহা বিশেষভাবে প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে। সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো। * * * * দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষ্যের অভাব নাই, সেজন্য গভর্ণমেণ্টের কোনো আইন পাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকার ভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ দ্বারের কাছে অনন্যকর্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।" পরাধীন দেশে একথা যত সত্য ছিল আজ স্বাধীন ভারতে একথা আরও কত সত্য তাহা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

তাঁহার ছাত্রেরা যাহাতে দেশের কাজে ব্রতী হইতে পারে তজ্জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তাহাদের উপর নানারূপ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। গ্রামে গিয়া নিরক্ষরদের শিক্ষা দান, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে সহজভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা—আশ্রমের ছাত্রেরাই করিত, সঙ্গে থাকিতেন একজন অধ্যাপক। দরিদ্রভাণ্ডার গঠন ও রক্ষার ভার ছাত্রদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। আহারান্তে শ্রদ্ধার সহিত অনাথ-আতুরদের অন্ন বিতরণ করাও তাহাদের প্রতিদিনকার কাজ ছিল। আশ্রমের রাস্তাঘাট তৈয়ারী করা, গৃহদ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, উদ্যান রচনা করা—এ সকলই আশ্রম জীবনের স্বাভাবিক কর্মধারার অন্তর্গত ছিল—তাই বলিয়া আশ্রমের শেষ পরীক্ষার প্রতিও কেহ উদাসীন ছিলেন না। শান্তিনিকেতনের ছেলেদের যে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার ফল ভালই হইত এবং তাঁহারা অনেকেই যে উত্তরকালে দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার নজির পাওয়া যাইবে শ্রীসুধীরঞ্জন দাশের "আমাদের শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে।

অধ্যাপকদের সেবা করা, তাঁহাদের প্রতি নির্বিচারে ভক্তি রাখা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশাবলীতে তিনি লিখিতেছেন, "অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নিবিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। * * * বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।" গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধের ন্যায়। বালকদিগের কল্যাণের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য পিতাকে অনেক সময় বজ্রমুষ্টি ধরিতে হয়। তখন ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা খাটে না—পুত্রকে পিতা কণামাত্র প্রশয় দেন না—পুত্রের প্রবৃত্তিকে দমন করিতে, ব্যবহারকে সংযত করিতে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করিতে পিতাকে যখন রুদ্র রূপ ধরিতে হয় তখন পুত্রের নিকটে তাহা অন্যায় বলিয়া মনে হইলেও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই পীড়াবোধ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন। বালকের মধ্যে বিশ্বহিতবোধ যাহাতে পরিপূর্ণ মাত্রায় স্বাভাবিক হইয়া উঠে তাহারই চেষ্টায় পিতা কিংবা গুরু তাহাকে শাসন করিবেন যেমন শিশুর পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হইয়া না উঠে ততদিন মাতা কিংবা ধাত্রী তাহাকে বাহির হইতে হাত ধরিয়া চালান। শিশু বিদ্রোহী হইলেও ছাড়িয়া দেন না। শিশুর চলার শক্তি স্বাভাবিক হইলে তবেই সে মুক্তি পায়। তেমনি গুরুর শাসন আপাতভাবে অন্যায় মনে হইলেও শিষ্যের তাহা মানিয়া চলাই উচিত—ছাত্র ও গুরুর সম্পর্ক সত্য হইলে বালকের নিকটে শাসনের সত্য নিশ্চয়ই একদিন প্রকাশিত হইবে। যেদিন ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে মিত্রবদাচরেৎ ॥"

তখন তাঁহাদের মনেও এই কথাই ছিল। যতক্ষণ না পুত্রের শিক্ষা তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিবে ততক্ষণ তাহাকে বাহির হইতেও শাসন করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "বাহিরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনোই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যখনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনই পিতাপুত্রের মাঝখানের আনন্দ-সম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে। তখনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়,

অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়। * * * তখনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতা দ্বারা রক্ষা করেন।"

"ছাত্রশাসন তন্ত্র" প্রবন্ধে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইংরাজ-শিক্ষকদের শাসন-পদ্ধতিকে নিন্দা করিয়াছেন। কেননা, সেখানে ছাত্র ও গুরুর মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে নাই। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই, সেখানে আমাদের শ্রদ্ধার অভাব হইবে না ইহা তো মানব-প্রকৃতির ধর্ম। সেই ধর্মের বিকৃতি হইলেই বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানের অভাবে শ্রদ্ধাও ঠিকমত স্থানে পৌঁছায় নাই। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে ধর্ম সম্বন্ধ—ইহা ভারতবর্ষে আমাদের অস্থিমজ্জাগত। এই সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল বলিয়াই সেদিন ছাত্র শিক্ষকের আচরণে বিদ্রোহ করিয়াছিল। ইংরাজের স্বাজাত্যবোধ এত দূর উর্দ্ধে উঠিয়াছিল যে বালকদের স্বাজাত্যবোধকে খর্ব করিতে, তাহাদের অপমান করিতে ইংরাজ-শিক্ষকের অন্যায় মনে হয় নাই। সেইদিন গুরুদেব স্বয়ং বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

আজ আবার সেই কথা স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে। বালকদিগের বয়ঃসন্ধিকালে তাহাদের মন নানা অনুভূতির বাষ্পে ভরিয়া থাকে। এই সময়ে অল্প একটু নাড়া খাইলেই তাহা ফাটিয়া পড়ে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড় বিচিত্র করিয়া গড়া,—বালকের প্রকৃতি তো বটেই। সেইজন্য বালকদিগকে দিবারাত্র সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিতে দিলে সংসারের তরঙ্গ তাহাদের ক্রমাগত ধাক্কা মারিবে। তখন তাহারা আত্মশক্তি প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবে যেমন তেজ মাটি ফাটিয়া বাহির হইতে চায়—এই বিকাশ বেদনার স্ফুরণ তখন পাকা মানুষের কাছে বৃহৎ অপরাধ হইয়া দেখা দেয়। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য বালকদিগের পক্ষে বড় সুখের, কেননা তাহারা এই সময়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে একটি স্নিগ্ধ অবস্থার মধ্যে থাকে। তখনই ইহাদের মধ্যে যে অসীম সম্ভাব্যতা আছে তাহা উপযুক্ত পরিবেশে এবং উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমায় ফুটিয়া উঠিতে পারে।

আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার

যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম তাহাই দান করিবেন। যাহা এই বালকদের দিবেন তাহা একেবারে খাঁটি দিবেন। নিজের স্বার্থকে তাহার সঙ্গে এতটুকুও মিশাইবেন না। বালকদের মঙ্গলের জন্য তিনি ভয় সঙ্কোচ, আরাম, বিশ্রাম সকলই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। নিজের লাভ লোকসান, খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই বালকদিগের শিক্ষাসাধনার সহিত ওজন করিয়া দেখিবেন না। তিনি বালকদের সমস্ত দুর্বলতা, ঔদাসীন্য ও অজ্ঞানতা জানিয়াও তাহাদের তুচ্ছ করিবেন না। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া যেরূপ মাটির নীচেকার ক্ষুদ্র বীজটিকে বক্ষে ধরিয়া লালন করে সেইরূপ সেই গুরুকে আজ আমরা চাই যিনি এই শিক্ষাজগতের দুর্দিনে আসিয়া হাল ধরিয়া বসিবেন। ছাত্রধর্ম সার্থক করিতে পারেন সেই গুরু যিনি আজ এই প্রচণ্ড আলোড়নের দিনে শিষ্যদের কাছে টানিয়া বলিতে পারিবেন,

"হে বিধাতা,

দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধন,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা বিসর্জ্জন।
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে!
নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।"

॥ ৫ ॥

লক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথের যে শিক্ষাপদ্ধতি তাহার পূর্ণ লক্ষ্য কি এবং এ যাবৎকাল বিশ্বভারতীতে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলশ্রুতিই বা কি—ইহা আজ জনসাধারণের নিকটে তুলিয়া ধরিবার দিন আসিয়াছে। যে দুরূহ সাধনায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে প্রেরণা জুগাইয়াছিল তাঁহার "দেশ"। জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারে প্রত্যেক ভারতবাসীকে প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যে দেশেরই কর্তব্য ইহাই দেশকে শিখাইতে কবিগুরু জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সেই অধিকারলাভের জন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে—আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে—তাহা মানুষকে অভিভূত করে না,—তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। * * * আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব ইহাই শিক্ষার ফল।"

তুলসী দাস বলিয়াছেন, "অহজগ দুঃখ নানা, সবেতে কঠিন জাতি অপমানা।" জগতে নানা রকম দুঃখ আছে কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠিন দুঃখ হইল জাতির অপমান। রবীন্দ্রনাথ এই দুঃখ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই দেশকে সর্বোচ্চ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে নামিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি দেশের ছাত্রসমাজকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে, দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, মূঢ়তা কদর্যতা সব কিছুকে অত্যুক্তিবর্জিত ক'রে জেনে দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। * * * * আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তার পরে পরের সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। * * * নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই আমরা অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে জাগাতে পারি, তাতে মঙ্গল আমাদেরও, অন্যেরও।"

তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য হইল জাতীয় শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া দেশকে মনুষ্যত্বলাভে সাহায্য করা যাহাতে বিশ্বসভায় দেশ প্রতিষ্ঠার আসনলাভ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে দেশে যে শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল তাহাতে তিনি শিক্ষার সেই বিশিষ্ট লক্ষ্য দেখিতে পান নাই। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের জীবনে কোন সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। * * * শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং কী শিখিব, এ দুটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার বেশি ধরে না। জীবনের কোন লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে—ইহার কোন অর্থই নাই।"

সত্য বটে, শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে ব্যবহারিক সুযোগলাভ একটি বিশিষ্ট অংশ কিন্তু তাহা শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্যমাত্র। শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য হইল মানবজীবনের পূর্ণতাসাধন। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষ অর্থোপার্জনে ক্ষমতাবান হইবে ইহা তো ন্যায্য কথা কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা তাহার জীবনের সম্পূর্ণতালাভ। ইহা কেবল মনুষ্যত্ব বিকাশের দ্বারাই ঘটে। ইংরাজ-শাসক যে শিক্ষা প্রচলিত করিয়াছিল তাহাতে এই লক্ষ্যে কাহারও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাই। তাহাতে দেশের লোকের জীবিকার লক্ষ্যই বড় হইয়া উঠিয়াছিল, কোন একটা আদর্শলাভের চিন্তা বড় হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে * * * একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, একথা যদি না মানি, তাহলে নিতান্ত ছোট হয়ে যাই।"

শিক্ষার লক্ষ্য হইবে শিক্ষার্থীর মনের দাসত্ব মোচন করা। অর্থাৎ তাহাকে নির্ভীক করা। উপনিষদ বলিতেছেন, "অভীঃ"। সেই শিক্ষাই দেশের ছেলেমেয়েদের দিতে হইবে যাহাতে তাহারা বলিতে পারে আমরা সব পারি—সব পারিব। এই আত্মবিশ্বাস ও আশা—ইহাই মনুষ্যত্বলাভের লক্ষ্য, এই লক্ষ্যের কথাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন। আশা করিবার ক্ষেত্র বড় হইলেই মানুষের শক্তিও বড় হইয়া উঠে। প্রত্যেক লোকেরই আশা যে পূর্ণরূপে সফল হইয়া উঠে এমন নহে, কিন্তু নিজের মনের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকিলে প্রত্যেকেই

নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। ইহাই দুর্জয় প্রাণ-প্রচেষ্টা যাহা জাগাইয়া তোলাই শিক্ষার প্রকৃত কাজ। এই প্রাণ-প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠিলে মানুষ অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। তখন সে কেবল কেরানী বা ডেপুটি হইয়া তৃপ্ত থাকে না। যাহাতে সেই শিক্ষার আদর্শে ছাত্রের লক্ষ্য নিবদ্ধ হইতে পারে তাই গুরুদেব বলিতেছেন, "ওঠো জাগো, লক্ষ্যবস্তু লাভ না হওয়া পর্যন্ত থামিয়ো না। * * * তুমি কেরানীর চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইএর মতো কোন ক্রমে ইস্কুল-মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে।"—রবীন্দ্রনাথের মতে এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশের সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। * * * ইহা বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড় মূঢ়তা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে একথা আমাদিগকে বোঝায় না। আমাদের সব ইস্কুলেও এ-শিক্ষা পাওয়া যায় না।

যে শিক্ষার দ্বারা বালকদিগের দৃষ্টিপ্রদীপটি জ্বলিয়া উঠিবে—যে আলোকে তাহারা মনুষ্যত্বলাভের পথটি দেখিতে পাইবে সেই শিক্ষাই গুরুদেবের সাধনার লক্ষ্য। এই শিক্ষার পথে বালকেরা ক্রমে ক্রমে প্রকৃতি ও মানুষ, প্রাচীন ও আধুনিক, গ্রাম ও শহর, তপোবন ও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটি যথার্থ সমন্বয় দেখিতে পাইবে এবং সেই সমন্বয়-দৃষ্টি লাভ করাই শান্তি-নিকেতনের শিক্ষার আদর্শ। যাহাতে কেবলমাত্র বালকদিগের ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ না হইয়া উঠে কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাহাদের চিত্তের সম্পূর্ণ যোগ ঘটিতে পারে সেই ইচ্ছাই ছিল গুরুদেবের মনে, কেননা তাহাই ভারতের শিক্ষা। গীতা বলেন—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধে পরতস্তু সঃ॥"

"ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হইয়া থাকে কিন্তু ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা হইলেন তিনি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সহিত মানুষের যে যোগ-সাধন হয় তাহা আংশিক, মনের দ্বারা বিশ্বের সহিত যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তাহা ব্যাপকতর; কেননা, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় না। সেই যোগ সম্পূর্ণ হয় বোধের দ্বারা।" রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, বোধের

দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ হয় তাহা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারা আমরা সমস্ত জগতে তাঁহাকেই উপলব্ধি করি, যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র বলিতেছেন, "এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করাই হইল শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।" ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা।

এইরূপ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা মানুষকে অভিভূত করে না কিন্তু সর্বপ্রকার ভয়, সঙ্কোচ, হীনতা, দীনতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব হইতে মুক্তি-দান করে; এই শিক্ষায় আমাদের "ছোট আমি" "বড় আমির" নিকটে পরাভূত হয় এবং বিষয়-বুদ্ধির গহ্বরে পড়িয়া মানুষ প্রাণ হারায় না। আজ যে আমাদের সকলের মনে হইতেছে মানুষ আত্মকল্যাণের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার আত্মার অমরতার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পঙ্কিলতার আবর্তে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া মরিতেছে—সেই অবস্থা হইতে কে আমাদের মুক্তি দিবে? কবিগুরু সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে আমাদের রক্ষা করিবে আমাদের শিক্ষা। সেই শিক্ষা কেবল কেরানী হইবার শিক্ষা নহে, ডাক্তার উকিল এনজিনিয়ার হইবার শিক্ষা নহে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি এই শিক্ষা,—তাহা জীবন-সাধনার শিক্ষা—প্রকৃত মিলনের শিক্ষা। সেই শিক্ষার লক্ষ্য বিচিত্রকে লইয়া, বহুকে লইয়া একটি মিলনের সম্বন্ধ সৃষ্টি করা—ইহাই সভ্যতা। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন সেখানে তাহার সৃজনকার্য দুর্বল। কিন্তু মানুষের মিলনজাত যে সৃষ্টি তাহার প্রসার বহুদূর-বিস্তৃত—তাহাই যথার্থ সভ্যতা। এই জগতে গ্রাম-শহর, বিধি-ব্যবস্থা, ধর্ম-কর্ম, শিল্প-সাহিত্য, আমোদ-আহ্লাদ যাহা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সকলই মানুষের মিলনজাত একটি বৃহৎ সৃষ্টি। গুরুদেব বলিয়াছেন, "এই সৃজনের মূল শক্তিই মানুষের সত্য সম্বন্ধ। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন, যেখানে বিরুদ্ধ, সেখানে তাহার সৃজনকার্য নিস্তেজ। সেখানে সে কেবল কলে চালানো পুতুলের মতো চিরাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলে, আপন জ্ঞান, প্রাণ ও প্রেমকে নব নব আকারে প্রকাশ করে না। মিলনের শক্তি সৃজনের শক্তি।" প্রকৃতির সহিত, দেশের সহিত, দেশের মানুষের সহিত ও সর্বশেষে বিশ্বের সহিত জ্ঞানে ও সাহচর্যের দ্বারা যে মিলন—সেই মিলনের ফলে বিশ্বশক্তির যে উপলব্ধি তাহাই ছিল গুরুদেবের শিক্ষার লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থা ও তাহার লক্ষ্য জীবনকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত ও তাহা অবাস্তব এমন অভিযোগ কখন কখনও শোনা যায়। এই অভিযোগ

যে কত ভিত্তিহীন তাহা কবিগুরুর জীবনদর্শন এবং তাঁহার কর্ম ও সাধনা বিশ্লেষণপূর্বক দেখিলে বুঝিতে পারিব যে তিনি মূলতঃ কবি হইলেও তাঁহার সমস্ত কর্ম কি সজীব ও বাস্তবমুখী। কবিমানস ও বাস্তবচিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তো তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। পদ্মাবক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দেখিয়াছিলেন বাংলাদেশের অবস্থা। রূপ-রস-গন্ধে ভরা কি বিচিত্র অপূর্ব তাঁহার দেশ। আবার দেখিয়াছিলেন রোগে জীর্ণ, অভাবে দীর্ণ, কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন, নির্যাতিত, অপমানিত তাঁহার দেশ। এই দুই বিরুদ্ধ অবস্থা তাঁহাকে কি প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাই তাঁহার সমস্ত সাহিত্যে, তাঁহার সমস্ত কর্মে। সেই সময়েই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে দেশের মধ্যে যে-সকল বিরুদ্ধ ও বৈচিত্র্য আছে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনাই স্বদেশসেবার প্রথম ও প্রধান কাজ। রবীন্দ্রনাথ স্থিতধী পুরুষ—তাঁহার দূরদৃষ্টিতে এই সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে একদিন না একদিন ইংরাজকে ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে কিন্তু যে ভারত ইংরাজ-শাসনের জগদ্দল প্রস্তরের নীচে নিরুপায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে তাহার কি উপায় হইবে? ইংরাজ তাহার শক্তিরূপ আমাদের দেখাইয়াছে, মুক্তিরূপ তো দেখায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে সেই মুক্তি আসিতে পারে কেবলমাত্র প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা।

কবি সেদিন যে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিলেন তাহার মধ্যে ছিল সেই মুক্তির আহ্বান। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি সমালোচকেরই যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল তাহা বলিলে নিতান্ত ভুল হইবে না। কবির শিক্ষাপরিকল্পনার মূলটি ছিল দেশের মর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সমাজের কল্যাণশক্তির উপরেই চিরকাল নির্ভর করিয়াছে। রাজা করিয়াছেন যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যরক্ষা—বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই দেশের সমাজই অতি সহজভাবে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছে। সমাজের পরিচালনাতেই আমাদের আত্মপ্রসার ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশে এই সকল হিতকর কর্মের দায়িত্ব দেশের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপনাদের ধর্মের একটি অঙ্গ মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন সেদিন এবং তাহাতেই দেশের প্রাণশক্তি সতেজ ও সবল হইয়া বাঁচিয়াছিল। ব্রিটিশ আমলে বিদ্যাদানের দায়িত্ব স্টেটের বা সরকারের হাতে থাকায় দেশের ভাষা ও দেশের প্রথা, দেশের আচার বহির্ভূত হইয়া এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছিল।

তর্কের খাতিরে অনেকেই বলিয়াছিলেন সেদিন, ইংলণ্ডের শিক্ষাভারও তো সে দেশের সরকারের উপরে ন্যস্ত, সে দেশে তো এরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহারা একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বিলাতরাজ্যের স্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত আর আমাদের দেশের সরকার সমাজের কেহই ছিলেন না; তাঁহারা ছিলেন সমাজের সম্পূর্ণ বাহিরে। আমাদের দেশের নেতৃবর্গ সেই সময়ে যে "জাতীয় বিদ্যালয়" গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে এ সত্যটি সম্পূর্ণ ধরা পড়ে নাই তাই তাঁহারাও বিলাতী শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণেই একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এদিকে গুরুদেব গেলেন ইতিহাসের প্রাচীন পথে। যতদিন আমাদের সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষায় থাকে নাই ততদিন বাহিরের নানা উপদ্রবেও দেশের শ্রী ভ্রষ্ট হয় নাই। তাই তিনি শিক্ষার উপরে রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে স্বীকার করিলেন না, রাষ্ট্র-পরিচালিত শিক্ষাপদ্ধতিকেও গ্রহণ করিলেন না। তিনি জানিতেন যে রাষ্ট্রের পরিধি যত সঙ্কীর্ণ হইবে এবং সমাজের পরিধি ও দায়িত্বভার যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই দেশের কল্যাণশক্তি পুষ্ট হইয়া মানুষের পঙ্গুভাব দূর করিয়া তাহাকে সতেজ ও সবল করিয়া তুলিবে। "নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত ও চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়।" এই আত্মরক্ষার শিক্ষা বিদ্বেষের দ্বারা, সংঘাতের দ্বারা পূর্ণ হয় না, কিন্তু শুভবুদ্ধির দ্বারা, বিশ্ববোধের দ্বারা সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ ও কল্যাণময় হয়। সাম্রাজ্যরক্ষার চিন্তায় যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রাণ পাইয়াছে, সে শিক্ষা-প্রণালী কোনমতেই শুভবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। কাজেই দেশের ছেলেরা যাহাতে সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মশক্তির দ্বারা নিজেদের দেশকে সর্বপ্রকারে মুক্ত করিতে পারে সেইরূপ ছাত্রসমাজ গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থাতে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থা যে সম্পূর্ণরূপে যুগ-প্রয়োজনের দ্বারা নিয়মিত হইয়াছিল একথা আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি। দেশের এক অতি অনিশ্চিত ও দুঃখময় পরিস্থিতির মধ্যে কবির আবির্ভাব, কবিমানসের উন্মেষ, পরিস্ফুরণ ও প্রসার ঘটিয়াছিল। তিনি সেই পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে কি প্রচণ্ডভাবে সচেতন ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনদর্শনের গভীরতা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব ছিল যেমন প্রবল, আমাদের সমাজ-

জীবন ছিল তেমনিই দুর্বল, বলিতে গেলে একেবারে নিশ্চল। দুইটি শক্তি সমকক্ষ না হইলে দেশের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, রাষ্ট্রের প্রতিযোগীরূপে সমাজশক্তি দাঁড়াইতে পারিলে তবেই রাষ্ট্রের ক্ষমতার মধ্যে যতি ও সংহতি পাওয়া যায়। কবির দৃষ্টি ছিল এই সত্যে নিবদ্ধ। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটিয়াছে, আমাদের দেশেও ইহার প্রমাণ আছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ সেই সমাজকে গড়িতে বসিলেন যে সমাজ রাষ্ট্রের প্রবল ক্ষমতাকে খর্ব করিয়া দেশে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবে। রাষ্ট্র যখন একেশ্বর হইয়া মানুষকে পীড়নের দ্বারা সঙ্কুচিত ও রিক্ত করিয়া তুলিতেছিল তখন এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল—যে শিক্ষা মানুষের জড়ত্বকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, যাহা মানুষকে প্রাণ দিবে। তবেই তো রাষ্ট্রের প্রতাপ মানুষের পদতলে নত হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসার, সর্বাঙ্গীন নিরাময় সুস্থভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার ও বিশ্রাম-হীন তৎপরতা চাই।" জীবনের শক্তি বলবতী থাকিলে বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের সহিত লড়িতে পারা যায়। আমাদের দেশের সেই শক্তি স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা দীপ্তিময়ী করিবার সাধনায় ব্রতী হইলেন।

সমালোচকের মুখে একথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে তপোবনধর্মাশ্রয়ী যে শিক্ষা-পদ্ধতি তাহা আজকালকার দিনে সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব। রবীন্দ্রনাথ পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার জীবনাবেগকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, একথা আজ নূতন করিয়া বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কি প্রচণ্ডভাবে গতিশীল ছিল তাঁহার প্রাণশক্তি তাহার প্রমাণ দিকে দিকে ছড়াইয়া আছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে, সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে। একেবারে বিদীর্ণ, বিপর্যস্ত হবে কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কাল স্রোতের তলদেশে অন্তর্নিহিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও—পৃথিবীর এইরকম নিয়ম।" যিনি এই গভীর জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিবেন একথা ভাবিতেই পারা যায় না। কিন্তু তিনি জানিতেন যে আগামীকালকে

গড়িতে হইলে তাহা অতীতের স্মৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে কাজ হইবে না; কেননা মানুষের সমস্ত গতি অতীত হইতে ভবিষ্যতের অভিমুখে। তাহা অস্বীকার করিলে পৃথিবীর ইতিহাসকেই অস্বীকার করিতে হয়।

তবে সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ-বণিকের শিক্ষা-পদ্ধতি ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে প্রাচীন ভারতের তপোবন-শিক্ষাধারা ভিন্ন অন্য কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা খুব পরিষ্কারভাবে চিত্রিত ছিল না। কাজেই প্রথম দিকে তাঁহার সমস্ত শিক্ষা-ভাবনা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-বিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি নিজেও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে ও অকপট ভাষায় দেশের লোককে বলিয়াছেন, "আমি যখন এই শান্তি-নিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না।" সকলে মিলিয়া একটি জানা পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া এক নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিকে গড়িয়া তুলিবেন ইহাই ছিল কবির লক্ষ্য। গুরুদেবের সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই।

কবিগুরু বলিয়াছেন শিক্ষা শুধু সংবাদ বিতরণ নহে এবং মানুষ কেবল সংবাদ বিতরণ করিতে জন্মগ্রহণ করে নাই। জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাহা গ্রহণ করিবার শিক্ষাই হইল প্রকৃত শিক্ষা-সাধনা এবং মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে পূর্ণ করিয়া উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে শিক্ষা-পদ্ধতি ইংরাজ আমাদের দেশের জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহাতে শিক্ষার এই দিগন্ত-বিস্তৃত লক্ষ্য ছাত্রের সম্মুখে প্রতিভাত হয় নাই। ইহার ফলে অন্ন-সংস্থানের উপায়মাত্র মনে করিয়া আমরা ইংরাজের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। ইংরাজের যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের সংস্রব ঘটে নাই। তাই ডেভিড হেয়ারের ন্যায় মহাত্মারা যে শিক্ষার দ্বারা ভারতের ছাত্রসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহার প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হইল না এবং পুলিস কর্তা ও ইংরাজ শাসক-বর্গের তাড়নায় ইংরাজী শিক্ষার যে শুভদিক তাহা নষ্ট হইয়া, শিক্ষাকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করিয়া দিল।

(আমাদের সভ্যতার যে মূল আশ্রয় আমাদের সমাজ একথা ইংরাজ-শাসকবর্গ বুঝিতে পারে নাই।) পারাটাও খুব শক্ত কথা। কাজেই রবীন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে সেই মূলটিকে শক্ত করিয়া গড়িতে হইবে। হিন্দুসভ্যতার

মূলে আছে সমাজ আর য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে আছে রাষ্ট্রনীতি। কবি বলিতেছেন, "সামাজিক মহত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্বেও পারে।" কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণ যাঁহারা সমাজসেবাকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া ছাত্রদিগকে উদ্বোধিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন সেদিন, তাঁহারা নানাভাবেই বাধা পাইয়াছিলেন, একথা আমরা সকলেই জানি। সত্য বলিতে কি, কোন কোন পুরাতন নথিপত্রে এমনও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, পরিমাণের প্রয়োজন ছাপাইয়া কোন শিক্ষক ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। বিদেশীয় ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ করা ভিন্ন শিক্ষার অন্য কোন পন্থা নাই এই চিন্তাও এই সময় দেশের লোকের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাই চাকুরি-জীবনে মোক্ষলাভ করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করাতে সমগ্র জীবনে ইহাই ছিল তখনকার দিনে একমাত্র লক্ষ্য। এইরূপ শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা-প্রণালী যে কিরূপ সাংঘাতিক তাহা রবীন্দ্রনাথেরই দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল সেদিন। যে শিক্ষা-প্রণালীতে প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে যাহা-কিছু শিক্ষা দেশের ছেলেরা পাইবে তাহা বিদেশ হইতে আনিয়া তাহাদের উপর চাপাইয়া দিতে হইবে, কেননা দেশের কোন সম্বল বা পৈতৃক মূলধন নাই—তাহার মত দীন শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি আর কি হইতে পারে? এবং সেই শিক্ষাটুকুও বালককে হাসপাতাল জাতীয় নির্মম বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে —ইহাতে কি মানুষের মনের বা দেশের মুক্তি ঘটিতে পারে? তাই দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলির কোন মীমাংসা দেখিতে পান নাই। কিন্তু সেই মীমাংসার আভাস পাইয়াছিলেন দেশের পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীতে। ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে গুরু ও শিষ্য আপন আপন জীবনের পূর্ণতালাভ করিয়াছিলেন। "শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীনকালে গুরু ও শিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।" বিশ্বভারতীর শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং এইজন্যই যে শিক্ষা-প্রণালী একদিন ভারতবর্ষে সার্থক হইয়াছিল, যে শিক্ষা-ধারার সফলতা সম্বন্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রমাণ আছে, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি কবিগুরু যে আকৃষ্ট হইবেন

এবং তদ্রূপ শিক্ষার লক্ষ্যে যে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

জীবনের অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই এই সম্পূর্ণ বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ধারা পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তপোবন-শিক্ষাপ্রথা বৌদ্ধযুগে যেমন পূর্ণমাত্রায় চলে নাই, এযুগেও তেমনি চলিবে না। ইংরাজের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমূল উৎপাটিত করিয়া কেবলমাত্র বৈদিক শিক্ষা-ধারা প্রচলন করিলে তাহাও যে অবাস্তব হইবে তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তিনি "শিক্ষা-বিধি" প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "যে-দেশে সামাজিক শিক্ষাশালার বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে-দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।"

আবার আর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, "নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সবল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। মানুষের জীবন এক ছাঁচে ঢালা নহে। জগতের সমস্যাও প্রত্যেক যুগে এক নহে, কাজেই একই শিক্ষা-পদ্ধতি চিরকাল চলিতে পারে না। একই শিক্ষা-প্রণালী প্রত্যেক শিশুর প্রতি প্রয়োগ করাও যায় না।"

অতএব রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা যে যুগোপযোগী ছিল না তাহা কেবল কল্পনার বুদ্বুদমাত্র ছিল একথা বলা ভুল। বরঞ্চ, একথা বলা চলে যে কবির দূরদৃষ্টির সহিত সমসাময়িক লোকের দেখিবার ক্ষমতা না থাকায় তাঁহারা কবিকে ঠিকমত বিচার করিতে পারেন নাই।

পুস্তকসর্বস্ব শিক্ষায় মানুষের সমস্ত শক্তির চরম বিকাশ হয় না, একথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ সেই পুস্তক-সর্বস্ব শিক্ষাই আজও আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা। বালকের শক্তির চরম বিকাশ করার শিক্ষা যদি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে বাল্যকাল হইতেই সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পুস্তক-সর্বস্ব শিক্ষায় বালকের সমস্ত শক্তির সদ্ব্যবহার হয় না এবং জীবনের প্রতি কোন আগ্রহবোধও জাগে না। সেই আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তিকে গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টাই আদর্শ শিক্ষা।

কেননা, সুদৃঢ় ইচ্ছাই প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষকে "মানুষ" হইবার পথে চালনা করে। গুরুদেবের শিক্ষার লক্ষ্য হইল বলিষ্ঠ দৃঢ় ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তি তৈয়ারী করা। এই লক্ষ্যেই দৃষ্টি রাখিয়া গুরুদেব বলিয়াছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয় মনের তৎপরতা প্রথম হইতেই অনুশীলিত হোক এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। * * * সকল অবস্থার জন্য নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্বসাধন করায়, অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্য-চর্চায় নহে, পৌরুষ-চর্চায়, বলিষ্ঠ কর্মঠ করায়—শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।"

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আরম্ভে এই "পৌরুষ-চর্চাকে" বালকদের শিক্ষায় কেহ কেহ এত বড় করিয়া ধরিয়াছিলেন যে তাঁহারা কঠোর ব্রহ্মচর্যা বা "ডিসিপ্লিন" শিক্ষাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে অজিত চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, "ডিসিপ্লিন জিনিসটাকে মঙ্গল-চর্চার স্থানে রাজা বলিয়া আমাদের অভিষিক্ত করিতে হইল। * * * প্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্যন্ত নিয়ম, নিয়ম, নিয়ম, বাঁধাবাঁধি, কষাকষি, বিচার, দণ্ডবিধান—সব কড়াক্কড় রকম ব্যবস্থা হইল। সুখ আরাম কোথায় গেল, তাহাকে কঠোরতার চাপে একেবারে পিষিয়া মারিয়া ফেলা হইল। * * * ছেলেরাও বাহির হইতেই সব বিষয়ে সাড়া দিত, কিন্তু তখনকার আবহাওয়া যে খুব নির্মল উদার ছিল এমন তো মনে হয় না। * * * ভিতরের শক্তির পূর্ণ উদ্বোধন না হইলে নিয়মের নিগড় নিগড়ই থাকিয়া যায়, তাহা আনন্দের জিনিস হয় না। নিয়ম তো থাকিবেই, কিন্তু তাহার রূপ আনন্দের রূপ হওয়া চাই,—সে যেন আনন্দেরই বাহিরের প্রকাশ হয়। সেই আনন্দ আমাদের মধ্যে তখন ছিল না।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় আশ্রমকে নিঃসন্দেহেই সেই বড়ো সৃষ্টির দিক হইতে দেখেন নাই। তিনি নিজের জোরে নিজের মতে নিজের শাসনেই এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অন্যকে যে-পরিমাণে স্বাধীনতা দিলে বিদ্যালয়ের কাজ যথার্থ আন্তরিক সাধনার কাজ হইয়া উঠিতে পারে, তিনি নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তিবশতঃ সে-পরিমাণে ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। * * * তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে সেই প্রচণ্ডতা ছিল যাহা মঙ্গলশঙ্খ ও সৌন্দর্যপদ্মকে বাদ দিয়া

কেবল গদার আঘাত ও চক্রের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করাকে সম্ভবপর বলিয়া মনে করিত। সুতরাং শান্তিনিকেতন-আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ অতি অল্পকালেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।"

যে পৌরুষ-চর্চার শিক্ষা দ্বারা হিংসার পথে দেশকে স্বাধীন করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস করা হয় সেইরূপ পৌরুষ-চর্চা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। এই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা বহু স্থানে প্রচলিত হইতে দেখিয়া কবি অত্যন্ত পীড়া বোধ করিয়া শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে অতি স্পষ্ট ভাষাতেই বলেন, "সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই আমাদের লক্ষ্য ; সেই কথাটাকেই কান দিয়ে শোনা এবং সত্য বলে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই।" এই মুক্তির আদর্শ লইয়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পত্তন ঘটে। এই মুক্তির ও স্বাধীন শিক্ষার আহ্বানকে রাজনৈতিকগণ কর্মহীনতা, শক্তিহীনতার রূপান্তর বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে-শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তাহার লক্ষ্য তামসিক নহে—সেই শিক্ষায় মন মুক্ত ও অভয় হয়, কর্ম বিশুদ্ধ হয় এবং লোভের মোহ দূর হয়। "সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তাহা হইলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলিতে পারি এবং বণিকের ভূরি-সঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের সহিত ব্রহ্মবান্ধব মহাশয়ের শিক্ষাভাবনার যে সংঘাত ঘটে তাহাতে তাঁহারা আর একসঙ্গে কাজ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ চাহেন আনন্দময় স্বাধীন শিক্ষার প্রচলন, ব্রহ্মবান্ধব চাহেন ব্রহ্মচর্যার কৃচ্ছ্রসাধন—এই দুই আদর্শে সংঘাত লাগিলে ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া রাজনীতিতে যোগ দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই হিংসাত্মক শিক্ষা যে ভুল তাহা বুঝিতে পারিয়া রবীন্দ্রনাথেরই নিকটে তিনি গভীর আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হইয়াছে।" ততদিনে তিনি একথা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে ভিতরের শক্তিকে নিজের নিয়মে কাজ করিতে না দিলে বাহিরের নিয়মে মানুষ গড়া যায় না—তাহাতে নীরস উগ্র আচার-পরায়ণ মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু সে মানুষ সমাজে ঠিকমত খাপ খাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের সমন্বয়-সাধন—কাজেই মঙ্গলের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা

বালকেরা ভিতর হইতে আপন আপন দুর্বলতা শোধন করিয়া কল্যাণের পথে চলিবে—ইহাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার লক্ষ্য।

সাধনা ও শিক্ষা যাহাতে সহজেই মিলিতে পারে, দেওয়া ও নেওয়া যাহাতে সহজেই অনুষ্ঠিত হয়, সংযমকে আশ্রয় করিয়া যাহাতে স্বাধীনতার উল্লাস প্রকাশ পায়, যাহাতে সঙ্কীর্ণ দেশকাল-পাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধি খণ্ডিত না হয়, কিন্তু বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে বালকেরা গ্রহণ করিতে পারে কবিগুরুর শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার ইহাও একটি বিশেষ লক্ষ্য। তাহারা পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে, জ্ঞানের আলোচনায় তাহাদের মন উদারতার ব্যাপ্তিতে ভরিয়া উঠিবে তাহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিয়ত প্রচেষ্টা। সঙ্কীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা তাহাদের সরল আনন্দকে তিনি বাধা দিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু তাহাদের কর্মানুষ্ঠান বিনয়ের দ্বারা বিভূষিত হইবে ইহাই ইচ্ছা ও আশা করিয়াছেন।

মানুষের শিক্ষার এই যে লক্ষ্য তাহা কেবলমাত্র একাগ্র সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে যাহাতে এই সাধনার সুযোগ থাকে, যাহাতে বিশ্বের সহিত পরিচিত হইতে তাহাদের কোন অন্তরায় না ঘটে, তাহার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। এমনই একটি পরিবেশ রচনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শান্তিনিকেতনে। এই স্থানে বালকেরা সর্বদাই সজাগ ও সচেতনভাবে শিক্ষাসাধনায় রত থাকিবে এবং কর্মের দ্বারা মনকে শান্ত ও স্নিগ্ধ রাখিতে সুযোগ পাইবে। তিনি বার-বার বলিয়াছেন কর্ম যেন আনন্দের দ্বারা উৎসারিত হয়, কেননা কর্ম-প্রেরণার মূলে আনন্দ না থাকিলে তাহা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রসাধনে, নিরানন্দ সাধনার দ্বারা কোন কিছুই পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায় না। এই সত্য তিনি তাঁহার শিক্ষা-জীবনেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই দেখি বালকদিগের শিক্ষায় তিনি বলিতেছেন, "আনন্দের সঙ্গে পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি বেশ সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে বললাভ করে। আনন্দের ভিতর দিয়া মুক্তির হাওয়ার মধ্যে শিশু-চিত্ত যেমন বিকশিত হয়, তেমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। * * * যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহাই শুষ্ক, কঠিন ও সঙ্কীর্ণ। ইহাতে কি সে-ছেলের মানসিক পুষ্টি, চিত্তের

প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতালাভ হইতে পারে? সে কি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, সে কি স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে?" আনন্দময় শিক্ষা—আনন্দেই উৎসারিত শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতির লক্ষ্য।

শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা লক্ষ্যের মধ্যে একটি লক্ষ্য হইল শিক্ষার্থীকে কৃতিত্ব-অর্জনে সহায়তা করা, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। সামাজিক জীবনে ব্যবহারিক কৃতিত্বের সমাদর যে অতি উচ্চে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন ইহা অত্যাবশ্যক হইলেও যথেষ্ট নহে। যাহাকে সংস্কৃতি বলে তাহা বিচিত্র; তাহা মনের সংস্কারসাধন করিয়া আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা হইতে তাহার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করিয়া লয়। এই সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা নানাদিকে বিস্তৃত এবং যাহাদের মন সুস্থ ও সবল তাহারা সংস্কৃতির নানাবিধ প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা হইতে তাহা কিভাবে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করিয়া আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকে একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

আমাদের নিজের দেশের যাহা কিছু সাধনা তাহার সহিত নিবিড়ভাবে পরিচয় না ঘটিলে, ভারতের যে চিত্তসম্পদ সে সম্বন্ধে অবহিত না হইলে বালকের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের জ্ঞানকে যথার্থরূপে আয়ত্ত করার পক্ষে যে কত বাধা তাহাও রবীন্দ্রনাথ একরূপ চোখে আঙুল দিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আমাদের ভাষা-শিক্ষার সহিত ভাব-শিক্ষা হয় না এবং ভাবের সহিত সমস্ত জীবনযাত্রাও নিয়মিত হয় না; কাজেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটি যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবার সুযোগ ঘটে না। তাই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন, "আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

স্কুল-কলেজের বাহিরে যে একটা বিরাট দেশ পড়িয়া আছে তাহার কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সহিত দেশের একটা ঘনিষ্ঠ-যোগ স্থাপন করা যে একান্ত প্রয়োজন, ইহাও যে শিক্ষার একটি লক্ষ্য হওয়া

উচিত এ সম্বন্ধে "ছাত্র সম্ভাষণ" প্রবন্ধে গুরুদেবের মতামত দেখি অতি সুস্পষ্ট। অন্য দেশে সেই যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। কেননা সে সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটি অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গড়িয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের সেই ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই, কাজেই দেশের অধিকাংশ ছেলেই দেশের সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া গিয়াছে। যাহাতে শান্তিনিকেতনের বালকেরা স্বদেশকে মুখ্যভাবে ও সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের আয়ত্তে আনিতে পারে এবং স্বদেশের সেবা করিবার জন্য যথার্থরূপে যোগ্য হইতে পারে, সেইজন্য আশ্রম-শিক্ষার লক্ষ্য হইল প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে যোগস্থাপন করা—কেননা প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞান, ভাব, চরিত্র নির্জীব ও নিস্ফল হইয়া থাকে। ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিস্ফলতা হইতে রক্ষা করা শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়াছেন। দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা ছাত্রেরা দেশের চিত্ত হইতে আপনাদের জীবন-রস সংগ্রহ করিয়া তাহা সর্বদেশে সঞ্চারিত করিবে। ইহাতেই জাতির চিত্ত প্রসারিত হইবে এবং তবেই সে অন্য দেশ হইতে নূতন ধারা গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে পারিবে। জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিমূল শিথিল হইলে মানুষ কখনই তাহার সাহায্যে জীবনের লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে না।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা যে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করিতে পারে নাই তাহার কারণ দেশের মাটির সহিত তাহার সংযোগ হয় নাই। যুগ-সমস্যার সহিত পদক্ষেপ করিয়া এ শিক্ষা-ব্যবস্থা চলিতেছে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষার দুর্বলতা এইখানেই। ইহা একান্তভাবেই বাহিরের জিনিস, অন্তরের জিনিস নহে। যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহারই সাহায্যে আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব। যে কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পনাকালে তাহা সে দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত করাই সমীচীন। আমাদের দেশের বিদ্যা সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির দ্বারা দেশের শিক্ষা গভীরভাবে প্রভাবিত। পরে মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব, জ্ঞান ও ভাব ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে। এ সমস্ত প্রভাবই আমাদের

শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে নানা আকারে প্রকাশ পায়। অবশেষে য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "অতএব আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিক ভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।" আবার আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ করতে হবে।"

বস্তুতঃ দেশের সহিত যতদিন না পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় ঘটিয়াছে ততদিন পর্যন্ত তাঁহারও কর্মীরূপ প্রকাশ পায় নাই। এবং এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই তিনি পল্লী সংস্কার-শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যাহাতে বালকেরা বুঝিতে পারে যে মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামে। সেইখানে তাহার প্রাণকেন্দ্র, সেইখানেই দেশের লক্ষ্মীর আসন। ধনপতি কুবের যক্ষপুরী গড়িতে পারেন বটে কিন্তু সৌন্দর্য, বিদ্যা, স্বাস্থ, শিক্ষা ও আনন্দ হইল লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দান। তাঁহাদের বন্দনা করিতে হইবে—ওই গ্রামের পূজা-ভূমিতে। কেননা মানুষের ক্রিয়াশীল শক্তি ও তাহার ক্রিয়ার মধ্যে কল্যাণময় সম্বন্ধ রক্ষা না করিতে পারিলে একদিন বস্তুজগৎ আমাদিগকে গ্রাস করিবেই। এই চিন্তাতেই গুরুদেব লিখিয়াছেন, "সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি। * * * প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা।" বস্তুতন্ত্রের সাধনায় দেখা যায় যে মানুষ ক্ষমতা ও অর্থ লাভ করিয়া সাধারণতঃ মানুষকে অবজ্ঞা করে—এই অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে কথা তিনি "রক্তকরবীতে" বলিয়াছেন সেই বাণীই কি আমরা শুনি না হলকর্ষণ, সীত-যজ্ঞ, শিল্পোৎসবের নানা মন্ত্রে, গানে, ভাষণে ও অর্ঘ্য নিবেদনে ?

দেশের সহিত ছাত্রদের এই যে যোগ স্থাপন যাহা অতি সহজেই হওয়া উচিত তাহা আমাদের বিদ্যালয়গুলির দ্বারা হয় নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে বড় ক্ষোভ ছিল। অথচ তিনি দেখিয়াছিলেন সে য়ুরোপে বালকেরা "যে বিদ্যালাভ করে তাহা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে, লেখাপড়ায়, কথাবার্তায়, কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে

জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদের পরিবেশনের উপায় করিয়াছে। এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে—কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমনভাবে মিলিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা শুষ্ক ও নির্জীব।"

সমাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া যুগধর্ম অনুসারে যেন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ইহাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল। আত্মিক সাধনায় ভারতবর্ষ যেমন একদিন জগৎসভায় উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল বস্তুজগতের উপরও তাহার অধিকার ছিল তেমনি প্রবল। এই দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে ভারতবাসী একদিন শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া জগতে সমাদর লাভ করিয়াছিল আজ তাহারা সেই অধিকারচ্যুত হইয়া কি হীন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! ইহার কারণ কি ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছিল কবিরই জীবনে। তিনি বলিলেন, পাশ্চাত্যদেশসমূহ বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপক চর্চার দ্বারা পৃথিবীকে কামধেনুর ন্যায় দোহন করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, বিজ্ঞানের সাহায্যে পশ্চিম রোগ ও কুসংস্কারকে জয় করিয়াছে—অথচ আমাদের দেশে রোগ হইলে আমরা এখনও ভূতের ওঝাকে ডাকি, গ্রহশান্তির জন্য দৈবজ্ঞের দ্বারে ধরণা দিই, বসন্তমারীকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য শীতলা দেবীকে পূজা করি।

যদি নানা কুসংস্কার অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে সুস্থ সবল জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানশিক্ষাকে ব্যাপক ও সত্যরূপে প্রসারিত করিতে হইবে একথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলিয়াছেন। যেদিন আমরা বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা করিতে শিখিব সেদিন আমাদের আত্মশক্তি জাগ্রত হইবে, একথা সুনিশ্চিত। যেদিন আমাদের আবালবৃদ্ধবণিতা বুঝিবে সে বিশ্বশক্তি বিশ্বনিয়মেরই ত্রুটিবিহীন প্রকাশ সেদিন আর আমরা আকস্মিকতাকে মানিব না। কিন্তু যে-সামান্য বিজ্ঞানশিক্ষা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে দেওয়া হয় এবং যেরূপ অবাস্তবরূপে তাহা পরিবেশন করা হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে বিজ্ঞানকে "আমরা আমাদের বাহন করিলাম না—কিন্তু তাহাকে কেবল বহন করিয়াই চলিলাম। ভারতবর্ষে এঞ্জিনিয়ার ছাত্র

সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মত কিছুই করিতেছে না; কিংবা ডাক্তার-ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল অথচ শারীর-বিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা কোন নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না—শিক্ষার এরূপ লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। শিক্ষার এই শক্তি-হীনতা, বুদ্ধির এই কৃশতা, এই নির্জীবতা হইতে বালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

ছেলেরা চিন্তা করিবে, নিজেরা সন্ধান করিবে, নিজেদের হাতে কাজ করিবে, এমনতর মানুষ তৈয়ারি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, তাহাদের মতের প্রতিবাদ করিবে না কেবল পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র এমন মানুষ তৈয়ারির বিধান অন্যরূপ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, যে শিক্ষার লক্ষ্য যদি মনুষ্যত্বলাভ হয় তবে দেশের ছেলেদের শিশুকাল হইতেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও স্বতন্ত্র চেষ্টার সুযোগসুবিধা দিতে হইবে। এই সর্বার্থ-সাধক শিক্ষার উদ্যোগ যদি আমরা না করি তবে গুরুদেব বলিতেছেন, "আমরা সর্ব-প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব —ইহা নিশ্চয়।"

বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে কেবল যে কতকগুলি ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, উকিল প্রভৃতি তৈয়ারি হইবে ইহা যেমন রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল না, আবার কেবলমাত্র উদ্ভাবনী-শক্তিসম্পন্ন কাজের লোক তৈয়ারি করা বাঞ্ছনীয় হইলেও কবির নিকটে ইহাই সব ছিল এমন কথাও ঠিক নহে। তাঁহার দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আরও অনেক উচ্চ সুরে বাঁধা। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা-নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানা-ঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য, কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীনকালে ছিল তপোবন; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হইয়াছিলেন।" এইরূপ কর্মের সাধনাকেই কবি মনুষ্যত্ব-সাধনার সহিত একাত্ম করিয়া দেখিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিকটে এই কর্মসাধনা, সত্যের জন্য

নিষ্কাম আত্মনিয়োগ তিনি আশা করিয়াছিলেন। তিনি আশ্রমের জনৈক ছাত্রকে কোন সময়ে লিখিয়াছিলেন, "তোমরা আমার উচ্চতম সাধনার সঙ্গী। তোমাদেরই জীবনের মধ্যে আমার সাধনার পূর্ণতার সার্থক মূর্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছি—আমাকে তোমরা নিরাশ করিয়ো না—তোমাদের সকলের কাছে আমার এই প্রার্থনা। আশ্রমের সকল ছাত্রকেই আমার আশীর্বাদ জানাইয়ো। তোমাদের অন্তরের কেন্দ্রস্থল হইতে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব আপনার সমস্ত সৌন্দর্য ও পবিত্রতা লইয়া ঈশ্বরের অভিমুখে বিকশিত হইয়া উঠুক। তোমরা মহৎভাবে চিন্তা করিতে শেখ—উদারভাবে কর্ম করিতে থাক—অন্ধ-সংস্কারের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্যের মধ্যে তোমাদের মুক্তি হউক এবং যেখানেই যখন তোমরা থাক চারিদিকেই মঙ্গল বিকীর্ণ করিয়া বিরাজ কর—প্রতিদিনই জীবনের মহৎ লক্ষ্যের দিকে চিত্তকে স্থাপন কর এবং প্রতিদিনই ভক্তির সহিত তাঁহাকে স্মরণ কর যিনি তোমাদিগকে স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা ও অসৎপ্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিয়া অনন্ত জীবনের অভিমুখে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন।"

এই পত্রটি পাঠ করিলে গুরুদেবের শিক্ষার মূলবাণী আমাদের নিকটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঈশোপনিষদ বলিয়াছেন, "আপন আত্মার মধ্যে সকল আত্মাকে এবং সকল আত্মার মধ্যেই নিজের আত্মাকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনি আর প্রচ্ছন্ন থাকেন না, তাঁহার সত্য প্রকাশিত হয়।" বিশ্বের বিবিধ জ্ঞান, কর্ম এবং মানুষের সংস্রবে ও পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সত্য যেমন নিজে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তেমনি সকলকে আহ্বানও করিয়াছিলেন এই সত্যের সাধনাতে। তাঁহার আশ্রমে ধর্মশিক্ষা পঠন-পাঠনের একটি বিষয়মাত্র ছিল না, কিন্তু সেখানে এমন একটি সত্যের পরিবেশ ছিল যে সকলের অলক্ষ্যে বালকদিগের মনে ধর্মবোধ জাগিবার সুযোগ ঘটিত। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের কর্তব্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর। কারণ মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর এক দিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন বা ইস্কুলের বিদ্যা নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি অমৃতরস অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।"

পূর্বেই বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি ছিল জাতীয় স্বকীয়তার উপরে। তিনি বলিতেন যে প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট আদর্শ আছে এবং নিজেদের সভ্যতাকে একটি নির্দিষ্ট প্রবাহে পরিচালিত করিবার প্রবণতাও আছে। জাতির এই স্বকীয়তাই তাহার সমাজব্যবস্থা ও তাহার শিক্ষাব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এই শিক্ষার ভিত্তি জাতির মর্মমূলে, তাহার বিকাশে জাতির হৃদয়বৃত্তির বিকাশ, তাহার উৎকর্ষে জাতির অন্তর্নিহিত সত্তার উৎকর্ষ। এই শিক্ষা জাতির জীবনের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে মিলিত হইলে তবেই তাহা সার্থক হইয়া উঠে। অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার স্বকীয়তা কেবলমাত্র তপোবন শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে কিন্তু তাহার ভিত্তিমূল গ্রথিত আছে আন্তর্জাতিক শিক্ষার উপরে। তিনি দেখিলেন, ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির মিলনভূমি। তাহাদের বিচিত্র সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে ভারতের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ সেই বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপস্থিতিতে সমাজে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ঘটিতে পারিত তাহা প্রাধান্য লাভ না করিয়া দেশে মিলনের প্রচেষ্টাই দেখা গিয়াছে। এই যে ঐক্যমূলক সভ্যতা যাহা আজ জগতে মরিতে বসিয়াছে তাহাই লাভ করা শিক্ষার লক্ষ্য ও বিশ্বমানবের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হওয়া উচিত। তাই দেখি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা জাতির সভ্যতার সাঙ্গীকরণের যে সাক্ষ্য আছে তাহা তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল এবং ভারতে বিশ্বসভ্যতা, বিশ্বমৈত্রী কি ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে এই চিন্তাই গুরুদেবের মনে প্রধান হইয়া উঠিল।

বিদ্যালয়ের সূচনাকালের দিনগুলিতে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে জীবনকে বড় করিয়া জানিয়া বিবিধ বিষয়ের চর্চায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের আয়োজন। ক্রমে তাহারই সহিত যুক্ত হইল দেশের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির যোগসাধনা। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া গুরুদেব সেই যোগকে আরও ব্যাপক, আরও বিরাট সভ্যতার সংস্পর্শে আনিয়া শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বমানবিক ক্ষেত্রে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেন। "যাহাতে তাঁহার মাঠের বিদ্যালয়ের সহিত জগতের সম্বন্ধ অবারিত হইতে পারে"—তাহাই এখন হইতে দেখি তাঁহার শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য। ১৩২৯ সনের বার্ষিক উৎসবের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "আজ আমরা মনে

করছি, আমরা নিজের ইচ্ছায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলুম। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এক সময়ে আমরা এই বলে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি যে এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা বড়ো করব * * * * দেখলুম আমাদের হাতে গড়া পরিধির মধ্যে এ কুলোল না। সমস্ত বিশ্বের অতিথি আজ এর দ্বারে এসে চিত্তের দাবি করছেন, এই অতিথিসেবার মহৎ দাবির সঙ্গে আমাদের কার্যের আয়োজনকে মিলিয়ে চলতে হবে।"

এই যে বিশ্বমানবতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যে বিশ্বসাংস্কৃতিক যোগের আয়োজন করিয়াছিলেন তিনি, তাহা আজকালকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রভৃতির ন্যায় স্থূল ব্যাপার নহে। তাঁহার চিন্তার মূল ছিল নিগূঢ় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিতরে; তাহার ভিত্তি রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি, "জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে গণ্ডির ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডির বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।" রবীন্দ্রনাথের মনে এই চিন্তা যতই পুষ্ট হইতে লাগিল তাঁহার শিক্ষার আদর্শ ততই বিস্তৃত এবং লক্ষ্য গভীর ও উচ্চতর হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন যে আমাদের অস্তিত্বের কোন অর্থই থাকে না যদি না অন্যের সহিত আমাদের যোগ থাকে। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই ও সত্যকে পাই। যাহাতে তাঁহার আশ্রমে এই যোগ সত্য হইতে পারে সেই ইচ্ছাতে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার্থী, পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনকে তাঁহার বিদ্যালয়ে সাদরে স্থান দিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি পূর্ণমাত্রায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। যখন পৃথিবীর নানা দেশ হইতে পণ্ডিতবর্গ-সমাগমে শান্তিনিকেতনে একটি যৌথ পরিবারের ন্যায় আন্তর্জাতিক সংস্থার সূচনা হইল তখন রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রাণমন ঢালিয়া গড়িয়া তুলিলেন। লেভি, উইণ্টারনিজ, টুচ্চি, ফর্মিকি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ; এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, এলমহার্স্ট প্রভৃতি মানবহিতৈষী কবিগুরুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে রূপ দিয়া বিশ্বভারতীকে সার্থক করিয়া তুলিলেন।

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণতি তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। একদিন বেদ-ব্রাহ্মণের সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা তাঁহার বিদ্যালয়ের কাজ চলিবে ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। ক্রমে ক্রমে যখন শিক্ষার লক্ষ্য

সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধি গভীরতর হইল, যখন সত্য শিক্ষার সমস্ত দিক যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল তখন তিনি লিখিলেন, "আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি। * * * আমি মনে করি আমার ধর্মও তেমনি। সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করে' সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ করে সার্থক হতে পারবে। জীবনের সহজ সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করে নিজেকে নিরাপদ করা আমার দ্বারা ঘটল না। বিশ্বে সত্যের যে বিরাট বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা স্থান পেয়েছি তাকে কোন আড়াল তুলে খণ্ডিত করলে আত্মাকে বঞ্চিত করা হবে এই আমার বিশ্বাস।" জীবনের এই পরিণতি ও চিন্তার এই সকল পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করিয়া প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁহার "রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে" লিখিয়াছেন, "এই আশ্রমটি কবির জীবনের তাপমান যন্ত্রের মত; উত্তরকালে কবির জীবনে যে-সব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যে-সমস্ত নবভাবের সমাবেশ হইয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানও সেই অনুসারে উত্তরোত্তর পরিণত হইয়াছে।"

কবির আশ্রমটিকে তাপমান যন্ত্রের ন্যায় ধরিলে আমরা দেখি কবির মনে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে চিন্তা বিস্তৃততর হইতে সুরু করিয়াছে বহুদিন হইতেই। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাত ও আমেরিকা ভ্রমণে বাহির হন তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটা অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীতে নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি। * * * যখন আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব। * * * দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুইটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।"

ইহার পর হইতেই দেখি কবির জীবনে যেন একটি মোড় ঘুরিয়া গেল। আশ্রমে যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল তাহা তাপমান যন্ত্রেরই ন্যায় কবির মনের গভীরদেশে কি আলোড়ন ঘটিতেছে তাহা দিকে দিকে প্রকাশ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের যাহা অন্তরের বস্তু তাহা সকল ভারতবাসী জানুক এই ইচ্ছা হইতে তাঁহার ইচ্ছা বড় হইয়া ছড়াইয়া পড়িল পৃথিবীর সকল প্রান্তে। পৃথিবীর যে যেখানে আছে সকলেই ভারতকে জানুক, ভারতের

চিত্তসম্পদে তাহারা সমৃদ্ধ হউক তাহাই তাঁহার অন্তরের ধ্যান হইয়া উঠিল। তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এই সময় হইতে এবং আশ্রম যাহাতে সকল সমাজের, সকল দেশের ও সকল মনুষ্যের মিলনক্ষেত্র হইতে পারে তাহারই জন্য আত্মনিবেদন করিলেন।

কবি মনে করিতেন যে মানুষের সহিত মানুষের যে যোগ হয় তাহাতেই সে খুঁজিয়া পায় জীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা। বাস্তবক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় যে এই যোগ ঘটে স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু পরস্পরের স্বার্থের ভিত্তিতে যে যোগসাধন তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা যে কোন মুহূর্তেই দুর্যোগে পরিণত হইতে পারে। সারা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থা কবির মনকে এই সময়ে বিশেষভাবে দোলা দিয়াছিল। তাই তিনি মানুষের যোগের আয়োজন করিলেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে। সেখানে ত্যাগে, প্রেমে ও সত্যলাভের প্রচেষ্টায় মানুষ এক হইবে। "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং"—সেখানে সমগ্র বিশ্ব সমবেত হইবে, এক হইবে ইহাই হইল কবিগুরুর শিক্ষার লক্ষ্য—বিশ্বভারতীর বীজমন্ত্র।

পূর্বকে না হইলে পশ্চিম বাঁচিবে না, পশ্চিম না হইলে পূর্ব রক্ষা পাইবে না—পশ্চিম মহাদেশগুলি ঘুরিয়া আসিয়া কবির বারবার এই কথাটিই মনে হইতেছিল। এই মিলনেই মানব-সভ্যতার সম্পূর্ণতা। এই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, "শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মমধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়েছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক। তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশ-দেশান্তরে পৌছুক যে মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ এবং তার থেকেই শোক।"

"যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

এই বাণী ভারতের চিরন্তন বাণী, বিশ্বভারতীর শিক্ষার দ্বারা ইহা পুষ্ট হইয়া সমস্ত বিশ্বে যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ইহাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার লক্ষ্য।

বহুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রাক্তন ছাত্রকে লিখিয়াছিলেন, "ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডি সম্পূর্ণ মুছে যাক, সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অনুষ্ঠান হোক, সেই জায়গা হোক আমাদের

শান্তিনিকেতন।" সুভাষচন্দ্র শেষবার যখন রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসেন তখন তিনি ও মহাকবির উক্তির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছিলেন, "স্বাধীন ভারতই আন্তর্জাতিকতার প্রশস্ত ক্ষেত্র। বিশ্বভারতীর জায়গা শুধু শান্তিনিকেতনের বিশেষ এই ভৌগোলিক সীমানাটিতে নয়, সে জায়গা রয়েছে সমস্ত লোকের প্রাণে প্রাণে, সেখানে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই তার আসল প্রতিষ্ঠা। সার্বজনীন এই প্রতিষ্ঠার দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশ্বভারতীর আদর্শ লোপ পাবার নয়; এই বিশেষ জায়গা থেকে শান্তিনিকেতন উঠে যেতে পারে কিন্তু যেখানেই লোক মিলনের কাজ করবে, সেখানেই সে জাগ্রত থাকবে।" আবার দেখি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় লিখিতেছেন, "বাস্তব এবং আদর্শগত ভাবে দুদিক দিয়েই ভারতকে চেনবার ও চেনাবার দরকার আছে এবং রবীন্দ্রনাথ এই কাজেরই মাধ্যম হয়ে বিরাজ করছেন।"

১৩৩৪ সনে রবীন্দ্রনাথ যখন বৃহত্তর ভারতের নানা দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন সে সময়ে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেই ভ্রমণবৃত্তান্তের অপূর্ব গ্রন্থ তাঁহার "দ্বীপময় ভারত।" এই গ্রন্থে কবির যে বাণী উদ্ধৃত আছে তাহাতেও দেখি যে রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার সেই একই লক্ষ্য। তিনি বলিয়াছেন, "পার্থিব শক্তি আর ঐশ্বর্য নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি চলেছে, সেদিক দিয়ে মিল এখন সম্ভব নয়; সারা জগৎ এই material দিকটা নিয়ে মত্ত, তাদের মধ্যে দিয়ে এই মিল হবে না, কিন্তু মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনই যাদের কাছে সত্যকার জীবন বলে মনে হয়, তাঁরা যদি এই intellectual আর spiritual দিক দিয়ে মিল করবার চেষ্টা করেন তবেই এই মিল সম্ভব হবে, সার্থক হবে; আর এই মিলের আধারের উপরেই পরে আর সব বিষয়েরই সমাধান হতে পারবে।"

ভারতের এই শান্তির বাণী, এই আত্মিক যোগের সন্ধান যে আজ সমস্ত পৃথিবী জানিতে চাহে তাহা প্রমাণিত হইবে আরও একটি আধুনিক পত্রে —লিখিয়াছেন আমেরিকা হইতে ১১।১০।৪৯ তারিখে ডাঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, "যে-ভারতবর্ষের বিষয়ে এরা জানতে চায় তাতে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় কী ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়েই ওদের উৎসাহ। আধ্যাত্মিক ধর্মকে মানুষ তার সৃষ্টিশীল বিচিত্র বিশ্বকর্মের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবে না— সাধনার মধ্যে যে পরম সহজতা এবং সর্বজনযুক্ত প্রাত্যহিকতার মহিমা তা

ভারতবর্ষেই ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছিল। তারই সন্ধান গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন ঋষির মধ্যে এরা দেখতে চায়। সেই সাধনার সঙ্গে চাষবাস, গৃহকর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার আত্মিক যোগ আছে। সেই ভারতবর্ষকে নূতন কালের হাওয়ার মননে আপনারা বিশ্বের কাছে পরিচিত করুন।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিধির প্রয়োগ-ক্ষেত্র তাঁহার বিশ্বভারতী, তাঁহার আদর্শের সাধনস্থল তাঁহার শান্তিনিকেতন। এখানকার কাজ দেখিয়া একজন আমেরিকান লেখক লিখিয়াছেন, "এই সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।" ইহাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি।

ভারতবর্ষের যে পূর্ণ পরিচয়, সেই পূর্ণ পরিচয় পাইবার উপযুক্ত কোন শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়াই যে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল এই বিশ্বাস কবির মনে জন্মিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ, শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্ব-সমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরোস্তেরীয়, ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়।"

এই পূর্ণ পরিচয়ের ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় ছিল কবির মনে, প্রয়াস ছিল কবির কর্মে। তাই দেখি, শিশু যেমন ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চলে জীবনের পথে তেমনি তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনাতে আছে ভারতের বিদ্যা ও চিত্তসম্পদের পরিচয় পাওয়ার ব্যবস্থা পাঠভবনের প্রথম স্তর হইতে শিক্ষাভবনের মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং তাহারই বিস্তৃতি দেখি বিদ্যাভবনে ও আনুষঙ্গিক নানা প্রতিষ্ঠানে। এই বিদ্যাশ্রমে বালকেরা দেখে মানুষের নানা গুণের ও বিদ্যার বিকাশ; কলাভবনে, সঙ্গীতভবনে, শিল্পভবনে, বিনয়ভবনে, চীনাভবনে, হিন্দীভবনে, গ্রন্থভবনে তাহারা দেখিতে পায় নানা দেশের

মানুষকে তাহাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে। এই স্থানেই বালকেরা নিত্য-নৈমিত্তিক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংস্পর্শ লাভ করে—ক্রীড়া প্রাঙ্গণে, খাদ্য-ভবনে, মন্দিরে, বৈতালিকে, দিনান্তিকায়, বনভোজনে, উৎসবে, সভাসমিতিতে। এইভাবে শিক্ষার্থীর মনের অস্পষ্টতা কাটিয়া গিয়া যে শিক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠে তাহার মনে, তাহাতে সে বুঝিতে শেখে "মানুষ সমস্ত মানুষের মধ্যেই সার্থক।"

তাই দেখি কত সত্য গুরুদেবের এই উক্তি যখন মহাত্মাজীকে লেখা তাঁহার এক পত্রে পড়ি, "Viswa-Bharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure"—বিশ্বভারতী যেন একটি অর্ণবযান। সে বহন করে নিয়ে চলেছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি অতীতকে শ্রদ্ধা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন নিজের জীবনে, বর্তমানকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন নিজের সমস্ত কর্মের মধ্যে এবং ভারতের ভবিষ্যতের উপরে অকুণ্ঠ দ্বিধাহীন বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করিবার কাজে নামিয়াছিলেন নিজে। সাদর আহ্বান জানাইয়াছেন কবিগুরু আমাদের—বলিয়াছেন, "এস সব কর্মী, সাধক, গুরু—সকলে মিলিত হয়ে এটিকে সার্থক কর।"

যে নূতন মূল্যবোধে কবিগুরু আমাদের দীক্ষা দিয়াছেন তাহা যদি সার্থক করিয়া তুলিতে পারি তবে ভারত সমস্ত অপমানমুক্ত হইয়া একদিন নিজের অধিকারে, নিজের দাবিতে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে একথা নিশ্চয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পরিকল্পনার লক্ষ্য—তাঁহার জীবনের মূল সাধনা।

সৌন্দর্য, আনন্দ ও সংযমের বিচিত্র সমাবেশে যে শিক্ষা—তাহার নির্দেশ আছে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায়। ছোটতে বড়তে মিলিয়া আত্মিকযোগে একটি আনন্দময় জীবনধারণের যে প্রচেষ্টা তাহার পথ দেখাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ; জীবনপাত্রের শেষ মাধুরীটুকু দান করিয়া ইহাকে সার্থক করিয়াছেন গুরুদেব। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা, সাহিত্য ও ভাষার যে দেওয়া ও নেওয়া তাহা বহুবারই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ঘটিয়াছে কিন্তু কিছুতেই দুই ভূভাগের পূর্ণ মিলন ঘটে নাই। একমাত্র প্রেমের বাণী, মৈত্রীর বাণীই বিশ্বকে এক আদর্শে বাঁধিয়াছে—তাহার সাক্ষ্যও ইতিহাসে আছে। গুরুদেব সেই শান্তির বাণী, সেই কল্যাণের বাণীই আবার

আমাদের শুনাইয়াছেন। ইতিহাসের সেই চির পুরাতন কথা গুরুদেব যুগের প্রয়োজনে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। তাই আমাদের বিশ্বাস যে একদিন সেই মৈত্রীর বাণীতে, সেই প্রেমের মন্ত্রে বিশ্বকে এক করিয়া বাঁধিবে বিশ্বভারতী—ইহাই অদ্বৈতম্। ইহাতেই আসিবে শান্তি, ইহাতেই হইবে মঙ্গল। তাই বিশ্বভারতীর শিক্ষার লক্ষ্য হইল—শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

পাঠ্য ও পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম; আমরা জানিয়াছিলাম মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে, যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইতে থাকে। * * শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষা বিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে সেটাকে আমি খাতির করিতে চাহি না। কেননা আমি জানি আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিতভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারাই সেই অভাব পূরণ করা যায় কিনা।" এই চিন্তাটিই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা—তাঁহার শিক্ষা-ভাবনার ভিতরকার সত্য মূর্তি। যে শিক্ষাধারা তিনি প্রচলিত করিয়াছেন তাহার জন্য চাই মানুষ—যিনি শিক্ষা দিবেন তিনি যেমন প্রকৃত মানুষ হইবেন তেমনি যাহারা শিক্ষা লইবে তাহারাও বালকোচিত স্বভাব-সম্পন্ন মানুষ হইবে। এই কথাটিই অনেকেই সহজে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "এমন কি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্য মূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্য রূপটিকে দেখেছেন।"

বালকদিগের স্বভাবে আছে প্রাণপ্রাচুর্য—রবীন্দ্রনাথ বলেন ইহাই স্বাভাবিক কেননা, "জগৎপ্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকু মাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে তাহার অবসান নাই।" সমস্ত জগৎসংসারে এই উদার আনন্দের প্রাচুর্য অনুভব করিয়াই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

> "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন
> জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই-সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই তাহারা প্রবেশ করে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় "শিক্ষায় আনন্দলাভ" হইল প্রথম ও প্রধান কথা। তিনি মানুষের জীবনকে অখণ্ডভাবে দেখিয়াছিলেন। মানুষের এই সমগ্র জীবন-পরিসরে তাহার শিক্ষাকাল একটি বৃহৎ অংশ, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়া কঠোর নিরানন্দময় শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা পীড়িত করিলে তাহার মধ্যে পূর্ণতাও থাকে না সেই খণ্ড জীবনের কোন তাৎপর্যও থাকে না। আনন্দময় জীবনের একটি বৃহৎ অংশ নিরানন্দে ভরিয়া উঠিলে জীবনের যে পরিপূর্ণ সুর তাহা বাজে না এবং জীবনের যাহা পরম ও সত্য তাহারও সন্ধান মেলে না। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হইল "আনন্দ"। তাই তাঁহার আশ্রমের মন্ত্র হইল, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" তাঁহার আশ্রমের বালকেরা যে শিক্ষা পাইবে তাহাতে তপস্যার দুঃখ থাকিলেও তাহা আনন্দময়। যেমন, "কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্য রচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ। দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাহাই।"

আজ সকলেই স্বীকার করেন যে জ্ঞানকে চিত্তাকর্ষক করিয়া পরিবেশন করিলে তরুণ মন তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইবে এবং তাহার স্বভাবগত ক্ষমতানুযায়ী তাহা হৃদয়ে ধারণও করিবে। শিক্ষাক্ষেত্র হইতে যে আজ বেত্রদণ্ড নির্বাসিত হইয়াছে, দেওয়ালে মানচিত্রের পার্শ্বে ফুল ফল, পশু পক্ষী ও গাছপালার ছবি সমাদরে স্থান পাইয়াছে, আবৃত্তি ও সঙ্গীতের অনুশীলন অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের মর্যাদালাভ করিয়াছে, শিক্ষায় হস্তশিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছে—ছাত্রস্বরাজ আজ সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে, ইহাতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কত যে প্রেরণা জুগাইয়াছেন তাঁহার চিন্তা ও ধারণার দ্বারা, সাহিত্য, কাব্য, নাটক পরিবেশনের দ্বারা ইহা আজ ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যখন প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মোড় ঘুরাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন তথ্যসম্বলিত যে জ্ঞান সাধনা তাহা যে নানা ভাবে ব্যাহত হয় নাই একথা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য অনেকের মনে এরূপ ধারণাও জন্মিয়াছিল যে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি বালকদিগকে লঘুচিত্ত করিয়া তুলিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে চপলচিত্তের তরলতা যে প্রকাশ পায় নাই, একথাও বলা

চলে না। তবে সেরূপ ক্ষেত্রে একথা বলিতেই হইবে যে অনেকেই প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূল কথাটাই ধরিতে পারেন নাই। "আনন্দময় শিক্ষা" যে কোনমতেই "মজা করা" নহে, কিংবা কেবলমাত্র নৃত্য-গীত-অভিনয় ও চিত্র-অঙ্কনের শিক্ষা নহে—একথা অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। "আনন্দ-ময় শিক্ষার" দর্শন অনেক গভীরে নিহিত, অনেক তপস্যায় সেই শিক্ষার মূল কথাটি ধরা যায়। এ শিক্ষা নিজেকে আবিষ্কার করার শিক্ষা। প্রত্যেক বালকের যে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া বালকের বন্দী মন মুক্তির আস্বাদ পাইবে, তাহার শক্তির বিচিত্র দিক বিকশিত হইয়া ক্রমে ঐক্য লাভ করিবে ইহাই "আনন্দময় শিক্ষার" মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ যে-শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই শিক্ষায় বালকের মনের গ্রন্থিমোচনের ব্যবস্থা ছিল না, ফলে তাহার চিত্তে পরিপূর্ণতার সুর বাজিয়া উঠিত না। যে সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষায় বালক জীবনের মন্ত্র পাইবে —ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংঘাতকে তুচ্ছ করিতে শিখিবে—দুঃসহ শোক দুঃখ ও অতৃপ্তিকে অতিক্রম করিতে শক্তি পাইবে—বলিষ্ঠ প্রকৃতি হইয়া স্বেচ্ছায় ও আনন্দে কর্মের দ্বারা সমাজকে সেবা করিতে শিখিবে তাহারই প্রস্তুতি হইবে রবীন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায়। তাঁহার সর্বার্থসাধক শিক্ষার মূল কথা কতকগুলি উদ্যম-শিক্ষার ব্যবস্থামাত্র নহে কিন্তু আপনাকে বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে চিনিতে শেখাই কবিগুরুর শিক্ষার লক্ষ্য। সত্য বলিতে কি, ভারতে প্রকৃত সর্বার্থসাধক শিক্ষার উদ্যোক্তা তিনিই।

পরীক্ষাধীন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতিতে যাহা কিছু অপকৃষ্ট তাহা বিশদভাবে প্রকাশ পাওয়াতে তাহার অন্তরের খাদ ও ভেজাল নির্গলিত হইয়া বাহির হইতে সুযোগ পাইয়াছে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার যাহা উৎকৃষ্ট ও নির্মল তাহাই রবীন্দ্রনাথের হস্তে আকার ধারণ করিয়াছে। যে নিত্য বস্তুকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে স্থায়ী করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা পরীক্ষা করিয়া, যাচাই করিয়া তবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যেমন হয় যে-কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা। আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথে আসে নানারূপ সংঘাত, বাস্তবের সহিত ঘটে তুমুল সংঘর্ষ, হয় নানা আন্দোলনের সৃষ্টি। তাহারই ফলে যাহা কিছু হেয়, যাহা কিছু ঘৃণ্য ও নগণ্য তাহা ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়। অবশেষে একটি সুন্দর বাস্তব গড়িয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থাকেও ঠিক এই পথেই চলিতে হইয়াছে। যে-প্রাণের তাগিদে মানুষ প্রত্যহই

নিরীক্ষা-পরীক্ষা গ্রহণ-বর্জন ও সংগ্রাম করিয়া উন্নততর, সুন্দরতর জীবন প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই প্রাণের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসংস্কারের কাজে নামিয়াছিলেন। একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা তাঁহার নিত্যদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল তাহারই প্রতিষ্ঠাপর্বকালে তাঁহাকেও নানা পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও গবেষণা, আঘাত সংঘাত সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল—তাহাতে তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করে নাই—বরঞ্চ দুর্বলতাকে দূর করিয়া সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

শান্তিনিকেতনের মুক্ত অঙ্গনে রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সঙ্গীতে ও অভিনয়ের নিত্য-চর্চায় বালকেরা যে আনন্দরস আস্বাদন করিবে তাহাই যেন তাহাদের মগ্ন চৈতন্যে সঞ্চিত হইয়া উত্তরকালে তাহাদের জীবন সরস ও সফল করিয়া তুলিতে পারে ইহা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতির একটি বৃহৎ অংশ কিন্তু তাহাই তাঁহার বিদ্যালয়ের চরম লক্ষ্য বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই। শিক্ষার আরও একটি বড় দিক আছে যাহাতে শিশুরা জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য বুঝিতে পারে, "তাই এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমরা প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এতে করে আর কিছু না হোক একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোট ছেলেরা একটা বড় জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে কিন্তু আসনে বসবার গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনে গিয়ে পৌঁছায়।"

জীবনযাত্রায় ধ্যানচর্চার স্থান কত উচ্চে সে সম্বন্ধে "ধ্যানী জাপান" প্রবন্ধে কবি বিশেষভাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন শোকে দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায় জাপানী যে নিজেকে সংযত করিতে জানে, চেঁচামেচি করিয়া বলক্ষয় করে না—তাহার কারণ তাহারা ছেলেবেলা হইতেই নিজেদের শরীর ও মনকে সংযত করিতে শিখে। জাপানের যে সৌন্দর্যবোধ, তাহা জাপানের সাধনা, তাহাতেই সে প্রবল শক্তি লাভ করিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য-রসবোধ পৌরুষের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে এমন কর্মনিপুণ করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জাপানের ধ্যানচর্চাকেই তাহার শক্তির মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কেননা, মনের শক্তির বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হইল মনের শান্তি—তাহা ধ্যানের দ্বারাই পাওয়া যায়। তাই যে শিক্ষা বালকদিগকে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যলীলার মধ্যে

নিজেদের সমাহিত করিতে শিখাইবে—মনকে শক্তি দিবে, সাহস দিবে, তাহাদিগকে নির্ভীক করিবে—সেই শিক্ষাই রবীন্দ্রনাথ দেশের ছেলেদের দিতে চাহিয়াছিলেন।

শিক্ষার এই দিকটা কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য পাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়ের "আমাদের শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে। তিনি লিখিতেছেন, "স্নান সেরে যে যার পট্টবস্ত্র ও চাদর পরে নিতাম। সত্তঃস্নাত দেহে পাট-কাপড় পরলে মনে যে একটা শুচিতা সঞ্চার হয় বালকবয়সে তা সম্যকভাবে না বুঝলেও মনটা বেশ খুশিতে ভরে উঠত। উপাসনার ঘণ্টা পড়লেই নিজ নিজ কম্বলাসনে পছন্দমত নির্জন জায়গায় পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য উপাসনায় বসতে হত। উপাসনার তাৎপর্য কিছু জানা ছিল না, মনে মনে কি প্রার্থনা করতে হবে তাও কেউ শিখিয়ে দেন নি। এইটুকু শুধু বুঝেছিলাম যে শুদ্ধদেহে শান্ত চিত্তে ভগবানের নাম করতে হবে। প্রথম প্রথম এদিক ওদিকে চাইতাম, দেখতাম অন্যেরা কী করছে। মাঝে মাঝে যে দু-একটি কাঁকর কাঠবিড়ালীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারি নি তাও বলতে পারি নে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পাঁচ সাত মিনিট চুপ করে বসবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে ভগবানকে ডাকবার ইচ্ছাও যে কখনো হয় নি তাই বা কি করে বলি। এই ক্ষণকাল সমাহিতচিত্তে বসবার অভ্যাসটি যে পরবর্তী জীবনে কোনো কাজেই আসে নি তাও বলতে পারি নে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনার প্রায় প্রথম পর্যায়েই আশ্রমে ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করার বিশেষ কারণ আছে। তিনি শিক্ষা হইতে ধর্মাচরণকে বাদ দেন নাই কিন্তু ধর্মশিক্ষা বালকদিগের শিক্ষার একটি বিশেষ পাঠ্য হিসাবে সুপারিশও করেন নাই। বিদ্যালয়ের পরিবেশরূপে তিনি শান্তিনিকেতনকে মনোনীত করিয়াছিলেন কেননা, এই স্থানের সহিত তাঁহার একটি আধ্যাত্মিক যোগ ছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন।" এই আশ্রমে মহর্ষি পিতার স্মৃতি ও তাঁহার সাধনার ঐতিহ্য এমনই পরিপূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল যে কবির মনে হইয়াছিল এই স্থানে বালকদের আনিয়া

বসাইতে পারিলে তাহাদের ধর্মশিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই হইবে। প্রকৃতি হইতে, আশ্রমজীবন হইতে, সমাজ হইতে বালকেরা যাহা কিছু শ্রেয়, যাহা প্রেয় তাহা দেহে ও মনে শোষণ করিয়া লইয়া পূর্ণ হইবে—ইহাই ধর্মশিক্ষা। সঙ্কীর্ণ অর্থে রবীন্দ্রনাথ ধর্মশিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহার মতে তাহা বাহুল্য; কেননা "যেমন এই আলোক তেমনি ধর্ম" যেমনই সহজ তেমনি অবারিত। কবি বলিতেন, ধর্ম হইবে একেবারে নিশ্বাসগ্রহণের মত সহজ—মানুষের ধর্মের ইহাই চরমতম আদর্শ। স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া থাকে, ধর্মও তেমনি বালকদের সমগ্র প্রকৃতি জুড়িয়া থাকিবে।

আনন্দময়, কর্মময় পরিবেশে বালকেরা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকিবে—সাহচর্য থাকিবে গুরুর। গুরু খুলিয়া দিবেন জ্ঞানের ভাণ্ডার, প্রেমের ভাণ্ডার যাহাতে বালকেরা ন্যায়পরতা সততা দয়া কাহাকে বলে তাহা সহজেই বুঝিয়া আচরণে প্রকাশ করিবে। বাঁধা বচন মুখস্থ করিলে এ শিক্ষা হয় না কেবলমাত্র আচার অভ্যাস করিলেও হয় না। গুরুদেব মনে করিতেন, "ধর্ম কারো হাতে তুলে দেওয়া যায় না, বা ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মত শেখানোও যায় না। কিন্তু অনুকূল পরিবেশে ও দৃষ্টান্তের দ্বারা শিশুর মনে ধর্মভাব জাগানো যায়। এইজন্য বালকের সাধনার আসনের পার্শ্বে আপনার সাধনার আসন পাতিয়া গুরু তাহার সহিত আচার-ব্যবহারে, কাজে ও কর্মে ধর্মাচরণ করিবেন; কেননা ধর্মের গোড়ার কথা "শেখা" নহে "জানা" নহে কিন্তু "হওয়া"।

ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা একদিন ছিল সহজ ও সরল—তাই তাহা ছিল সুখের। প্রাচীন শাস্ত্র বলেন—

"সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।"

সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন। তাই রবীন্দ্রনাথ পিতামহগণের সহিত আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, "সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন। সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। * * সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে, তাহা উপকরণ-জালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান।" ইহাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতিতে ধর্মশিক্ষা।

এইরূপ নির্মল পরিবেশে প্রচলিত শিক্ষাবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ

সম্পূর্ণ নিজের পথে তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি গড়িয়া তুলিলেন। তিনি বালকদের সহিত পরিপূর্ণ আত্মীয়তা-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদের মনের নাগাল পাইতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের ন্যায় চলাচল করিয়া শিক্ষাকে সবল করিয়া তুলিল। কেননা, শিশুকে না জানিলে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান কি ঠিক এই কথাই বলে না? রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, শিশুদের দেহের বৃদ্ধি তাহাদের মনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, মনের গতির মধ্যে যে সজীব ছন্দ আছে অর্থাৎ দেহমন বিকাশের যে বিভিন্ন অথচ স্বাভাবিক নিয়মস্বাতন্ত্র আছে, বুদ্ধিবিকাশের এবং মননশক্তির হ্রাস বৃদ্ধির যে-সকল কারণ রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের হাতে তাহারা হয় লাঞ্ছিত এবং আমরা তাহাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে সহায়ক না হইয়া হই অন্তরায়! তাঁহার "মনোবিকাশের ছন্দ" প্রবন্ধটি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে এ সম্বন্ধে তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানকালে বালকদিগের শরীর ও মনের ছন্দনিয়মকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে কবি শিক্ষকগণকে উৎসাহ দিতেন; বলিতেন, ছাত্রদের বয়সের দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া ধৈর্য ও সহানুভূতির সহিত তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিয়া শিক্ষককে পাঠ দিতে হইবে। শিশুদের জন্য কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি যে সর্বদাই মানিয়া চলিতে হইবে এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন না। শিশু-চরিত্রের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে হইবে। কেননা, দেখা গিয়াছে এ পর্যন্ত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাবিদগণ কেহই সম্পূর্ণরূপে একমত হইতে পারেন নাই। কেহ বলেন ছেলেদের শিক্ষা যতদূর সম্ভব সুখকর হওয়া উচিত, কেহ বা বলিতেছেন যে শিক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দুঃখের ভাগ না থাকিলে সংসারের জন্য তাহাদিগকে পাকা করিয়া তোলা যায় না। আবার কেহ বলিতেছেন শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা, আর কেহ বা বলিতেছেন যে সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় না কেননা সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন না করিলেও চলে না,

শিশুকে স্বাধীনতা না দিলেও উপায় নাই সুতরাং প্রকৃত শিক্ষার জন্য একেবারে বাঁধাধরা পথ মানিয়া চলা সম্ভব নহে। কিন্তু শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট পথগুলি শিক্ষকের জানা থাকিলে এবং শিশুকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিলে তাহাকে তাহার চিত্তের গতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব নহে।

শিক্ষাবিধির প্রধান সূত্রগুলি যেমন কোন শিক্ষাবিদই অস্বীকার করেন না, রবীন্দ্রনাথও সেগুলি উপেক্ষা করেন নাই। বরঞ্চ বহু অভিজ্ঞ শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের পর শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের যে সম্পদ-ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছে—গুরুদেব তাহা আরও সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "জ্ঞান-শিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানতঃ তাহাকে অবলম্বন করিয়া হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবেই যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে। * * * প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো নির্জীব ও নিস্ফল হইতে থাকে।" * * * "শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে। সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার জিনিস হবে না।" অর্থাৎ হার্বাট প্রমুখ শিক্ষাবিদগণের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও বলিতেছেন যে পরিচিত হইতে অপরিচিত, সহজ হইতে জটিল এবং মূর্ত বিষয়-বস্তু হইতে বিমূর্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা ও শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে মনস্তত্ত্বসম্মত।

রবীন্দ্রনাথের মনে শিক্ষাদান কার্য সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই "চোখের বালি" উপন্যাসের বিহারীর মুখে। ১৯০৩ সালে বিহারীর মুখ দিয়া যে কথা তিনি বলিয়াছেন তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে কবি বিদ্যালয় স্থাপনের অনেক আগেই বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে-ছিলেন। বিহারী ভৃত্যকে বলিল, "তোমার ছেলেকে আমার কাছে রাখো, আমি উহাকে লেখাপড়া শিখাইব।" বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীতে শিক্ষা দিতে লাগিল। বলিল, "দশ বৎসর পূর্বে আমি ইহাকে বই পড়াইব না, মুখে মুখে শিখাইব।" তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া, তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে, আলিপুরের পশুশালায়, শিবপুরের বাগানে ঘুরিয়া বিহারী

দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাকে মুখে মুখে ইংরাজী শেখানো, ইতিহাস গল্প করিয়া শোনানো, নানাপ্রকারে বালকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতি-সাধন, বিহারীর সমস্ত দিনের কাজ এই ছিল। বিহারী তাহার দোতলার বড় ঘরে আলো জ্বালিয়া বসন্তকে লইয়া নিজের নূতন প্রণালীর খেলা করিতেছিল।

"বসন্ত এঘরে ক'টা কড়ি আছে চট করিয়া বলো। না গুণিতে পাইবে না।

বসন্ত— কুড়িটা।

বিহারী— হার হইল—আঠারোটা।

ফস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ খড়খড়িতে কটা পাল্লা আছে? বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

বসন্ত বলিল—ছয়টা।

জিত। এই বেঞ্চিটা লম্বায় কত হইবে? এই বইটার কত ওজন?" এমনি করিয়া বিহারী বসন্তর ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষ সাধন করিতেছিল।

"শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা" গ্রন্থে শ্রীসুধীরচন্দ্র কর মহাশয় রবীন্দ্রনাথের আনন্দলোক ও সান্ধ্যবিনোদন পর্বের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতেও আমরা দেখি যে কবি এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং বালকদিগের ইন্দ্রিয়বোধ-চর্চার নানাবিধ ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। কর মহাশয় লিখিতেছেন, "বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতেই সন্ধ্যার অবকাশকাল এখানকার ছেলেরা নক্ষত্রপরিচয়ে, সঙ্গীতচর্চায়, পুরাণ ও কথা শুনিয়া যাপন করে। নিজেরা একটা প্লট খাড়া করিয়া হেঁয়ালী-নাট্য রচনা করিয়া কখনও কখনও অভিনয় করিয়া থাকে। পূর্বে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধ-চর্চাও হইত। চট্ করিয়া চোখে দেখিয়া একটা জিনিসের দৈর্ঘ প্রস্থ বলা, হাতে অনুভব করিয়া কোনো জিনিসের ওজন বলা, অনেকগুলো জিনিস এক পলকের মধ্যে দেখিয়া কতগুলি এবং কী কী দেখিয়াছে তাহা বলা, ইত্যাদি উপায়ে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষ সাধন করানো হইত।"

ইন্দ্রিয়বোধচর্চা শিশুশিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি। এই তত্ত্ব কেবল ফ্রোবেল, মন্তেসরী প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণই প্রচার করেন নাই কিন্তু তাঁহাদের বহু পূর্বে ভারতের ঋষিগণ বলিয়াছেন, "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম্ দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।" "হে দেবগণ আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া

শুনি, হে পূজ্যগণ আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি।" রবীন্দ্রনাথ যে এই সত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন একথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ইন্দ্রিয়বোধের প্রকৃত চর্চা হইলে বালকদিগের এমন এক সংবেদনশীল ও সহৃদয় মন গড়িয়া উঠিবে যে একদিন তাহারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর পশ্চাতে যে ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা তাহারও আস্বাদ পাইবে। সকল বালকেই যে তাহাদের মনের সমস্ত ভাব বা হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য ভাষায় বা শিল্পকর্মে প্রকাশ করিতে পারিবে এমন কোন কথা নাই কিন্তু তাহাদের একটি সংবেদনশীল মন গড়িয়া উঠিলে অন্যের সৃষ্ট শিল্প, কাব্য বা সাহিত্যের মধ্যেও তাহারা নিজের নিজের ভাষা খুঁজিয়া পাইয়া তৃপ্ত হইবে। এই অবস্থাকেই বলে রসাস্বাদের অবস্থা বা "সমঝদার" হওয়া। কবিগুরু যখন লিখিয়াছিলেন,

> "একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে
> গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
> তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে
> বাতাসে বনসভা শিহরি' কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।"

তখন বোধ হয় এই কথাই তাঁহার মনে ছিল।

এই ইন্দ্রিয়বোধচর্চার প্রথম সোপান হইল কর্মপ্রতিষ্ঠ শিক্ষা। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের প্রথম হইতেই আমরা দেখি যাহাতে বালকেরা সমস্ত কর্মে অভ্যস্ত হয় তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়াছেন। এই কর্মভিত্তিক শিক্ষাবিধির একধারা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন প্রাচীন তপোবনের গুরুগৃহ হইতে, অপর এক ধারা গ্রহণ করিয়াছেন পাশ্চাত্যের প্রয়োগমূলক শিক্ষাবিধি হইতে। তবে, পশ্চিমের কর্মভিত্তিক শিক্ষায় যেমন নানাবিধ প্রতীক (symbolic apparatus) সম্বলিত নানা শিক্ষা-সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে সে সকলের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় নাই তেমনি প্রাচ্যের কর্মভিত্তিক শিক্ষার কৃচ্ছ্রসাধনও নাই। এমন কি বুনিয়াদী শিক্ষায় যে জীবন হইতে জীবিকায় অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহাও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিগুরু "মানুষের ধর্মকে"ই তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাই দেখি তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থায় বালকেরা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা একদিকে হইবে সংযত, সরল ও সুন্দর জীবনের উপাসক, অন্য দিকে হইবে কর্মকুশল ও স্বয়ম্ভর।

প্রত্যেক দিনের কাজ বালকেরা সুখের সহিত সম্পন্ন করিয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হইবে ইহাই ছিল কবিগুরুর শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। "কর্ণধার কানে ঝিঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তারপরে লৌহশাসনের কলের গাড়ীতে প্রাণরসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইষ্টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকুরির বালুমরুতে দীর্ঘমধ্যাহ্ন জীবিকা-মরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তারপরে সূর্য যখন অস্ত যায় যায় তখন যমরাজের সদর-গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া মনে করিলাম, জীবন সার্থক হইল।" এরূপ শিক্ষা-পদ্ধতিও যেমন রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিতে পারেন নাই তেমনি জন্ম হইতেই নিজের শিক্ষা-সমস্যা দূর করিবার জন্য একটি জীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে এমন শিক্ষা-বিধিতেও মত দিতে পারেন নাই। মানুষের জীবনকে তিনি জীবিকা হইতে অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন তাই যদিও তিনি জীবিকার জন্য শিক্ষা-লাভকে তুচ্ছ করেন নাই কিন্তু শিক্ষাকে কেবল তাহারই মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মনে কি ধারণা ছিল তাহা বুঝিতে পারি যখন পড়ি তাঁহার লেখায়, "ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না, কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের াদকে। তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক ও পারমার্থিককে মিলিয়ে। * * * কৃতিত্ব শিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই যে যথেষ্ট নয় সেকথা মানতে হবে। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতি বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থ-ভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?"

শিক্ষা-প্রণালী আলোচনাকালে শিক্ষাদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি সুস্পষ্ট অভিমত উল্লেখ করিব। তিনি একই দিনে ঘণ্টাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পঠনপাঠন সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "কি জানি সাহিত্যশিক্ষা, গণিতশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ বিশেষ চাতুর্মাস্য আছে কি না—একই ঋতুতে একসঙ্গে নানা বিচিত্র বিষয় শিক্ষা মনের পক্ষে অজীর্ণজনক ও ক্লান্তিকর কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। * * * একই বিষয়ের বিচিত্র দিক আছে—সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসকেও এক শ্রেণীভুক্ত করে রাখা চলে। এমনি করেই বৈচিত্র্যের দ্বারা মনকে পূর্ণ করা সম্ভব। অঙ্ককেও

অন্ততঃ দুই বড় ভাগে ভাগ করা চলে। একটা গণিত অঙ্ক আর একটা ফলিত অঙ্ক। অঙ্ক জিনিসটা যে ব্যবহারের জিনিস খাতায় আঁক কষে ছেলেরা সে কথাটা ভুলে যায়। এইজন্যেই অঙ্কের 'পরে অনেক ছেলের বিতৃষ্ণা জন্মায়। খাতায় যেটা কষল সেটাকেই যদি বিচিত্র করে বস্তুর দ্বারা কষে তবে অঙ্ক তাদের কাছে সজীব হয়ে ওঠে। গণিতের নিয়মে কৃত্রিম দোকান রাখা, কাঠের ইঁট দিয়ে কৃত্রিম ঘর তৈরি, স্কুলঘরের দরজা-কড়ি-বরগার পরিমাপ, এমন কি চড়িভাতির আহার্য উপকরণের হিসাব ঠিক করা প্রভৃতি হাজার রকমের খেলায় ও হাতের কাজে পরিণত করা যায়। সাধারণতঃ অঙ্ক শেখার জন্য যেটুকু সময় নির্দিষ্ট থাকে তাতে অঙ্ককে এমন সত্য করে তোলবার উপায় থাকে না।" এইভাবে কবিগুরু বলিতেছেন যে বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ও ঔৎসুক্যের জোয়ার-ভাঁটা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের পাঠ দিতে হইবে এবং প্রত্যেক শিক্ষকের এই নিয়ম জানা ও নিয়ম মানিয়া চলা শিক্ষাব্যবহারে অত্যাবশ্যক। তিনি আরও বলিতেছেন যে বৈচিত্র্য মনকে বিশ্রাম দেয় সত্য, কিন্তু হঠাৎ একটা বিষয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির আর একটা বিষয়ে নিজেকে ক্ষণে ক্ষণে আকর্ষণ করিয়া লওয়াও মনের পক্ষে বেশ ক্লেশজনক ও ক্লান্তিকর। কেননা মন যেমন খানিকটা চেষ্টার তাড়নায় চলে তেমনি খানিকটা গতির বেগেও চলে। সেই গতির বেগকে একদিকে থামাইয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে চালনা করিবার সময় মনের একটা সহজ অপব্যয় ঘটিয়া থাকে। এইজন্য অনুবন্ধ প্রণালী কিম্বা বিদ্যার সমবায়পদ্ধতিতে (Correlation of subjects) পাঠ দেওয়া কবির মতে উৎকৃষ্ট উপায়।

ছেলেরা কি পড়িবে এবং পাঠ্য-বস্তু কিভাবে পড়াইতে হইবে তাহারও উপদেশ আছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সাহিত্যে। কবির শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাহিত্য পাঠ ও মাতৃভাষার চর্চার স্থান অতি উচ্চে। তিনি বলিয়াছেন, "ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণতঃ সে মিলন নিকটের ও প্রত্যহের। সাহিত্য এসেছে মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের মুখোমুখি করাবার কাজে। প্রাকৃত জগৎ সকল কালের সকল স্থানের সকল তথ্য নিয়ে—সাহিত্য-জগৎ সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে।" ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে মাতৃভাষার দ্বারা মনের ভাব ও চিন্তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে শিশুকে অন্য ভাষা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে কবিগুরুর মত ছিল না। অন্তরে

বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া ও সামঞ্জস্য-সাধন কেবলমাত্র মাতৃভাষাতেই হইতে পারে—তাহাই মাতৃদুগ্ধের ন্যায় মনের পরিপোষক। আপনার ভাষায় ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইলে পর শিক্ষার পূর্ণতার জন্য বিদেশী ভাষা-শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি বলিয়াছেন, "অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্য যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই তাদের নিজের ভাষায়।"

বিদেশী রাজার শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই নষ্ট হইয়াছে বিদেশী ভাষা শিক্ষার চেষ্টায়। ফলে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশসাধন—তাহাই ব্যর্থ হইয়াছে। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করাকেই আমরা শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করায় আমাদের বর্তমান শিক্ষা যে কিরূপ বিফল হইয়াছে তাহা তো চোখেই দেখিতেছি। রবীন্দ্রনাথ এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতা বহুদিন পূর্বেই বুঝিয়া ১৯৪৩ সনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে বাংলা ভাষায় যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন, "দূরদেশী ভাষা থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করিতে পারি মাত্র কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।" ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের অভূতপূর্ব অধিকার ছিল, তবুও তাঁহার ইংরাজী ভাষায় রচিত কাব্য ইংরাজী সাহিত্যে স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। কিন্তু যেদিন তিনি মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করিলেন, সেদিন তাঁহার ভাবরসে সমস্ত বাংলাদেশের অন্তর আপ্লুত হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও তাহাই। ইংরাজী কথাসাহিত্য হইতে তিনি অনেক প্রেরণা পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই প্রেরণাকে তিনি মাতৃভাষার মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেন, ধার করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অনেক, কাজেই তাহার উদ্বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। ভাষার যে সরসতা, সজীবতা, সচ্ছলতা এমন কি উচ্ছলতা তাহা কি বিদেশী ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব?

সফল শিক্ষার জন্য মাতৃভাষাকেই যে শিক্ষার বাহন করা উচিত একথা আজ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার জন্য বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথের নিকটে বিশেষভাবে ঋণী। ভাষা-শিক্ষা সরস ও সজীব করিবার জন্য তিনি

যে-সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল গল্প বলা ও গল্প শোনা—বিশেষ করিয়া বালকেরা যাহাতে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে তাহার জন্য তিনি বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ছড়া ও ছন্দ, সঙ্গীত ও কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও অভিনয় যে ভাষা-শিক্ষার পক্ষে কত সহজ ও সরস পথ তাহা তো তিনি প্রমাণ করিয়াই গিয়াছেন। ছবি আঁকা, নাটক, কাহিনী রচনার দ্বারাও মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করা যায় তাহারও বহু নমুনা তাঁহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। বালকদিগের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারকে সংযত করিতে যে তাঁহার "শারদোৎসব" নাটকের জন্ম একথাও আমরা জানি।

জগদানন্দ রায় মহাশয় তাঁহার "স্মৃতি" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরীর উপরকার দোতলায় খড়ের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয়তো ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ঐ ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে দিনে নতুন নতুন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেই সব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থমথমে ভাব ছিল কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ "শারদোৎসব" নাটক। * * * ইহার পরেও লক্ষ্য করিয়াছি কোনো কারণে যখন আশ্রমে কোনো ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশ্রমে এখন যে ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সার্থকতাও কম নয়!"

কিভাবে সাহিত্য পড়াইলে ছেলেদের মাতৃভাষার উপর বেশ ভালো রকম অধিকার জন্মাইবে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "আবরণ" প্রবন্ধের শেষভাগে বেশ পরিষ্কাররূপেই বলিয়াছেন। "বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে; অন্ততঃ হওয়া উচিত এবং সেখানে আমাদের অধিকার আছে, এ-কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এদেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল তখনও তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনও গুরু শিষ্যকে মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র

তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যে লিখিয়া লইত। এমন করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া উচিত নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করিয়া লইতে হইবে। এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে। তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে।"

সাহিত্যের বিষয়বস্তুটি বালকদিগের সহিত পড়িয়া আলোচনা করিতে হইবে। প্রয়োজনমত ব্যাখ্যা করিয়া লেখক কি বলিতে চাহেন তাহা বালকদিগের মনে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। আলোচনাকালে লেখকের ভাষা হুবহু ব্যবহার না করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রেরা একত্র চেষ্টায় যদি বিষয়বস্তুটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন তবে শব্দের অর্থ ও শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে বালকদিগের দক্ষতা বাড়িবে। পরে ছাত্রেরা মুখে মুখে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুস্তক না দেখিয়া লিখিবে। শিক্ষক ছাত্রদের রচনা যত্নের সহিত পাঠ করিয়া সংশোধন করিবেন। যদি কোন ছাত্রের রচনায় মৌলিক চেষ্টা দেখা যায়, যদি লেখায় সম্পূর্ণ তাহার নিজের একটি ধারা প্রকাশ পায় তবে তাহাকে সেইভাবেই লিখিতে সাহায্য করিতে হইবে—যাহাতে একদিন সে স্বকীয় ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। শৃঙ্খলার সহিত চিন্তা করিয়া সুষ্ঠু ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারাই শিক্ষিত মনের পরিচয়। যাহাতে বালকদিগের মধ্যে এই শক্তি পুষ্ট হইতে পারে তাহারই জন্য কবিগুরু সচেষ্ট হইতে বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপরিকল্পনায় পুঁথির স্থান মুখ্য না হইলেও তিনি শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে পুঁথিকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত করেন নাই। পুঁথিকে তিনি জ্ঞানলাভের নানা উপায়ের মধ্যে একটি বিশেষ উপায় বলিয়া মনে করিতেন এবং শিশুদের জন্য নিজে কত পুস্তকই না রচনা করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানলাভ ও জ্ঞান প্রচারের জন্য বিদ্যালয়ের ন্যায় লাইব্রেরীও একটি প্রধান উপায় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং এইজন্যই নিজের চেষ্টায় তিনি শান্তিনিকেতনে এত রকমের পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন যে সেখানকার গ্রন্থাগার ভারতের শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীগুলির মধ্যে একটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সেখানে কেবল বড়দের পড়ার পুস্তক নহে কিন্তু শিশুদের পাঠোপযোগী নানা পুস্তকের

আয়োজন করিয়া তিনি বালকদিগকে বিস্তৃত পাঠের সুযোগ দিয়াছিলেন। লাইব্রেরীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনাসূত্রে কবিগুরু লিখিয়াছেন, "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানাস্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীর উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা * * * লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সহিত পাঠকদের সচেষ্টভাবে পরিচয়-সাধন করিয়ে দেওয়া—গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।" পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে শিশুদের যে অন্য কোন পুস্তক পড়ার প্রয়োজন আছে একথা আমরা খুব কমজনেই ভাবিয়াছি এবং ভাবিলেও অর্থাভাবের দরুন পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখা গেছে যে, বালকের বই পড়ার ইচ্ছা কোন কোন ক্ষেত্রে বয়স্ক পাঠক অপেক্ষাও প্রবল। শিশুর মন যেমন রসের কাঙাল তেমনি তাহার জ্ঞানপিপাসাও অনন্ত। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে শিশুদের এই অসীম রস-পিপাসা ও জ্ঞানতৃষ্ণা কেবল পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তাই তিনি বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য নানা শ্রেণীর পুস্তক লিখিয়া ও সংগ্রহ করিয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন তাহাদের তৃপ্তিসাধনের জন্য।

পাঠ্যপুস্তকের বোঝা শিশুদের পক্ষে কিরূপ দুর্বহ সে সম্বন্ধে "ব্যঙ্গ কৌতুকে" কবি লিখিতেছেন, "সর্ব শেষে যখন শুভ্রবসনা অমলকমলাসনা সরস্বতী উঠিয়া বীণানিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন, 'অন্যান্য নানা কার্যের মধ্যে বালকদিগকে শিক্ষাদানের ভার এতদিন আমার উপরে ছিল, কিন্তু সে কার্য আমি কিছুতেই চালাইতে পারিব না। আমি রমণী, আমার মাতৃহৃদয়ে শিশুদিগের প্রতি কিছু দয়ামায়া আছে—তাহাদের পাঠের জন্য আজকাল যে-সকল পুস্তক নির্বাচিত হয় সে আমি কিছুতেই পড়াইতে পারিব না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। এ নিষ্ঠুর কার্য একজন বলিষ্ঠ পুরুষের প্রতি অর্পিত হইলেই ভালো হয়। অতএব সুরসভায় আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করি, যমরাজের উপর উক্ত ভার দেওয়া হউক।' যমরাজ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন, 'আমার কোনো আবশ্যক নাই কারণ ইস্কুলের মাস্টার এবং ইনস্পেকটর আছে।' শিশু-শিক্ষা-বিভাগে যমরাজের বিশেষ নিয়োগ যে বাহুল্য এ সম্বন্ধে দেবতাদের কোনো মতভেদ রহিল না।"

পুস্তকের সাহায্যে ছেলেরা নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে, ক্রমে তাহারা বিভিন্ন দেশের মনীষীদের চিন্তার সহিত এবং স্বদেশের

এবং বিদেশের অন্তঃ-প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইয়া সে সকলের সহিত যোগস্থাপন করিতে সুযোগ পাইবে। কেননা, পুস্তক অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রধান সেতু এবং আধুনিক সভ্যতার প্রধান বাহক। পুস্তকের মধ্যেই মানুষ অতীতকে বর্তমানের মধ্যে বন্দী করিয়াছে; অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর পুস্তকের দ্বারা সেতু বাঁধিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে।" এই অমর চিন্তাধারায় যাহাতে বালকাদগের জীবন বাল্যকাল হইতেই উদ্বুদ্ধ হইতে পারে তাহার জন্য চাই বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য নানা জাতীয় পুস্তক। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুস্তকের স্থান এইখানে, কেবল মুখস্থ করিবার জন্য নহে।

মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রথম স্তরে না হউক, কিন্তু পরে যখন ভাষা বেশ আয়ত্তে আসিয়াছে তখন বালকদিগকে ব্যাকরণ পড়ানো যে একান্ত প্রয়োজন একথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ ভাষা-শিক্ষার অংশ হিসাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন যে ভাষার বৈশিষ্ট্য, গঠন-পদ্ধতি প্রভৃতি নির্ধারণ ও অনুধাবনের জন্য কেবল নহে কিন্তু ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। "মাতৃভাষার একখানি ব্যাকরণ রচনা করা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলাভাষার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।" আরও উন্নত শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্ব শিক্ষারও পক্ষপাতী ছিলেন; কেননা ভাষার ঐতিহাসিক ধারা ও গঠন বুঝিতে হইলে ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োজন।

বাংলাসাহিত্যকেই তিনি নানা ভাগে ভাগ করিয়া প্রাচীনসাহিত্য, লোকসাহিত্য, গ্রাম্যসাহিত্য, আধুনিকসাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের যোগে পড়াইবার উপদেশ দিয়াছেন। বিশ্বসংস্কৃতির সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য কেবল ইংরাজী বা য়ুরোপীয় ভাষা নহে কিন্তু চীনা ভাষা, তিব্বতী ভাষা প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার চর্চা করাও প্রয়োজন। কবিগুরুর মত হইল, "আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল

বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। * * * তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-প্রশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। * * * অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান ও পার্শি বিদ্যার সমবেত চর্চার আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।" কেবল তাহাই নহে নিজের সাহিত্যকে পূর্ণতর করিয়া দেখিতে হইলে বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে দেখা প্রয়োজন। নিজেদের একটি গণ্ডির মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিলে দেশের ভাষাই হউক কি সাহিত্যই হউক তাহা কোনমতেই সমৃদ্ধ হইতে পারে না। সাহিত্যের রস যাহাতে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থী আস্বাদন করিতে সুযোগ পায় তাহার জন্য কবিগুরু শিক্ষককে সচেতন করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, "সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোট করিয়া দেখিলে ঠিকমত দেখাই হয় না।"

এইজন্য তিনি বিশ্বভারতীতে ভাষা-শিক্ষার জন্য কি বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছলেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই বলি। "আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে আছে সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত, আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এণ্ড্রুজের চারিদিকে ইংরেজী সাহিত্য-পিপাসুরা সমবেত। * * * আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দি-সাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।"

বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে প্রবেশাধিকার দেওয়ার পূর্বে বালকেরা যাহাতে মাতৃভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষাটি বেশ ভাল করিয়া শিখিতে পারে, তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা যে কতদূর তাহা কবির উক্তিতেই পাওয়া যায়, "ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল। ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে সে রঞ্জিত করে

আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।"

ইংরাজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজী শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়— গরীবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। এ যেন বিলিতি তলোয়ারের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার নিয়ম।" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃষ্ট পথ ও উপায় সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতিতে "Direct Method" যাহাকে বলে তাহা তিনিই দেশীয় বিদ্যালয়ে প্রথমে প্রচলিত করেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন না, বরঞ্চ যাহাতে বালকেরা বেশ ভাল করিয়া ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে তাহার জন্য "ইংরাজী সোপান" রচনা করিয়াছিলেন এবং শিশুদের ইংরাজী পড়িবার ক্লাশগুলি নিজেই লইতেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন "মৈসুরের কথা" নামক প্রবন্ধে। "আমাদের দেশে দুই রকমের ভীরুতা দেখা যায়। কাহারও ভীরুতা দেশী প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে, কাহার ভীরুতা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে। যাঁহারা এই দুই ভীরুতাকেই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই ভারতবর্ষকে বাঁচাইবেন।"

এই তো গেল সাহিত্যের কথা। তাহার পর আসে ইতিহাসের কথা। বিদ্যালয়ে ইতিহাস একটি অবশ্য-পাঠ্য বিষয়। দেশের ইতিহাস কেবল মারামারি কাটাকাটির ইতিহাস বা রাজারাজড়ার গৌরব-অগৌরবের স্মৃতিমাত্র নহে কিন্তু তাহা ভারতবর্ষের মানুষের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করিবে। যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ হইয়া আছে তাহা আলোচনা না করিলে দেশের প্রকৃত ইতিহাস যে কি জিনিস তাহার উজ্জল ধারণা আমাদের হয় না। যে ছেলেরা নিজের স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায় তাহারা ভাগ্যবান কিন্তু এ যাবৎকাল আমাদের দেশের চিরন্তন সত্য কাহিনী এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল যে প্রতিদিন দেশের সহিত মনের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটি বিরুদ্ধভাব জন্মিয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। "একদিকে

আত্ম একদিকে পর, একদিকে অর্জন একাদকে বর্জন, একদিকে সংযম একদিকে স্বাধানতা, একদিকে আচার একদিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই তাল অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনার ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।"

বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়াইতে শিক্ষকেরা নানা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ইতিহাস পড়াইতে নির্দেশ দিয়াছেন তাহাকে "বিশ্লেষণ-পদ্ধতি" বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য ভারতবর্ষ, মুসলমান ভারতবর্ষ এবং ইংরাজ ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস, সম্পূর্ণ ও সমগ্র চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এমন কি ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র "ভারতবর্ষ" নামে একখানি পুস্তক বালকদিগকে পড়িতে দিলে তাহাদের দেশ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মিবে। তাহার পর ভারতের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথকভাবে ও তন্ন-তন্নরূপে শিক্ষা দিলে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বালকদের সহজেই ঔৎসুক্য জন্মিবে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু কথকতা, যাত্রা ও পুতুলনাচের সাহায্যে জনসাধারণের নিকটে যেমন বালকদিগের নিকটেও তেমনি সরস করিয়া উপস্থিত করা হইলে দেশ সম্বন্ধে ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতিও ইতিহাস শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন। অনেক ইতিহাসের শিক্ষক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা বলেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন একদিকে ইতিহাসেরও শত্রু তেমনি অন্যদিকে গল্পেরও শত্রু। এইভাবে তাঁহারা সত্যরাজ্য ও কল্পনারাজ্যের মধ্যে একটি পরিষ্কার রেখা টানিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা বলেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রায়ই ইতিহাসের ব্যতিক্রম হয় এবং তাহা আর ঐতিহাসিক উপন্যাস থাকে না। ইতিহাসের বিশেষ সত্য ও সাহিত্যের নিত্য সত্য যেখানে মিলিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু গল্পের খাতিরে ভুল ইতিহাসের তথ্য লিখিয়া অনেক লেখক ইতিহাসকে আঘাত করেন এবং সেই ইতিহাসের ভুল বাহির হইলে গল্পেরও রস নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন যে যাঁহারা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন তাঁহারা সর্বজন-বিদিত সত্যকে উল্টা করিয়া দাঁড় করান না,

কেননা তাহাতে রসভঙ্গ হয় এবং কাহিনীও কাত হইয়া ডুবিয়া যায়। তাই যখন লোকে প্রশ্ন করেন, "ইতিহাস পড়িব না আইভ্যান হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়, আনন্দের জন্য আইভ্যান হো পড়। পাছে ভুল শিখি এই সতর্কতার জন্য নিজেকে বঞ্চিত করিলে স্বভাবটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়। কাব্যে যদি ভুল শিখি তো ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে-ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে সে হতভাগ্য। কিন্তু যে-ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।"

ভূগোল শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে অভিমত ছিল তাহাতে "ডাকঘরের" অমলের কথাই সব চেয়ে আগে মনে পড়ে। "আমি পণ্ডিত হবো না পিসেমশায়, আমি দেখবো—কেবলই দেখে বেড়াবো।" "ডাকঘর" রচনার অল্পকাল পূর্বেই তিনি "জীবনস্মৃতি" লিখিয়াছেন। মনে হয় গৃহ-আবেষ্টনের বদ্ধ-জীবনের কথা তাঁহাকে নূতন করিয়া রুদ্ধশ্বাস করিয়া তুলিয়াছিল এবং সেই বেদনাময় বাল্যস্মৃতি, সেই বাল্যকালের অপূর্ণ কামনাসকল "ডাকঘরের" অমলের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। ভ্রমণের জন্য, জগৎকে দেখিবার ও জানিবার জন্য, বিচিত্রকে দেখিয়া তৃপ্ত হইবার জন্য বালকদের মনে যে আকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহারই চমৎকার প্রকাশ দেখি এই নাটকে।

স্বদেশের ও স্বজাতির সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে হইলে দেশভ্রমণ একটি অবশ্যকর্তব্য শিক্ষা-পদ্ধতি। রাশিয়াতে ছাত্রদের ভ্রমণের ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "চোখে দেখে শেখার আর একটি প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। তোমরা তো জানই আমি অনেকদিন থেকেই ভ্রমণ-বিদ্যালয়ের সঙ্কল্প বহন করে এসেছি। ভারতবর্ষ এত বড়ো দেশ। সকল বিষয়েই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হণ্টারের গেজেটিয়ার পড়ে হতে পারে না। এক সময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। শুধুমাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য করে পাঁচ বছর ধরে ছাত্রদের যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তাদের শিক্ষা পাকা হয়।"

ইহা ছাড়া স্থানিক তথ্যানুসন্ধান বা (Regional Study) শিক্ষায় একটি

প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের পক্ষে এই পদ্ধতি অতি প্রশস্ত। ইহাতে দেশের বিভিন্ন স্থানের উৎপাদিকা-শক্তি কি প্রকার, কোন খনিজ পদার্থ সেখানে পাওয়া যায় কিনা তাহার সন্ধান মিলিলে ছাত্রদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয় এবং দেশের কাজেও সহায়তা মেলে। এই রকম কাজ শান্তিনিকেতনে কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ছাত্রদের লইয়া সুরু করিয়াছিলেন বটে কিন্তু নানা কারণে তাহা সার্থক হইয়া উঠে নাই। ভ্রমণের দ্বারা জ্ঞানলাভ কত সহজ ও সজীব হইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার আরও সুস্পষ্ট মত দেখি এই উদ্ধৃতিতে, "মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষয়কে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করতে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চরে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়, তেমনি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চরে' শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অচল বিদ্যালয়ে বন্দী হয়ে অচল ক্লাশের পুঁথির খোরাকিতে মনের স্বাস্থ্য থাকে না। পুঁথির প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করা যায় না—জ্ঞানের বিষয় মানুষের এত বেশি যে ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের আহরণ করবার উপায় নেই, ভাণ্ডার সঙ্গে করে নিয়ে যদি প্রকৃতির বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায়, তা হলে কোনো অভাব থাকে না।"

শিক্ষায় ম্যুজিয়াম বা সংগ্রহশালার উপকারিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। বালকদিগের শিক্ষা যাহাতে আনন্দময় ও সার্থক হইতে পারে তজ্জন্য রাশিয়ার সমস্ত দেশ জুড়িয়া ম্যুজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে বালকেরা সহজেই বাস্তবের সহিত পরিচিত হইতে পায় এবং তাহাদের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াতে এক ধরনের ম্যুজিয়ম দেখিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন তাহা হইল ছবির ম্যুজিয়ম; যাহাতে ছেলেমেয়েদের মনে সৌন্দর্যবোধ জাগিয়া উঠে এবং প্রকৃত রসবোধের দ্বারা তাহা গভীর ও স্থায়ী হয় তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা। কেননা শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হইল সুন্দরকে উপলব্ধি করা—এ কথা রাশিয়া ভুলিয়া যায় নাই। মানুষের নিম্নতর প্রবৃত্তিগুলিকে উৎকর্ষের পথে চালনা করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই যাহা সুন্দর ও মহান তাহারই চর্চা করিতে হইবে একথা সকল শিক্ষা-ব্যবস্থার সার কথা। ছবি দেখা ছাড়া ছবি আঁকাও ছেলেদের শিক্ষার একটি প্রধান অংশ। সেদেশে রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন যে ছেলেরা যাহা পড়ে

তাহাই ছবিতে আঁকিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হইয়া উঠে, ছবি আঁকাতে হাত পাকে এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপসৃষ্টির আনন্দও আসিয়া মিলিত হয়। যাহা কথার দ্বারা বালকেরা ব্যক্ত করিতে পারে না তাহা ছবির দ্বারা বলিতে চেষ্টা করে। অনেকে ছবিতে যাহা পারে না তাহা অভিনয়ে, আবৃত্তি ও সঙ্গীতে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়। কোন প্রকারেই আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিলে বালকেরা তো উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবেই। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় দেখি সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য সৃজনাত্মক কার্য ও সঙ্গীত এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কেননা তিনি জানিতেন যে মনের ভাবকে চিত্র বা শিল্পকর্ম আকার দেয় এবং সঙ্গীত তাহাকে গতি দান করে।

শিশুদের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয়—সেগুলি একেবারে অকৃত্রিম ও অনন্য, কেননা তাহাতে আঙ্গিকের কোন অনুকরণ নাই, অন্যকে খুশি করিবারও সচেষ্ট কোন প্রয়াস নাই, কেবল আপনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়, সম্পূর্ণ নিজের মনের গতিতে সে আঁকিয়া চলে নির্ভীক নির্ভাবনায়। তাহাতে বয়স্কের চিন্তা বা স্পর্শের ছাপ থাকে না বলিয়া তাহাদের প্রকাশভঙ্গীও খর্ব হয় না কোনমতে। তাহাদের আঁকা ছবিতে যে বর্ণের উজ্জ্বলতা, রেখার যে সজীবতা দেখা যায়, যে আদিম-প্রবৃত্তির প্রকাশ থাকে তাহা কেবল শিশুশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব, কাজেই বয়স্কের হস্তক্ষেপে তাহার যে ব্যতিক্রম ঘটিবেই এবং অভিজ্ঞদৃষ্টিতে তাহা যে ধরা পড়িবেই একথা শিক্ষকের মনে রাখা প্রয়োজন।

কেবল ছবি আঁকিয়া নহে কিন্তু সহজ মাধ্যমে লব্ধ বিদ্যাকে প্রকাশ করিবার আরও নানা উপায় পাশ্চাত্যে অবলম্বন করা হইয়াছে। তাহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি দেখিয়াছিলেন যে সেদেশে বালক-বালিকাগণ তাহাদের নিজ নিজ শ্রেণীর জন্য এক-একটি পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া থাকে। সেখানে তাহারা প্রবন্ধ, কাব্য, কাহিনী ও চিত্রের দ্বারা নিজেদের মনের কথাটি খুলিয়া বলে এবং শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলে। এই সাময়িক পত্রিকা ছাড়াও তাহারা প্রত্যেক দিনের খবরাখবর লিখিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দেয় এবং রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াতে "সজীব সংবাদপত্র" দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হন যে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-পদ্ধতিতে যাহাতে এই বিশেষ প্রণালীটি গ্রহণ

করা হয় তাহার জন্য সুপারিশ করিয়া লিখিয়া পাঠান। তিনি লিখিয়াছেন, "সজীব খবরের কাগজটা অভিনয়ের মতো, নেচে-গেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন বিষয়কে সকলের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরবে। এই সজীব সংবাদ-পত্রের সাহায্যে দেশের সংবাদ ছাড়া অন্য দেশের বিবরণও প্রচার করা যেতে পারে।" ইহা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালার সহিত নানা দেশের খেলনা, পুতুল ও পোশাক-পরিচ্ছদের সংগ্রহ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া যান। এই সকল যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহে ছেলেরা যেমন আনন্দ পায় তেমনি বিভিন্ন দেশের প্রাত্যহিক ব্যবহারের জিনিসপত্র দেখিয়া প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধে কিছু ধারণাও জন্মে।

কাজ ও খেলার সাহায্যে বালকদিগের শিক্ষাকার্য কিভাবে আনন্দময় হইয়া উঠিতে পারে এ শিক্ষা-জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁহার শিক্ষকতা গ্রহণের অনেক পূর্ব হইতেই জাগিয়াছিল। অনেকের মনে হইতে পারে যে তিনি পশ্চিমের Playway Method-কে অনুকরণ করিয়াছেন। যাঁহারা রবীন্দ্র-শিক্ষাপদ্ধতি ও Playway Method-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা নিশ্চিত জানেন যে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে অনুকরণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি—মানুষের জীবন তাঁহার নিকটে ছন্দোময় লীলারূপের প্রকাশ—জগৎকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ ও দান করাই কবিধর্ম—ইহাতেই কবির আনন্দ। এই আনন্দের ভিতরেই মানুষের জীবন—তাহাতেই তাহার শিক্ষার গতি, স্থিতি ও পরিণতি না হইলে তাহার জীবনই বৃথা হইয়া যায়। শিক্ষার গতি দিবে স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা—স্থিতি দিবে সংযম এবং এই দুইয়ের প্রকৃত মিলনে জীবনের প্রকাশ ও পূর্ণতা। রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হইল ইহাই,—তাঁহার শিক্ষাদর্শনের চরম লক্ষ্য হইল স্বাধীনতা ও সংযমের সুষ্ঠু মিলন। এই দুইটির একটির অভাবে অন্যটি বিফল হইয়া যায়। কেননা খেলার মধ্যে সংযম না থাকিলে তাহা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায় এবং কাজের মধ্যে স্বাধীনতা না থাকিলে তাহা নির্জীব হইয়া পড়ে। Playway Method-এর ন্যায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ক্লাশের গণ্ডির ভিতরে কয়েক ঘণ্টা আনন্দময় কাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে—ইহা সর্বদিনব্যাপী জীবনচেষ্টা। এখানে যেমন সমষ্টি একত্রে কাজ করিতেছে তেমনি ব্যষ্টির সম্পূর্ণ আত্মগুণ প্রকাশের জন্যও বিবিধ ব্যবস্থা আছে। নৃত্য-গীত-অভিনয়, কারু ও চারুশিল্পকলা, ক্রীড়া, সমাজসেবা ও ধর্ম, পুস্তকশিক্ষার সহিত এমনভাবে মিলিয়াছে যে বালকেরা সংযম ও

স্বাধীনতা শিক্ষার পূর্ণতম সুযোগ পাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের সহিত পাশ্চাত্য Playway Method-এর বাহ্য সাদৃশ্য আছে নিশ্চয়ই, মূলগত সাদৃশ্যেরও বহু লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কবির শিক্ষাদর্শন আরও ব্যাপক, আরও গভীর—একথাও অস্বীকার করা যায় না।

সুকুমার শিল্পকলার ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় সঙ্গীত এবং নৃত্য-শিক্ষাও একটি অত্যাবশ্যক ও সুন্দর সংযোজনা। এক সময়ে নৃত্যের স্থান ছিল বৈদিক যাগযজ্ঞের পুণ্যক্ষেত্রে। তাহার পরে শৈব এবং বৈষ্ণব মন্দিরেও পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল নৃত্য। স্বয়ং নটরাজ মহাদেব জীবনের ছন্দোময় রূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার তাণ্ডব নৃত্যে—সেই নৃত্য-শিল্পের মহনীয় রূপটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কালের প্রবাহে, কেবল ধরা পড়িয়াছিল দেবদাসীদের চরণছন্দে। যিনি এই নৃত্যশিল্পকে আবার পুরাতন গৌরবের আসনে তুলিয়া আনিয়াছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। ললিতকলার খাঁটি রূপ দিয়া সাজাইয়া নৃত্যকে সাংস্কৃতিক রূপ দিলেন তিনি। যেমন চিত্র ও ভাস্কর্যের তেমনি নৃত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে, রূপ-রস, শালীনতা ও মর্যাদা লক্ষ্য করিতে কবিগুরু অকৃত্রিম উৎসাহ দিতেন তাঁহার আশ্রমের বালকবালিকা-দিগকে। এইভাবে সঙ্গীতের যে রসধারার ও নৃত্যের যে ছন্দলীলার দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন কবিগুরু তাহার আনন্দপ্রবাহে কেবল শান্তিনিকেতন নহে কিন্তু সমস্ত বাংলা দেশই ডুবিয়া গেল।

কলাবিদ্যার বিরুদ্ধে একদিন দেশের লোক অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি হইল যে ইহা জাতিকে দুর্বল করে। কবিগুরু বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে ললিতকলা-শিক্ষার দ্বারা তাহাদের পৌরুষ খর্ব হইতেছে এমন প্রমাণ নাই—আনন্দপ্রকাশ জীবনী-শক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দপ্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনী-শক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়। যে-জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে-জাতি কাজ করিতেও ভোলে। * * * আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞ লোকে ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে।" রবীন্দ্রনাথ এই ভুল ভাঙিবার জন্যই একদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা-শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে ইহাই আমাদের সঙ্কল্প হউক।"

যে-কোন শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনাকালে ছাত্রশাসন সম্পর্কে শিক্ষাবিদগণের অভিমত কি তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে অপরাধ করিলে তাঁহার বালকেরা দেশের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল। প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। অপরাধী বালক নিজে দণ্ড স্বীকার করিতে শিখিবে, নহিলে গ্লানি মোচন হয় না—কিন্তু পরের নিকট নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা যে মনুষ্যোচিত নহে এ শিক্ষাও তাহার বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রশাসন সম্পর্কে বলিয়াছেন, "ছাত্রদের ভার তাঁহারাই লইবার অধিকারী যাঁহারা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। * * * ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে, ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাহাদের প্রাণকোরকের মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাহাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই—তাহাদের মধ্যে আছে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা, সেইজন্য সংগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সাহত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাঁহাদের চোখে পড়ে না, যাঁহারা নিজের বিদ্যা, পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত তাঁহারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যাঁহারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে পারেন না, ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তাঁহারা সহজে পাইতে পারিবেন না। * * * ছাত্রদের ভার তাঁহারাই লইবার অধিকারী যাঁহারা নিজেদের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজে শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁহারা জানেন, 'শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা।'

অপর পক্ষ বলিবেন তবে কি ছেলেরা যাহা খুশি তাহাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যাহা খুশি তাহা কখনোই করিবে না। তাহারা ঠিক পথেই চলিবে যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়।" রাশিয়াতে যেভাবে ছেলেদের শাসন করা হয় তাহার কথা কবিগুরুর "রাশিয়ার চিঠিতে" পাওয়া যায়। সেখানকার ছেলে-মেয়েরা কবিকে বলিয়াছিল, "সভা ডাকিয়া আলাপ আলোচনার পর কেহ

অপরাধী সাব্যস্ত হইলেই তো তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইল ইহার চেয়ে আর বড় শাস্তি কি হইতে পারে? তাহার পর সেও দুঃখিত হয়, আমরাও দুঃখিত হই, ব্যস চুকে যায়। আর অপরাধী বালক যদি নিজেকে দোষী মনে না করে তবে ভোট লওয়া হয় এবং অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করিয়াছে তাহা হইলে আর কোন কথা চলে না।"

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, ছেলেদের এই ছেলেমানুষির চাঞ্চল্য স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর। এই চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায় তবে এই শক্তিই একদিন চরিত্র ও বুদ্ধিবিকাশে সাহায্য করিবে। বালকদিগের চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতা-সৃষ্টির প্রধান উপায়। বালকেরা নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে এমনতরো মানুষ তৈয়ারী করিতে গেলে ভুল-ত্রুটিও ঘটে, চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বালকদিগের যথার্থ হিতৈষী যাঁহারা, তাঁহারা এই চাঞ্চল্যকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করেন না; বরঞ্চ ইহাতে প্রকৃতির একটি শুভ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা যদি চাই তাহারা কেবলই আমাদের হুকুম মানিয়া চলিবে, কোনরূপ প্রতিবাদ করিবে না, তবে তো তাহাদের কঠোর শাসনের মধ্যে রাখিতেই হয়। ইহাতে কি বালকেরা নির্ভীক হইতে পারে?

সৌন্দর্যের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা বালকদিগের দোষ-ত্রুটি একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত বিলীন হইয়া যাইবে—ইহাই শিক্ষার লক্ষ্য হইলে বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথও এই প্রথার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র আশ্রমের বিচারসভার কাজেই আশ্রম সম্মিলনীর কর্তব্য শেষ হইয়া গেল না—তাহার কার্যক্রম ব্যাপকতর বিবিধ ও দায়িত্বপূর্ণ। কবিগুরুর সহায়তায় প্রতি মাসে আশ্রম-সম্মিলনীর দুইটি অধিবেশনের ব্যবস্থা হইল। একটি অমাবস্যায়, আর একটি পূর্ণিমাতে। অমাবস্যা রাত্রে কাজের বিবৃতি প্রদান, আলোচনা, প্রস্তাবগ্রহণ, আশ্রম পরিচালনার কার্যাবলী স্থির ও সাব্যস্ত করা হইত এবং পূর্ণিমা রাত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠে আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা থাকিত। এইভাবে কাজের দ্বারা, দায়িত্বের দ্বারা বালকদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ।

বালকেরা কতদূর বিদ্যা অর্জন করিয়াছে তাহার গভীরতা ও মান পরিমাপ

করাও শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিশেষ লক্ষ্য। লব্ধ বিদ্যার পরিমাপ করিবার একমাত্র উপায় হইল পরীক্ষণ-পদ্ধতি। ইহাই চিরকালের প্রথা। কিন্তু সেই পরীক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যে কতদূর গলদ রহিয়াছে তাহা আমরা হয়তো চোখ মেলিয়া দেখি না। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিতভাবে পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে কিরূপ বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন তাহা আমরা জানি। তিনি বলিয়াছেন, "শিশুরা যে এখানে আনন্দে দৌড়চ্ছে, গাছে চড়ছে, কলহাস্যে আকাশ মুখর করে তুলছে—আমার মনে হয়েছে যে এরা এমন কিছু লাভ করেছে যা দুর্লভ। তাদের বিদ্যার উপর কী মার্কা মারা হলো এটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়, কিন্তু তাদের চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসি গান আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাসের নম্বর দিতে রাজি হবেন না, কিন্তু আমি জানি এই অতি আদরণীয় প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা।"

আবার আর একজনকে তিনি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "পরীক্ষারূপ পাপ থেকে অতঃপর তুমি যে মুক্তিলাভ করেছ এটা অবশ্য শুধু তোমার পক্ষে নয়, তোমার বন্ধু-বান্ধবের পক্ষেও সুখবর। বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করেছি কি করি নি, তার পরীক্ষা তো জীবনে দিতেই হবে—মাঝথেকে মাস্টার মহাশয়দের কাছে দেবার যে কি সার্থকতা তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারলুম না। বিশ্বটা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বড়—এই সোজা কথাটা ভুলে গিয়ে মানুষ শিক্ষা জিনিসটাকে একটা উপদ্রবের সামিল করেছে।" এত শত কথা বলা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে পরীক্ষাধীন শিক্ষাপদ্ধতি চালাইতে হইয়াছিল। পিতামাতা ও অভিভাবকগণের পরীক্ষাহীন বিদ্যাশিক্ষায় আস্থা ছিল না এবং পরীক্ষাপাশের ছাপ না থাকিলে চাকুরিক্ষেত্রে কোন উপায়ই হইত না—তাহা ছাড়া ইংরাজ-শাসনকালে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি কোনও স্বীকৃতি পায় নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথের মনে যে ইচ্ছা ছিল যে শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ পরিচালিত পরীক্ষার দ্বারাই বালক প্রকৃত বিদ্যার অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহা তিনি প্রচলিত করিতে পারেন নাই। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে শান্তি-নিকেতনের বালকেরা পরীক্ষার জন্য সিলেবাস-বাঁধা পাঠ্য অপেক্ষা আরও অনেক বেশি পড়িত ও শিখিত।

৺অজিত চক্রবর্তী মহাশয় এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন, "ছেলেদের লইয়া যে সকল রকম আলোচনাই করা যায় এবং তাহা যে তাহাদের মনের পরিণতির পক্ষে খুবই সহায়তা করে সে কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা ছেলেদের মনোরাজ্যের সকল খবর রাখেন না। অসংহত জ্যোতির্বাষ্পে এবং পিণ্ডীকৃত সংহত তেজঃপুঞ্জ নক্ষত্রে, অর্থাৎ নেব্যুলাতে এবং নক্ষত্রে যে প্রভেদ, বালকের মনে এবং পরিণত মনে কেবল সেই প্রভেদ। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই কথা বলিতে হইবে যে, যেহেতু জ্ঞানের ও অনুভূতির বিষয়-সকল তাহার মনের মধ্যে সংহত আকার প্রাপ্ত হয় না, ছাড়া ছাড়া ভাবে বিক্ষিপ্ত এবং আবছায়া ভাবে থাকে, অতএব তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনাবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তিকে কেবল রাঙা ছবি আর আরব্যোপন্যাস দিয়া ভুলাইতে হইবে, তাহার চেয়ে বড়ো কিছুই দেওয়া হইবে না; কারণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে সে-সমস্তই তাহার ধারণার অগম্য? সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া অন্ততঃ আমাদের সংস্কারের সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া দেখিবার কি কোনো প্রয়োজন নাই? য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানে এখন উচ্চ অঙ্গের ইংরেজি সাহিত্য হইতে বালকোপযোগী অংশ-সকল চয়ন করিয়া পড়ানো হয়, খুব নীচের ক্লাশে শেক্সপীয়র, রস্কিন, ওআর্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি পড়ানো হইতেছে। ইতিহাস ভূগোল মিশাইয়া সমস্ত জগৎ-সভ্যতার ক্রমবিকাশ শিশুদের কাছে দিবার চেষ্টা হইতেছে।

বিজ্ঞানের সকল ব্যাপার সাধারণ-বোধগম্য করিবার জন্য বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক মহারথীও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। হেল্‌মহৎজ, টিণ্ডাল, লাবক প্রভৃতি সেই কার্যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইংলণ্ডে জার্মানীতে ও আমেরিকায় যদি শিশুকে শিশু বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া রাঙা ছবি দিয়া ভুলানো না হয় তবে আমরাই বা কেন শিক্ষাকে কেবল নীরস ও শুষ্ক করিয়া রাখিব তাহা তো বুঝি না। সার অলিভার লজের ন্যায় কড়া বৈজ্ঞানিকেরও School Teaching and School Reform নামক গ্রন্থে এই কথা লেখনীতে বাহির হইয়াছে যে শিক্ষার আদর্শ কেবল খবর দেওয়া নহে, কিন্তু মানস-শক্তির উদ্বোধন করা; সুতরাং ক্রমাগত সকল বিষয়েই দেখিতে হইবে যে অধীত বিদ্যা বিদ্যার্থীর স্বকীয় জিনিস হইতেছে কিনা, যাহাতে সে তাহা ব্যবহারে লাগাইতে পারে। সাহিত্য পড়িয়া যদি রসবোধ না হয়, বিজ্ঞান শিখিয়া যদি অনুসন্ধিৎসা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার প্রবৃত্তি না জন্মে তবে কী শিক্ষা হইল?" এই প্রসঙ্গে

তিনি আরও বলিতেছেন, "যাহাই হউক বিদ্যালয় তখনকার ছাত্রদের অনেক জিনিস নির্বিচারে দিবার চেষ্টা করিয়াছিল যদিও তাহাকে বেশ সুবিহিত প্রণালীর মধ্যে বদ্ধ করিতে পারে নাই।"

বালকদিগকে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াকে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি মর্যাদা দিতেন না; পুরস্কার পাওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি মধুর ঘটনা উল্লেখ করিব। তিনি "জীবনস্মৃতি"তে লিখিতেছেন, "ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই, একবার কেবল সচ্চরিত্রের পুরস্কার বলিয়া একখানা "ছন্দোমালা" বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো একবার পরীক্ষায় ভালোরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই দৌড়িয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়াছিলেন। আমি দূর হইতেই চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, "গুণদাদা সত্য প্রাইজ পাইয়াছে।" তিনি হাসিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি প্রাইজ পাও নাই?" আমি কহিলাম, "না আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।" ইহাতে গুণদাদা ভারি খুশি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ না পাওয়া সত্ত্বেও সত্যর প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি, ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একটা সদ্গুণের পরিচয় মনে হইল।" এই প্রসঙ্গে কবিগুরু বলিতেছেন, "আমার তো মনে হয়, ছেলেদের দান করা ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে; ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না, ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।"

পুরস্কার সম্বন্ধে কবির মনের কথাটি সুস্পষ্ট হইয়াছে "পুরস্কার" কবিতাতে

"পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,—
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল,
দুবাহু বাড়ায়ে পরান উতল
কবিরে লইলা বুকে;
কহিলা, "ধন্য, কবি গো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাকো সুখে।

ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।”

প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি দু নয়ন কবি তাঁরে বলে,
“কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।”

নিয়মিত লেখাপড়ার সহিত বালকেরা যাহাতে অবসর যাপনের জন্য শখের কাজ বা লোকহিতসাধনের কাজ করিতে পারে তাহার নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেইজন্যই তিনি সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীত, বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন, তাহা আশ্রমের সাধনার অন্তর্গত করিয়াছিলেন। আশ্রমের গোশালার গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার বালকাদগের উপরে ছিল, হরিণ-গুলিকে বশে আনিবার জন্য বালকেরা তাহাদের যত্ন করিত, পাখিগুলিকে খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পরিবেশে বশ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত হইত। কাঠবিড়ালী ও পায়রাগুলিকে যত্ন করিত; প্রত্যহ গাছে জল দিয়া উদ্যান রচনায় সাহায্য করিত। ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিকাশ যেন ব্যাহত না হয় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন; ছাত্রেরা খাইতে বসিলে তাহারা পালা করিয়া পরিবেশন করিত। মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া সকলে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিত। সহপাঠীদের অসুস্থতাতে তাহারা সেবা করিত, ঔষধপথ্য দেওয়া, ঘর-দ্বার পরিষ্কার রাখার ভার গ্রহণ করিত। ভৃত্যদের সহিত ভদ্র ব্যবহার, তাহাদের সেবাযত্ন করা এবং পীড়িত হইলে তাহাদের তত্ত্বাবধান করাও ছাত্রদিগের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইত।

আশ্রম-বিদ্যালয়ে বালকবালিকারা একসঙ্গে পড়াশুনা করিবে ইহা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আশ্রমের সূচনাকালে বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। তিনি তপোবনের যে বর্ণনা

দিয়াছেন তাহাতে বালকবালিকাগণ কিভাবে বিদ্যাচর্চা করিবে, তাহাদের ব্যবহারিক শিক্ষা কি ধরনের হইবে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। আশ্রমের কর্মিবৃন্দের কন্যাদের লইয়া বালিকা-বিদ্যালয় সুরু হয়। তখনকার দিনে এমনই ব্যবস্থা ছিল যে ১৩১৭ সনে যখন "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনীত হয় তখন কোন পুরুষ দর্শক হিসাবেও সেখানে উপস্থিত থাকিতে অনুমতি পান নাই। নাটিকার সব ভূমিকাই মেয়েদের, দর্শকও মেয়েরা। এমনই কড়াকড়ি ব্যাপার ছিল সেদিনে। আশ্রমে পর্দা মানিয়া চলিতে হইত এবং যেখানে সেখানে যেমন তেমন করিয়া কাহারও ঘুরিবার অনুমতি ছিল না। ছাত্রীরা পৌষ মেলায় যাইতে পাইত না, সন্ধ্যার পর বাজি পোড়ানো দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে একটা প্রকাণ্ড কাঠের গাড়ীতে ভরিয়া ছেলেরা ও অধ্যাপকেরা টানিয়া মেলার এক কোণে দাঁড় করাইয়া দিতেন—তাহার ভিতর হইতে যে-যেমন দেখিতে পারিত দেখিত। ক্রমে ক্রমে কতই না পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের যে অমত ছিল তাহা বলিতে পারি না তবে ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিমত ছিল তাহা এখানে উল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছেন, "বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে; একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষে পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষাদানের একটা বিশেষত্ব আছে।"

মেয়েদের সেই ব্যবহারিক শিক্ষা যে কিরূপ হইবে সে বিষয়ে তিনি কোন বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই বটে তবে এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে চিন্তা ছিল তাহার সার মর্ম হইল, "মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে; এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপর সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের শক্তির দায়।" আবার নারীর আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "সঙ্কটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে-দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাঁহারা প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।" সভ্যজগতে মেয়েরা পুরুষের অনুগত হওয়াকে অনেক ক্ষেত্রে হীন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "স্বামীগৃহে স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া মেয়েদের স্বভাব। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করেন, তাহাতে কোন দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করেন, তাহার মধ্যেও কোন দায় নাই।" এই কথা মনে রাখিলে মেয়েদের পক্ষে স্বামী, সন্তান, পরিজন ও দেশ সেবার

কোন কাজই কঠিন বা ক্লেশকর বলিয়া মনে হইবে না, এবং সমস্ত ব্যবহারিক শিক্ষাও তাঁহারা সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়েই বাংলাদেশের প্রথম সহশিক্ষার পরীক্ষা সুরু হয় এবং নানা ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও তাহা যে সার্থক হইয়াছে একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে।

নারী যাহাতে যথার্থরূপে পুরুষের সহধর্মিণী হইতে পারে, স্নেহে নারী ও বীর্যে পুরুষের সহায় হইতে পারে এই শিক্ষাপদ্ধতির কথাই কবিগুরুর মনে ছিল যখন তিনি লিখিয়াছিলেন,

"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি, রাখিবে মাথায় সে-ও আমি
নহি, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী
আমার পাইবে পরিচয়।"

আবার আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "তখন গৌরী তাঁহার নির্মল চিন্ময় তপস্যাতে শিবকে জাগাইলেন, স্বর্গরাজ্য মুক্ত হইল। তেমনি ভারতের দুর্গতির চরম সীমায় পুরুষের দল আছেন কূটরাজনীতি লইয়া—নারী যেন পুরুষদের অক্ষম ও দুর্বল অনুকরণ করিয়া সময় ও সুযোগ নষ্ট না করেন, তাঁহারা যেন দেশের শিব বা মঙ্গল শক্তিকে তপস্যার দ্বারা জাগ্রত করেন।"

বিদ্যালয়ে ছুটি দেওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি মত ছিল সে কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। কাজ আনন্দময় হইবে কিন্তু হেলাফেলা করিয়া হইবে না—একথা তিনি বারবার করিয়া বলিয়াছেন। নিজেও কি নিখুঁতভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন সারা জীবন ধরিয়া তাহার প্রমাণ তো আমাদের সামনেই রহিয়াছে। তাঁহার কাজে কোন ফাঁকি বা ফাঁক ছিল না—সেইজন্য তিনিই ছুটির উপকারিতা সম্বন্ধে এত পরিষ্কার মতামত দিয়াছেন। "রাজর্ষি"তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বিল্বন ঠাকুর এক একদিন অপরাহ্ণে রাজ্যের ছেলে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ,

মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শুনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই একটা নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু যখন দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাই তোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে—তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানে ছাড়িয়া দিতেন। আশ্রমের কাজ বন্ধ থাকিলে বালকেরা অধ্যাপকদিগের সহিত ভ্রমণে বাহির হইত এবং দেশের নানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা পূর্ণ করিত। সর্বদাই যে তাহারা বাড়ি যাইত এমন নহে তবে ছুটির খানিকটা অংশ পিতামাতার সঙ্গে অতিবাহিত করাও কবিগুরু বালকদের মনের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করিতেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকপরিষদ একটি আবশ্যিক অঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথও তাহা তাঁহার বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন। যাহাতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় একাকী নেতৃত্ব না করেন—যাহাতে সকলের শুভবুদ্ধিতে বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই শিক্ষক-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্বতঃ-উৎসারিত মঙ্গল-ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত কোন উদ্দেশ্যই যে সফল হয় না তাহা রবীন্দ্রনাথ বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতেন, সেইজন্য তিনি একদিন ভাষণে বলিয়াছিলেন, "এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না; তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন, ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জান। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।"

শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনাকালে বিদ্যালয়ের আসবাব উপকরণের কথাও ভাবিতে হয়। বিদ্যালয়ের গৃহ, আসবাব উপকরণের উপরে অত্যধিক ব্যয় করিয়া শিক্ষাকে দুর্লভ ও দুর্মূল্য করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মত ছিল না কিন্তু যে সকল জিনিস না হইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইতে পারে তাহা যতই মূল্যবান হউক না কেন তিনি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন। উন্মুক্ত স্থানে বিদ্যাচর্চার আয়োজন হইলেও যাহাতে ছেলেরা অযথা রৌদ্রতাপে বা বৃষ্টিতে কষ্ট না পায় তাহার জন্য সময়-সূচী এমনভাবে তৈয়ারি হইত

যে আবহাওয়ার রুদ্রতা হইতে তাহারা রক্ষা পাইত। তিনি এ বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ হইল এই যে উচ্চশিক্ষার মূলে রস জোগায় দেশের সার্বজনীন শিক্ষা; তাহারই ব্যবস্থা যখন দেশে হয় নাই, তখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে দেশের গভর্ণর বলিয়াছেন অট্টালিকা না হইলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায় না—এ আবার আর এক উপসর্গ। আসবাব বাড়াইয়া সঙ্কীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরও সঙ্কুচিত করা হইতেছে। তাহার পর তিনি আরও বলিয়াছেন, "মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার, থালারও দরকার এ কথা মানি; কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে, তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবন-যাত্রা গরীবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে। আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খড়োঘরে মানুষ—এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে একথা আমাদের কাছে চলিবে না * * * দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগ-সামগ্রীর চেয়ে দাম বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তু কুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "মানুষের পক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্লভ হইতেছে, গান-বাজনা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন-আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে। এ বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক। * * * যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, "যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

কেবল তাহাই নহে রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে শরীর ও মনকে

খাটাইবার জন্য জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণ বিরল করিয়া তোলা অত্যাবশ্যক। আশ্রমের পরিচালনায়, আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের সম্মিলিত রচনায়—কর্মসমবায়ের মাধ্যমেই সহকারিতার সখ্য বিস্তার করা সম্ভব। উপকরণের দ্বারা জীবন ভরিয়া তুলিলে সতত-উদ্যমশীল কর্মসহযোগিতা গড়িয়া ওঠা কঠিন। আপনার চারদিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তোলার জন্য কর্ম, একত্রবাসের জন্য যে সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস এগুলি বাল্যকাল হইতেই জীবনের অংশ হইলে একজনের শৈথিল্য, অন্যের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হইবে না। এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তি, রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সহযোগিতার সভ্যনীতিকে সচেতন করে' তোলা আশ্রমের শিক্ষায় প্রধান সুযোগ। * * * একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নহে, বস্তুলুব্ধতা থেকে। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। * * * বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষাটা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হতে থাকে। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু সামগ্রী যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে সুন্দর করে উদ্ভাবিত করার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে এই আমার কামনা।"

তিনি আরও বলেন যে উপকরণের বিরলতা লইয়া অসঙ্গত ক্ষোভের সঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করা চরিত্র-দৌর্বল্যের লক্ষণ। আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভাল, স্বল্পে অভ্যস্ত থাকিলে হঠাৎ অসুবিধায় পড়িতে হয় না। আমরাই বয়স্কলোকের চাওয়াটাকে বালকদের উপরে চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বস্তুর নেশাগ্রস্ত করিয়া তুলি। কবিগুরু বলিয়াছেন, "শরীর ও মনের শক্তির সম্যকরূপে চর্চা সেইখানেই ভালো করে করা সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। আত্ম-কর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টি-কর্তৃত্ব। সেই মানুষ যথার্থ স্বরাট যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে।"

আশ্রম-বিদ্যালয় এখন কিরূপ বিরাট পরিধি গ্রহণ করিয়াছে তাহার পরিচয়

দিয়া অধ্যায়টি শেষ করিব। বারোটি বিভিন্ন বিভাগে বিশ্বভারতীর কাজ চলিতেছে। পাঠভবনে শিশুশিক্ষা হইতে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাভবনে উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ কলেজীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যাভবন হইল গবেষণা বিভাগ। চীনাভবন, হিন্দীভবনের নাম হইতেই বুঝা যায় এখানকার উদ্দেশ্য কি। কলাভবন, সঙ্গীতভবন ও শিল্পভবনে চারু ও ললিতকলা শিক্ষা করিতে দেশ-বিদেশের ছাত্রগণ সমাগত হন। দীনবন্ধুভবন এণ্ড্রুজ সাহেবের স্মরণার্থে স্থাপিত। সেখানে সমাজসেবা ও খ্রীষ্টীয় আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। রবীন্দ্রসদনে—রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনার সংগ্রহাবলী ও তাঁহার কর্মসংক্রান্ত সকল প্রকার বিবরণ, সকল দেশের মতামত ইত্যাদি সংগৃহীত ও সঞ্চিত আছে যাহাতে গবেষকগণ বিস্তারিত-ভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে সুযোগ পান। রবীন্দ্র-নাথের তিরোধানের পর শান্তিনিকেতনে বিনয়ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে শিক্ষক-শিক্ষণের কাজ হইয়া থাকে। যাহাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন তাহারই জন্য কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট। সর্বশেষে শ্রীনিকেতনের কথা বলিব। শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের একটি মহান সৃষ্টি। বুনিয়াদী শিক্ষার ও সর্বার্থসাধক শিক্ষার সমস্ত বীজ এইখানেই নিহিত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে, তাহাই আজ উপ্ত হইয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যে শিক্ষাপদ্ধতি আজ সমস্ত ভারতভূমিতে পরিব্যাপ্ত তাহা শিক্ষাবিধিতে অনভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠায় জন্ম লইয়া তাঁহারই সাধনায় লালিত হইয়া আজ পরিপুষ্টির দিকে। বাংলার এই সাধকের দান ভারত আজ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের যে সঙ্কল্প ছিল যে আশ্রমের ছেলেরা চারিদিকের জগতের অব্যবহিত পরিবেশ সম্পর্কে উৎসুক হইয়া উঠিবে, সন্ধান করিবে, পরীক্ষা করিবে, সংগ্রহ করিবে—সেই সঙ্কল্প কবিগুরুর মনে কোনদিনই ম্লান হয় নাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মানুষের প্রতি আমাদের ছেলেদের ঔৎসুক্য দুর্বল, গাছপালা, পশুপাখির প্রতিও। স্রোতের শেওলার মতো তাদের মন ভেসে বেড়ায়, চারদিকের জগতে কোন কিছুকেই আঁকড়ে ধরে না। নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আমাদের দিনে যে-সব জাতি সমস্ত পৃথিবীর উপর ক্ষমতা বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই উপরে তাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। কেবলমাত্র নিজের দেশের মানুষ ও বস্তু

সম্বন্ধে নয়, এমন দেশ নেই এমন কাল নেই এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাঁদের মন ধাবিত না হচ্ছে। মন তাদের সর্বতোভাবে বেঁচে আছে—তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হলো সর্বজগতে।”

তাই তিনি তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষকগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন যাঁহাদের দৃষ্টি বই এর সীমানা পার হইয়া প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিবদ্ধ। যাঁহারা চক্ষুষ্মান, যাঁহারা সন্ধানী, যাঁহারা বিশ্বকুতূহলী, যাঁহাদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়বিস্তারে যাঁহারা প্রেরণাশক্তি জুগাইতে পারিবেন এমনই শিক্ষকের প্রয়োজন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে। কেননা এই শিক্ষাই পরিপূর্ণভাবে বাঁচিয়া থাকিবার শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন “মরা মন নিয়েও পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম শিখরে ওঠা যায়, তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে যাদের মন গ্রন্থের পত্রচর, ছাপার অক্ষরে একান্ত আসক্ত, বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি যাদের চিত্ত-বিক্ষেপের কোন আশঙ্কা নেই, এরা পদবি অধিকার করে, জগৎ অধিকার করে না।” রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য ইহা ছিল না বলিয়াই তাহার জীবদ্দশায় বিশ্বভারতী হইতে কোন ডিগ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই।

একদিন রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “এদেশের দুর্ভাগ্য, যাঁরা বিদ্যাদানে পটু, যাঁরা সত্যিকার বিদ্বান, যাঁরা বিদ্যাদানের কৌশলকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছেন, তাঁরা সকল ক্ষেত্রে না হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু কিম্বা বালকদের শিক্ষাদানকাযকে নিজেদের ভাবী পদমর্যাদার বিরোধী বিষয় বলে গণ্য করেন। ছোট ছেলেদের পড়ানো যেন তাঁদের মর্যাদার বাইরে।” শিশুদের লইয়া তাহাদের নবীন মনটিকে সহজ জ্ঞানে ভরিয়া তোলা যে কত কঠিন কাজ তাহা বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদগণ খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই কমেনিয়াস, পেস্টালটসি, রুশো, ফ্রোবেল, মন্তেসরী প্রমুখ শিক্ষাশাস্ত্রিগণ উচ্চশিক্ষার কথা ভাবেন নাই—ভাবিয়াছিলেন শিশুশিক্ষার কথা। শিশুকে গড়াই তো মানুষ গড়ার কাজ।

শিশুশিক্ষার কাজে খ্যাতি নাই, কোন পুরস্কার নাই বলিয়া অনেকের মনেই ধারণা। শিশুর ভাবলেশহীন মুখে যখন জ্ঞানের চেতনা ফুটিয়া উঠে—যখন তাহার হৃদয়ে কৌতূহল জাগিয়া উঠে—নূতন ঔৎসুক্যে তাহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে—তখনই তো শিক্ষকের পুরস্কার। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তাহার নিকটে ঢালিয়া দিলে তবেই এই পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায়—তাহাতেই

শিক্ষকের আনন্দ ও সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশ্বাস ও সাহস দিয়া বলিতেছেন, "ছোট ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পর দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর স্কুল-মাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, সামর্থ্য নিলে—এইটেই আমার সার্থকতা। এই যে আমার সাধনার সুযোগ ঘটল এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ—এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সঙ্গমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।"

॥ ৭ ॥

শিশু-সাহিত্য

জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে শিব ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার জন্য গুরুদেব তাঁহার আশ্রম রচনা করিয়াছিলেন। সাধনার সঙ্গী পাইয়াছিলেন কয়েকজন ত্যাগী ভক্ত ও অনুরাগী অধ্যাপক আর প্রাণচঞ্চল বালক। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই একত্র বাস, একত্র আহার এবং একত্র পাঠ ও ক্রীড়ার ফলে গুরু ও শিষ্যদের মধ্যে যে ভক্তি ও স্নেহের আত্মীয়তাসূত্র দৃঢ় হইয়া উঠিল তাহাতে গুরুদেব পরম তৃপ্তি পাইলেন। এইভাবে তাঁহার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইল, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে নামিয়া তিনি দেখিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা-কার্যে অর্থের অভাব তো আছেই আরও অভাব আছে বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের। বালকের সমস্ত শিক্ষার মূল আছে তাহার দেশের মাটিতে—তাহার দেশের ভাষায়—সেই ভাষাতেই উপযুক্ত পুস্তকাদি না থাকাতে কবি বিশেষভাবে অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। কিভাবে তিনি এই অভাব মোচন করিয়াছিলেন, কি সাধনার দ্বারা তিনি বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনাকালে বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবি বালকদিগের জন্য পাঠ্য-পুস্তক রচনার কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবী ও নিজের সন্তানদের জন্য তিনি যেসব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি ও অন্যান্য স্বরচিত সহজ প্রবন্ধ লইয়া ছেলেমেয়েদের পড়িবার মত পুস্তক তৈয়ারি করিবেন বলিয়া তিনি মনস্থ করিলেন, কিন্তু পারিবারিক অসুস্থতা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে এই দিনগুলি কাটিতেছিল বলিয়া কার্যতঃ কোন পাঠ্য-পুস্তকই প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী মৃণালিনীদেবী অকালে মারা গেলেন। পত্নীর বিচ্ছেদ-বেদনায় তাঁহার শোকাশ্রু দুকূল-প্লাবী হইয়া উঠিল কিন্তু কবির ভদ্র সংযত মন যাহা তাঁহার নিতান্ত আপনার দুঃখ তাহা জনসাধারণের সম্মুখে কোন উচ্ছ্বসিত ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিল না। অথচ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ভার লাঘব না হইলেও

তো শান্তি পাওয়া যায় না। ঠিক এই সময়ে মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে কবির কাব্যগ্রন্থে একটি "শিশু" খণ্ড জুড়িয়া দিলে কাব্যসঙ্কলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কবি তখন আলমোড়ায়। স্ত্রী-বিয়োগের পর অসুস্থ মধ্যমা কন্যা রেণুকাকে লইয়া স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিতেছিলেন। কবিগুরু মোহিতবাবুর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলেন। যেন রুদ্ধ বেদনা হইতে মুক্তি পাইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় দেখিয়া তাঁহার মন ইহাতে সায় দিল।

সন্তানদের সান্ত্বনা ও আনন্দ দিতে গিয়া কবি নিজে শিশুমনের যে মাধুর্য ও রহস্যের সন্ধান পাইলেন, তাহারই প্রকাশ দেখি তাঁহার "শিশু" কাব্যে। কেবল তাহাই নহে, এই সময়ে তিনি "শিশুকে" উপলক্ষ্য করিয়া ছলনাপূর্বক "শিশুর মাব সঙ্গ" পাইয়াছিলেন, তাই এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে যে আন্তরিকতা ও প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় তাহা যে কেবল আমাদের ব্যথিত করে এমন নহে কিন্তু শিশু ও মাতৃচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাব অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা দেখিয়া এক আশ্চর্য অনুভূতিতে মন ভরিয়া উঠে। বহুদিন পবে ১৩২৮ সনে "শিশু ভোলানাথ" কাব্যগ্রন্থের জন্য যে-সকল কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলিতে সেই স্নেহকাতর বিয়োগবিধুব মনের আভাস দেখিতে পাই। এতদিন পরেও দেখি আশ্বিন মাসে পূজাসমাগমে শিশুর মাতাকে স্মবণ কবিয়া তিনি লিখিতেছেন,

"মাকে আমার পড়ে না মনে
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে
মা বুঝি গান গাইত আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে
মা গিয়েছে যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।"

ছেলেদের পাঠ্য-পুস্তক সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া কবির গার্হস্থ্য জীবনের গভীর

শোকাঘাতের কথা অনেকখানিই লিখিতে হইল কেননা "শিশু" কাব্যগ্রন্থে শিশু ও শিশুর মাতার চরিত্রের যে সকল দিক তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই ব্যক্তিগত স্পর্শটুকু না থাকিলে কেবলমাত্র কবির ভাবোপলব্ধির দ্বারা এমন অপরূপ আলেখ্য অঙ্কন করা সম্ভব হইত কিনা জানি না। শিশুকে ঘিরিয়া তিনি লিখিলেন,

"তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া
কোমল গায়ে দিল
পরায়ে রঙীন আঙিয়া,
বিহানবেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কি খেলা ছলে
চরণ দুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া
তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া।"

কবিমানসের এই যে শিশু—সে যে যুগে যুগে বাঙালী জাতিকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। একদিন বৈষ্ণব কবিগণ গাহিয়াছিলেন,

"নাচত মোহন নন্দদুলাল
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত
কিঙ্কিণী তাঁহি রসাল
* * * *
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতনভূষণ
কটিতে কিঙ্কিণী ধটি পীত বসন
* * * *
চরণে নূপুর দিল তিলক কপালে
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে।"

মানুষের অন্তরের এই যে চিরন্তন বাৎসল্যরসের প্রকাশ তাহা কবিগুরুর রচনায় নব রূপ ধারণ করিয়া উৎসারিত হইল ফল্গুধারার ন্যায় তাঁহার "শিশু" কাব্যে। শিশুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার চিত্তকে পদ্মের পাপড়ির মত মেলিয়া ধরিলেন কবি, তাই এই কবিতাগুলি এত মর্মস্পর্শী, জগৎসাহিত্যে এমন অতুল।

কেবল তাহাই নহে, মাতৃচরিত্রেরও যে রূপটি কবি ফুটাইয়া তুলিলেন "শিশু" কাব্যে, মনে হয় পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যেই তাহার তুলনা মেলে না। মাতৃজাতির সমস্ত সত্তা আজীবন উৎকীর্ণ হইয়া থাকে একটি "মা" ডাকের জন্য। তাই তো জননী বলিতেছেন—তুই ছিলি

"আমার চিরকালের আশায়
আমার সকল ভালবাসায়।"

শিশুচরিত্র ও শিশুমানস লইয়া আজ মনস্তত্ত্ববিদগণ যত কথা বলিতেছেন তাহার সকল দিকই উদ্ঘাটন করিয়াছেন কবি তাঁহার "শিশু" ও "শিশু-ভোলানাথ" কাব্যগ্রন্থের মধ্যে। "শিশু" কাব্যগ্রন্থ যখন "Crescent Moon" নামে অনূদিত হইয়া বিলাতে প্রকাশিত হয়, পাঠকগণ ইহাকে গীতাঞ্জলির মতই অসামান্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শিশুমনের বিচিত্ররূপ এমন সহজ ছন্দে ফুটাইয়া তোলা বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম। এতাদন "শিশুকবিতা" বলিয়া যাহা ছিল তাহা কতকগুলি নীতি উপদেশ বা গুটিকতক কঠিনভাষায় রচিত প্রকৃতিদেবীর বর্ণনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ "শিশু" কাব্য রচনা করিয়া একদিকে যেমন শিশুচিত্তের গোপন কথাটি প্রকাশ করিলেন অন্য দিকে তেমনি বাংলা-সাহিত্যে আলোচনা করিবার মত আর একটি দিকও খুলিয়া দিলেন।

এই সময়ে তাঁহার ধ্যাননিবিড় দৃষ্টিতে একটি সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল যে শিশু ও কিশোরকে আনন্দ দিয়া, শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তোলা যেমন ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজন তেমনি সমষ্টিগতভাবেও প্রয়োজন। তাই তিনি এখন হইতে শিশুদের জন্য সমষ্টিগতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শান্তি-নিকেতনে এক আনন্দধাম গড়িয়া তুলিলেন। এইখানে শিশুদের লীলাচপলতা দেখিয়া, হাস্যোজ্জল আনন্দকৌতুকপূর্ণ জীবনের প্রকাশ দেখিয়া তিনি লিখিলেন,

"জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।"

তাহাদের জীবন-সমুদ্রতীরে এই যে আনন্দময় খেলার সূচনা, যে খেলার আনন্দে তাহাদের উচ্ছল হাসি, নৃত্যমুখর ছন্দ, সেই আনন্দে

"ফেনিয়ে ওঠে সাগর হাসে
হাসে সাগর বেলা।"

এই আনন্দময় জীবন শিশুর চিরন্তন হউক, এই জগতের কঠিন উপল-

খণ্ডের উপর দিয়া তাহার জীবনপ্রবাহ নির্ঝরের ন্যায় সহজ ছন্দে বহিয়া যাক ইহাই ছিল কবির প্রার্থনা। তাই দেখি শিশুর জন্য তিনি সকলের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া লিখিতেছেন,

"সুখে যাও চ'লে ভবের তরঙ্গ দলে',
স্বর্গ হ'তে আসুক বাতাস।
সুখ দুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল ঢেউ খেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।"

শিশুদের প্রতি কবির এই যে প্রীতি তাহা তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে সহসা প্রকাশ পায় নাই। বালগোপালের পূজা সুরু হইয়াছিল জীবনের অতি প্রত্যুষেই। বাড়ীতে "ভাইবোন সমিতি" স্থাপন করিয়া ছোট ছোট ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নীদের লইয়া যে সব আনন্দোৎসব হইত সে সকলের আয়োজনে তাঁহারই উৎসাহ ছিল বেশি। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য যখন "বালক" পত্রিকা বাহির হইল তখন তিনিই হন উহার প্রধান লেখক এবং ইহারই পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সুরু হয় শিশুমনকে আনন্দদানের প্রথম মহোৎসব। বাল্য ও কৈশোরে কবি অনেক সময়েই তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে থাকিতেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরাদেবীকে ঘিরিয়া তিনি যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'হাসিরাশি', 'পরিচয়', 'বিচ্ছেদ', 'পাখীর পালক', 'মা-লক্ষ্মী,' 'আশীর্বাদ' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সাহিত্যে যে-সকল কৌতুকপূর্ণ কবিতা ও হেঁয়ালী-নাট্য রচনা করিয়া নির্দোষ হাস্যরস ও মার্জিত রুচির প্রচলন করিয়াছিলেন কবি তাহারও সুরু হয় এই সময় হইতে। ১২৯৩ সনে "ভারতী পত্রিকা"তে "নাসিক হইতে খুড়োর পত্র" নামে যে কবিতা প্রকাশিত হয় তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ-সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু মেরা,
সুরেনবাবু, আসলবাবু, সকল বাবুকো সেরা
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা,
মহিনাভর, কুছ খবর মিলে না ইয়েত নহি আচ্ছা।

*   *   *   *

প্রবাস কো এক সীমাপর হম্ বৈঠকে আছি একলা
সুরি বাবাকো বাস্তে আঁখসে বহুৎ পানি নেকলা।

সর্বদা মন কেমন করতা, কেঁদে উঠতা হৃদয়—
ভাত খাতা ইস্কুল যাতা সুরেনবাবু নির্দয়।
মনকা দুঃখে হু হু করকে নিকলে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেকতা কানে বাঙ্গলাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম করতা তেরি বহিন বাই,
কিয়া করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই।
বহুৎ জোরসে গাল টিপতা দোনো আঙ্গলি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজনা বাজাতা থেকে থেকে।
কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিমটি কাটতা,
কাঁচি লেকর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,
জজসাহেব কুছ বোল্‌তা নেহি রক্ষা করবে কেটা
কহাঁ গয়োরে কহাঁ গয়োরে জজসাহেবকি বেটা।”
—ইত্যাদি

এই রচনাটির মধ্যে কাব্যের মূল্যের চেয়েও আছে গভীর অকৃত্রিম স্নেহের প্রকাশ আর আছে যুবক পিতৃব্যের সহিত এই দুইটি বালক-বালিকার কি মধুর সম্বন্ধ ছিল তাহার পরিচয়। কি অনাবিল আনন্দে ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় ইহাদের শৈশব ও কৈশোর কাটিয়াছিল তাহারই বর্ণনা পাই কবির “জীবন-স্মৃতি”তে। কবি যখন প্রথমবার বিলাত যান তখন সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরাদেবী ছোট। ইহাদের সঙ্গে কবি ব্রাইটনে ছুটি কাটাইতে গিয়াছিলেন। সেই সময়কার কথা “জীবন-স্মৃতি”তে তিনি লিখিয়াছেন, “বউঠাকুরাণীর যত্নে ও ছেলেদের বিচিত্র উৎপাত-উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিতে লাগিল * * * এই দুটি ছোটো ছেলের মন ভোলাইবার, তাহাদিগকে হাসাইবার, আমোদ দিবার নানা উপায় আমি প্রতিদিন উদ্ভাবন করিতাম। * * * শিশুদের কাছে হৃদয়দান করিবার অবকাশ সেই আমার জীবনে প্রথম ঘটিয়াছিল—দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছিল।”

আবার দেখি কবি নিজের ছেলেমেয়েদের পড়িবার মত নানা কবিতা, প্রবন্ধাবলী রচনা করিতেছেন তাঁহার শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে। “নদী” কবিতাটির তুলনা কি কোন সাহিত্যে মেলে? এ যেন জাপানী চিত্রকর তাইকানের আঁকা নদীটি পর্বত হইতে নামিয়া মহা বিচিত্রের মধ্য দিয়া

মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর বাদ দিয়া শব্দ চয়ন করিয়াছেন কবি কিন্তু কোথাও ছন্দের গতি-লালিত্যে বা রূপসৃষ্টিতে বাধা পড়ে নাই। তাঁহার সাত আট বৎসরের কন্যা মাধুরীলতা ও পুত্র রথীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনের কি আনন্দময় সূচনা! যে রচনাশৈলী শিশুমনকে আকৃষ্ট করিবে, তৃপ্ত করিবে, মনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে তাহারই পরীক্ষা সুরু হইয়াছিল পদ্মার তীরে, নির্জন নিভৃতে, আপনার গৃহ-পরিবেশেই।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবি কিছুদিনের জন্য নিজের সন্তানদের খুবই নিকটে পাইয়াছিলেন এবং আশ্রমের বালকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার ফলে এই সময় হইতে শিশুমনের উপর তাঁহার গভীর অধিকার জন্মিল। অতি সহজ ও সত্যভাবে শিশুর সহজ রূপটি তাঁহার চক্ষে ধরা পড়িল এবং পরম করুণায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। যাহাতে শিশুরা তাহাদের জীবনের সকল অসম্পূর্ণতা পূর্ণতার মহিমায় ভরিয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য কবি স্বেচ্ছায় তাহাদের শিক্ষাব দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এইভাবে যে কাজ তিনি খেলাচ্ছলে সুরু করিয়াছিলেন তাঁহার কিশোর বয়সে, তাহাই তিনি সম্পূর্ণ করিতে বসিলেন সমস্ত আন্তরিক সাধনার সহিত তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে।

শিশুদের শিক্ষাব জন্য তিনি কি পরিমাণ তাঁহার শক্তি নিয়োগ ও ব্যয় করিয়াছিলেন, কি নিষ্ঠার সহিত শিশু-দেবতার পূজায় মগ্ন হইয়াছিলেন তাহাব হিসাব কে রাখিয়াছে? মানবজীবনের ইমারত তৈয়ারি করিতে হইলে বুনিয়াদের গাঁথুনি দৃঢ় না করিলে পরেব কাজগুলি যে ব্যর্থ হইবে এই কথা তাঁহার মত আর কে বুঝিয়াছিলেন? পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "ববীন্দ্রনাথ শিশুদের কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার গ্রন্থ পড়িতে বলি। "শিশু" হইতে আরম্ভ করিয়া "শিশু ভোলানাথ" পর্যন্ত তাঁহার এই একই তপস্যা চলিয়াছে। এ তপস্যার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার বহু মুদ্রিত লেখায়; কিন্তু তাঁহার আর একটি মহত্তর বালগোপালের পূজা হইল তাঁহার শান্তিনিকেতন আশ্রম। ইমারত তৈয়ারি করিতে যে বুনিয়াদের গাঁথুনি দৃঢ় করিতে হয় একথা সকলে জানে। মনুষ্যজীবনের ভিত্তি হইল শিশু, কিন্তু আমরা এই ভিত্তি না গড়িয়াই মানুষ গড়িতে চাই। তাই রবীন্দ্রনাথ একেবারে গোড়ায় মনোনিবেশ করিলেন। অর্থ নাই, অভিজ্ঞতা নাই, একমাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা লইয়া নিষ্ঠার সহিত শিশু

ভোলানাথদের সেবার কাজে নামিলেন। ইহা তাঁহার কর্ম নহে, ইহা ছিল তাঁহার ব্রত।"

তাহার পর ক্ষিতিমোহনবাবু আরও বলিয়াছেন, "কর্মের ভিত্তিভূমি হইল শরীর ও মন, আর ব্রতের ভিত্তিভূমি হইল আধ্যাত্মিক। শিক্ষাকর্মী পৃথিবীতে বহু আছেন কিন্তু শিক্ষাব্রতী মেলে কচিৎ দু'একজন। পৃথিবীতে শুক্তির অভাব নাই কিন্তু মুক্তা মেলে কয়টি? শিক্ষাকর্মী শিশুদের যে সেবা করেন তাহার মধ্যে কোন পূজার ভাব নাই। কিন্তু শিক্ষাব্রতীরা শিশুদের ভগবানের বিগ্রহ মনে করেন। বালগোপালের ধারণা হৃদয়ে ভালো করিয়া প্রতিষ্ঠিত না হইলে শিক্ষাব্রতী হইবার সম্ভাবনা নাই।"

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি যখন পড়ি তাঁহার লেখায়, "নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং সমস্ত নীলাম্বরের দিকে মাথা তুলিতেছে। প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরেব দ্বাবদেশে আসিয়া বহিঃসংসাবেব সহিত তাহাব নূতন পরিচয় হইতেছে। নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চাবিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে।" কি অপরূপ, কি যথার্থ বর্ণনা! ছন্দেও কবি সেই একই কথা বলিতেছেন, ইহাবা—

"নবীন নয়ন তুলি'
কৌতুকেতে দুলি' দুলি'
চেয়ে চেয়ে দেখে চাবিধাবে
সোনাব ববিব আলো
কত তাব লাগে ভালো
ভালো লাগে মায়ের বদন।"

সমস্ত পথ ভুলিয়া ইহরা আমাদের কাছে আসিয়াছে পরম বিশ্বাসে, একান্ত নির্ভরতায়। সংসাবেব কঠিন কাজে তাহাবা অগ্রসব হইবে আমাদেব হাত ধরিয়া—জীবনের পথে আমবা তাহাদেব যাত্রা করাইব—কত বড, কত গুরুদায়িত্ব আমাদের। তাই কবিগুরু পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগকে তাঁহাদের জপমন্ত্র দিতেছেন,

"এত শত লোক আছে—এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।

যেথা তুমি লয়ে যাবে কথাটি না কয়ে যাবে
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি দেখো দেখো এ বিশ্বাস রেখো রেখো
পাথারে দিয়ো না বিসর্জন।"

ইহাই হইল শিক্ষাব্রতীর জীবনবেদ।

এই সুকুমার বালক-বালিকাদের জন্য পাঠ্য-পুস্তক লিখিতে বসিলে অনেক কথাই ভাবিতে হয়। পাঠ্য-পুস্তকের দ্বারা আমরা ইহাদের কি শিক্ষা দিতে চাই? এই শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য কি? তাহাদের মানসিক ক্ষমতাই বা কি? মানব-প্রকৃতিতে যে সকল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ বর্তমান, যে সকলের দ্বারা মানুষের জীবন ভাঙ্গে ও গড়ে, শিশুদের মধ্যে সে সকলের প্রকাশ অতি প্রবল এবং তেজ অতি প্রখর। পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্যে সেগুলি কি ভাবে উৎকর্ষ ও চরিতার্থের পথে লইয়া যাওয়া যায় সে কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। "শিশু" কবিতাগুচ্ছে এবং কবির এই জাতীয় সাহিত্যে শিশুর এই সকল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের যে অভিব্যক্তি ও চরিতার্থতা দেখি তাহাতে বুঝিতে পারি কবি কত বড় মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন। যুযুৎসা, ঘৃণা, প্রেম, সমবেদনা, রাগ, ভয়, উপভোগ করিবার ইচ্ছা, স্বজনীস্পৃহা, আর্তপ্রবৃত্তি, কৌতূহল প্রভৃতি কোনটিই দেখি বাদ পড়ে নাই।

মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলি পরিবেশনে অন্যেরা যেখানে নানা জটিল কথার অবতারণা করিয়াছেন সেখানে কবি কত সহজ ভাষায় সেই কথাগুলিই বলিয়া গিয়াছেন আমাদের। শিশু-মনের এমন নির্ভুল চিত্র অঙ্কন করা, শিশু-মনস্তত্ত্বের জটিল তথ্যগুলি এমন অপূর্ব সরস ভাষায় পরিবেশন করা কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে কেননা একাধারে তিনি কবি ও মনস্তাত্ত্বিক। এই অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। নিজে "শিশু" হইয়া শিশুর ঠিক মনের মাঝখানটি দখল করিয়া বসিতে না পারিলে কি এমন করিয়া শিশুমনকে বুঝিতে পারা ও সাধারণের নিকটে তুলিয়া ধরা সম্ভব? কবি বলিয়াছেন,

"খোকার মনের
ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে
তবে আমি একবার

জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি' সে নিভৃতে।"

শিশুর সহজ রূপটি যাহাতে কবির চোখে সহজেই ধরা পড়ে তাহার জন্ম তিনি ডুব দিলেন তাঁহার বাল্যজীবনের স্মৃতিসাগরে। ইহা ভিন্ন তো আর কোন সত্য উপায় তাঁহার হাতে ছিল না, তাই দেখি কবির শিশুসাহিত্যে তাঁহার নিজের বাল্যজীবন বারবার উঁকি দিতেছে। বাল্য ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি একত্র হইয়া কবির দৃষ্টিতে শিশুর সমস্যা-নিপীড়িত, সংশয়াকুল, আনন্দব্যাকুল মনটি এমনভাবে ধরা দিল যে কবি তাঁহার কাব্যে শিশুমানসের সকল দিক প্রকাশ করিয়া আমাদের কাজ সহজ করিয়া দিলেন।

শিশুমনস্তত্ত্বের যে প্রকাশ-ব্যঞ্জনা তাঁহার কাব্যে অপরূপ রূপ ধরিয়াছে তাহারই উদাহরণস্বরূপে ধরা যাক "বীরপুরুষ" কবিতাটি। কবিতাটির মধ্যে বাৎসল্যরসের সহিত যুযুৎসা ও রক্ষা করিবার প্রবৃত্তির কি অপূর্ব সমাবেশ! মাকে লইয়া শিশু বিদেশ যাত্রা করিয়াছে। সেই রূপকথার বিদেশ! সেখানে তাহার একান্ত আপনার মা সংসারের আর পাঁচটা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে না। আকাশের মত অবকাশ সেখানে—সেইখানে থাকিবে কেবল সে আর তাহার মা। আর কোন অংশীদার নাই—মায়ের ক্লান্ত শ্রান্ত মুখে আসিবে প্রশান্ত স্নিগ্ধ হাসি কেবল তাহাকেই ঘিরিয়া। কিন্তু পথেও যে এক মহা বিপদ। "হা রে রে রে" করিয়া ডাকাতের দল ঝড়ের মত দৌড়াইয়া আসিতেছে তাহার রাজকন্যা-মাতাকে আঘাত করিতে। ভয়ে ব্যাকুল, আশঙ্কায় আকুল জননীকে আশ্বাস দিয়া মধুর কণ্ঠে বীরশিশু বলিতেছে, "আমি আছি, ভয় কেন মা করো!" তাহার পর বাতাসে অসি নাচাইয়া দৃঢ় কণ্ঠে, দৃপ্ত সুরে বীর বালক ডাক দিতেছে,

"দাঁড়া খবরদার
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার
টুকরো করে দেবো তোদের সেরে।"

এই কথা কি কেবল ডাকাতদেরই বলে শিশু? যখনই সে দেখে তাহার মাতা সংসারের দায়ভারে ক্লিষ্ট, তখনই কি তাহার মন বলিয়া উঠে না, "আমি আছি ভয় কেন মা করো?"

মাতার দুঃখে শিশুর সমবেদনা যেমনই অকৃত্রিম, তাহার পোষা কুকুরটির প্রতিও তাহার ভালবাসা তেমনই সত্য, তেমনই গভীর। কুকুরটি পাতে মুখ দিয়াছে বলিয়া মাতা তাহাকে "দূর দূর" করিয়াছেন,—খোকা তাই মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,

"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুরছানা
তবে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি করে বল্
আমায় করিস নে মা ছল—
বলতে আমায় দূর দূর দূর !
কোথা হতে এল এই কুকুর ?"—

কুকুরকে যে অত্যাচার ও নির্দয়তা হইতে রক্ষা করিতে চায় শিশু—ঠিক সেইরূপ নির্দয়তা হইতে সে আড়াল করিয়া রাখিতে চায় তাহার জননীকে। প্রবাসী পিতা ঠিক সময়ে পত্র দেন নাই—পিতার কুশল-সংবাদের জন্য মাতার যে আকুলতা, যে বেদনা-সংশয়পূর্ণ মুখচ্ছবি তাহা শিশুকে নিতান্ত পীড়িত করিয়া তুলিতেছে। বাবা চিঠি দেন নাই—তাহাতে কি হইয়াছে ? সে নিজেই বাবার চিঠি লিখিয়া দিবে। পিতার এই অসাবধানতা মাতাকে যে দুঃখ দিতেছে তাহা হইতে সমব্যথী শিশু তাঁহাকে রক্ষা করিতে চায়—তাই সে বলিতেছে—

"অমন করে আছিস কেন মাগো
খোকারে তোর কোলে নিবি নাগো ?
*　　*　　*
বেলা অমনি গেল বয়ে
কেন বুঝি পাস নি বাবার চিঠি ?
*　　*　　*
মাগো মা, তুই আমার কথা শোন্
ভাবিস নে মা অমন সারাক্ষণ
কালকে যখন হাটের বারে

বাজার করতে যাবে পারে
কাগজ কলম আনতে বলিস ঝিকে
দেখো ভুল করবো না কোনো
ক, খ থেকে মূর্ধন্য ণ
বাবার চিঠি আমিই দেবো লিখে।"

মায়ের কোলে চড়িয়া বাবার চিঠিটি নিজেই লিখিয়া দিয়া, নিজের দুই কোমল বাহুতে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার সকল দুঃখ সে নিঃশেষে মুছিয়া দিতে চায়। দুর্বলকে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি যেমন সকল মানুষের মধ্যেই আছে শিশুর মধ্যেও তাহা সর্বদাই কাজ করিতেছে, মনস্তাত্ত্বিক কবি অনুপম ছন্দের মাধ্যমে এই কথাই আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

আবার দেখি শিশুকে তাহার দৈহিক ও মানসিক অসম্পূর্ণতার দোহাই দিয়া তাহাকে আমরা কত অনর্থক বাধা নিষেধের গণ্ডিতে বাঁধিয়া ফেলি। এ সকলের বিরুদ্ধে তাহার কত প্রতিবাদ এবং সেই সঙ্গে কত তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

"রথের দিনে খুব যদি ভীড় হয়
একলা যাব করবো না তো ভয়
মামা যদি বলেন ছুটে এসে,
"হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো"—
বলবো আমি, "দেখছ নাকি মামা,
হয়েছি যে বাবার মত বড়ো।"
দেখে দেখে মামা বলবে, "তাই তো,
খোকা আমার সে-খোকা আর নাই তো।"

সে যে নিজে বড় হইয়াছে কিন্তু ছোট বোনটি যে এখনও বড় হয় নাই এ যেন পরম কৌতুকের কথা। বিশ্ব সংসারে এমন মজার ব্যাপার আর কি হইতে পারে? খুকীর প্রতি তাহার অপার করুণা, তাই সে মাতাকে ডাকিয়া বলে—

"খুকী তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা
খুকী তোমার ভারী ছেলেমানুষ
ও ভেবেছে তারা উঠেছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুস।"

শিশুর সৃজনী-প্রবৃত্তি বড় সজাগ, কল্পনা করিবার ক্ষমতা বড় প্রবল। তাহার

মনে এক মোহন স্বপ্ন নিরন্তর জাল বুনিয়া চলে। সুদূর এক মায়ারাজ্যে ভ্রমণ করিবার জন্য তাহার প্রাণে জাগে এক আকুলতা, তাই সে কল্পনার সহিত আপনার সৃজনীস্পৃহা মিশাইয়া কি করিতেছে দেখা যাক,

"ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ নৌকাখানি
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম
লিখি আমাদের বাড়ী কোন গ্রাম
বড়ো বড়ো করে মোটা অক্ষরে
যতনে লাইন টানি।
যদি সে নৌকা আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি'
কার কাছ হতে ভেসে এলো স্রোতে
কাগজ নৌকাখানি।"

কল্পনার বাতাসে কেবল কাগজের নৌকাখানি তর্‌তর্ করিয়া ভাসিয়া যায় না—সে নিজেও ভাসিয়া চলে কল্পনার এক অরূপ রাজ্যে—

"ভোরের বেলা দেব নৌকা ছেড়ে
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে।
দুপুরবেলা তুমি পুকুরঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপূর্নির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে—
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।"

কল্পনায় এই উপভোগ-প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে কিভাবে কাজ করে, কিভাবে তাহাকে তৃপ্ত করে তাহারও বহু উদাহরণ আছে কবির এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে, তাহা পাঠকমাত্রেই জানেন।

শিশু ভয় পাইলে জননীর বক্ষে আসিয়া আশ্রয় লয়, তাঁহারই নিকটে তাহার পরম আশ্বাস, নিশ্চিত নির্ভর। এই চিত্রটি কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির বর্ষার কবিতায়,

"ঐ দেখো মা বর্ষা এলো
ঘনঘটায় ঘিরে
বিজুলি ধায় এঁকেবেঁকে
আকাশ চিরে চিরে
দেবতা যখন ডেকে ওঠে
থরথরিয়ে কেঁপে
ভয় করতেই ভালোবাসি
তোমায় বুকে চেপে।"

এই সঙ্গে আমাদের মন চলিয়া যায় "জীবনস্মৃতি"র সেই "পুলিসম্যানের" গল্পে। ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ একদিন বিকালবেলায় "পুলিসম্যান, পুলিসম্যান" বলিয়া ডাকিয়া বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুল রবীন্দ্রনাথকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। মাতুলের বয়স তখন ভয় করিবারই বয়স, বোধহয় বছর সাতেকের বেশি হইবে না। তিনি ভয় পাইয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া মাতার নিকটে আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে কবির সমস্ত শিশুসাহিত্যে শিশুর মনের কথাটি—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা হৃদয়ের ভাষাটি প্রকাশ পাইয়াছে অনুপম ছন্দে কিন্তু অতি সুস্পষ্ট ভাষায়। এই উপলব্ধির জন্য চাই বিজ্ঞানীর স্বচ্ছ দৃষ্টি, চাই নিষ্ঠা, চাই শিশুর সহিত আত্মিক যোগসাধনের জন্য সহজ ও সতেজ মন। কবির সেই সহজ ও সতেজ মন ছিল বলিয়াই শিশুর জীবন-বাঁশিতে বিশ্ব-বিধাতা প্রত্যহ যে সুরটি ভরিয়া দেন, কবি সেই সুরটিই বাজাইয়াছেন নিজের জীবনে—নিজের জ্ঞান, মান, অভিমান ভুলিয়া। তাই তিনি তাঁহার জীবন-বাঁশিতে চিরশিশুর লীলার সুরটি তুলিয়া গাহিয়াছিলেন,

"বাজাও আমারে বাজাও
বাজালে যে সুরে প্রভাত রাগেরে
সেই সুরে মোরে বাজাও
যে-সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে

জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে
সেই সুরে মোরে বাজাও।”

শিশুর সহিত এই আত্মিক যোগের ফলেই কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল একটি পরম সত্য। সেই পরম সত্যটি হইল যে সকল শিক্ষার সার শিক্ষা শিশু পায় মাতৃক্রোড়ে। জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া শিশু প্রথম হাসিতে শেখে। তাহার শিক্ষা, চরিত্রগঠন, দেহের সৌষ্ঠব সকলই আরম্ভ হয় মাতৃবক্ষে। মাতার অন্তর হইতে যে আশীর্বাদের ধারা বহিতে থাকে তাহাতেই অভিষিক্ত হইয়া শিশুর জীবন সরস ও পরিণত হইয়া উঠে। জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে তাঁহার বাণী শুনিতে। তাই কবি বলিতেছেন,

“মায়ের মুখে মা'য়ের কথা
শিখিতে তাহার কি আকুলতা—
তাকায় তাই বোবার মতো
মায়ের মুখ চাঁদে।”

শিশুর শিক্ষায় জননী কিম্বা মাতৃসমা শিক্ষিকার দায়িত্ব যে কত গুরু সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাতৃজাতিকে সতর্ক করিতে দ্বিধা করেন নাই। জননীর মুখে সহজ সুরে সহজ ছড়া শুনিয়া শিশুর প্রথম ভাষা-শিক্ষা সুরু হয়। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে স্তিমিত দীপালোকে মায়ের দিদিমায়ের স্নিগ্ধ কোলের মধ্যে নিটোল সুরের ছড়ার গানগুলি শিশুর কাছে কি অপূর্ব! সেই গভীর স্নেহালিঙ্গনে শিশুর কি পরম নিরাপত্তাবোধ—দেহের খাদ্যের ন্যায় মনেরও যে এই পুষ্টির প্রয়োজন আছে একথা আজ বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

জননীর নিকটে শিশু কখনও চাঁদ, কখনও পাখী, কখনও বা ফুল—এই সকল অসঙ্গতির মধ্যে আছে কত মমতা, কত করুণা। শৈশবে শিশু প্রিয়জনের যে ঘনিষ্ঠতা চায়, যে নিরাপদ আশ্রয় চায় তাহার সবটুকুই রহিয়াছে তাহার জননীর দুটি কোমল বাহুর মধ্যে আর ওই স্নেহঘন কণ্ঠস্বরে। তাই কবিগুরু স্নেহমুগ্ধ মাতৃকণ্ঠের এই নিতান্ত অখ্যাত গানগুলিকে তুচ্ছ করিতে পারেন নাই। এই গান বা ছড়াগুলি শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন শিশুর সাহিত্য-সাধনার প্রথম সোপান স্বরূপে।

রবীন্দ্রনাথ কেন এই সামান্য ছড়াগুলিকে এমন স্নেহমিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে “জীবন-স্মৃতি”র সেই একটি পঙ্‌ক্তির

মধ্যে ফিরিয়া যাইতে বলি। "কেবল মনে পড়ে—'জল পড়ে পাতা নড়ে।' সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" এই যে ভাষার মধ্যে ভাষাতীত সৌন্দর্য কবির মনকে দোলা দিয়াছিল যাহা কেবল ভাষারূপে নহে কিন্তু চিত্র ও সঙ্গীতরূপেও তাঁহার কানে ধরা দিয়াছিল তাহাই আছে এই ছড়াগুলির মধ্যে। সেই জন্যই কবি মনে করিয়াছেন যে এগুলি শিশুর ভাষাশিক্ষার পক্ষে অতি উপযুক্ত উপাদান।

প্রৌঢ় বয়সে ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহকালে তাহাদের মধ্যে যে রসাস্বাদ করিয়াছিলেন কবি, তাহা তিনি তাঁহার ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারেন নাই বলিয়াই ভাষা-শিক্ষার পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা তাঁহার নিকটে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই ছড়াগুলির মধ্যে তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন শিশুর সুমিষ্ট কলধ্বনির ঝঙ্কার আর শুনিয়াছিলেন শিশুর লীলাচপলতার সহিত জননীর সুধামধুর কণ্ঠস্বর। এই দুইয়ে মিলিয়া যে অপরূপ চিত্র কবির চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে তিনি শিশু-শিক্ষার অকৃত্রিম উপাদান দেখিয়াছিলেন বলিয়াই শিশুর শিক্ষায় এগুলিকে একটি বড় স্থান দিয়াছেন। এই ছড়াগুলির মধ্যে যে ভাষার অক্ষমতা—তাহা একদিকে যেমন শিশুরই মত অক্ষম ও অসঙ্গত অন্যদিকে তাহা তেমনই নিখাদ স্বর্ণের ন্যায় কোমল অথচ উজ্জল। মানুষের অন্তরের বাৎসল্যরসের নিদর্শন এই ছড়াগুলির মধ্যে যে খাঁটি স্নেহরসটুকু তাহাই শিশু-শিক্ষার বুনিয়াদ ও ভাষা-শিক্ষার পথে শ্রেষ্ঠ সহায়।

কত সময় মনে ভাবি যে ছড়ার মধ্যে এমন কি আকর্ষণ আছে যাহা শিশুকে এমন করিয়া মুগ্ধ করে? কেন এত কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা ও নীতিপ্রচার, মানুষের প্রাণপণ প্রযত্ন প্রতিদিন ব্যর্থ ও বিস্মৃত হইতেছে কিন্তু এই সকল অসঙ্গত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোক-গুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে? কবিগুরু ইহার পক্ষে বলিতেছেন যে, কথার দ্বারা যাহা আমরা শিশুকে বুঝাইতে

পারি না তাহা ছবির দ্বারা বুঝাই। ছড়ার মধ্যে সেই ছবি আছে। ইহা ভিন্ন আরও একটি জিনিস আছে তাহা হইল সঙ্গীত। অর্থ-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে-কথাটা যৎসামান্য বলিয়া মনে হয় সেই কথাটাই ছড়ার সুরে অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। চিত্র ইহাদের প্রধান উপকরণ, সঙ্গীত ইহাদের প্রাণ, তাই শিশুদের নিকটে ইহাদের আকর্ষণ চিরন্তন।

যেমন, "আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদিপাড়া দিয়ে
বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জালমুড়ি দিয়ে।"

কিম্বা "খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা বেঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে,
খোকা বলে পাখিটি কোন বিলে চরে
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।"

কিম্বা "খোকা এলো বেড়িয়ে
দুধ দাও গো জুড়িয়ে,
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হলেন ক্ষিপ্ত।

এই ছড়াগুলিতে যে ভাব আছে তাহা অতি সাধারণ ও প্রাতদিনের কথা সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে যে চিত্র আছে তাহাতেই ইহারা অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, "চিত্র ভাবকে আকার দিয়াছে এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দিয়াছে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।" এই চিত্রময়ী ও বেগবতী ছড়াগুলি শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ শিশুর প্রথম পাঠের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন—কেননা বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ, জগৎসংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি একটার পর একটা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে। তাই যে কোন মনের বন্ধন শিশুর পক্ষে পীড়াজনক। বয়স্কের মত সুসংলগ্ন কার্যকারণ-সূত্র ধরিয়া কোন জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া চলা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। কাজেই যে ভাষার মধ্যে চিত্র আছে, যে ভাষায় গতি আছে সেই ভাষাই শিশু সহজে শিখিয়া মনে রাখিতে পরে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে কবি তাঁহার শিক্ষকতাকালে নিজের বাল্য ও কৈশোরের বহু অভিজ্ঞতা—যে কথা তাঁহার "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে পাওয়া যায়—তাহা কাজে লাগাইয়াছিলেন। কিন্তু সমালোচকেরা বলিয়াছিলেন "জীবনস্মৃতি"

কবির একটি উৎকৃষ্ট রচনামাত্র এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি অতীতকে প্রৌঢ় জীবনের ভাবনায় রঞ্জিত করিয়া একটি সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। একথা যেমনি সত্য তেমনি সত্য যে শৈশবে পৃথিবীটা বালকের নিকটে কিভাবে ধরা দেয় তাহা কবি এই সময়ে ভাবিতে বসিয়াছিলেন। বিগত-যৌবন মাতাপিতা ও শিক্ষকগণের একথা মনে থাকে না বলিয়াই শিশুর কোমল মনটিকে তাঁহারা পাঠ্যের বিষয়ভারে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন। কবি তাঁহার শৈশব ও কিশোর বয়সের সহস্র দিক নিজের মনের কাছে তুলিয়া ধরিলেন এবং সেই স্মৃতিকথা নানাভাবে তাঁহার রচনায়, বিশেষ করিয়া তাঁহার শিশু-সাহিত্যে ও শিক্ষা-প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশ করিলেন। তাই মনে হয় "জীবন-স্মৃতি" রচনাকালে কবি কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করিবেন বলিয়া লেখনী ধরেন নাই। তাঁহার মনে আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল যাহা সমালোচকের দৃষ্টিতে বা সাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে নাই।

এই "জীবনস্মৃতি" রচনা সম্বন্ধে কবি নিজেই লিখিয়াছেন, "আমি আমার সৌন্দর্যোজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশঃ আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে। * * * অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহ প্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠেছে—নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে, অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতেই পেতুম না।"

"জীবন-স্মৃতি" রচনার ফলে তিনি নিজের মনের যে-সকল দিকে সহায়তা পাইয়াছেন তাহার মধ্যে শিশু-সাহিত্য রচনার দিকটি অন্যতম। নিজের কৈশোরকে পুনরাবিষ্কার করিয়া জীবন ও সৃষ্টির গূঢ় মর্ম ও অনন্ত বিস্ময়কে যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তিনি। তাই দেখি শিশুর জন্য রচিত তাঁহার যে সাহিত্য—তাহাতে আছে শিশুর ভাষা, শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী ও শিশুমনের তন্ময়তা। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে এই সাহিত্য শিশুর মত মধুর হইলেও তাহা শিশুর ন্যায় দুর্বল বা অপরিণত নহে; তাই তাঁহার শিশু-সাহিত্যের আবেদন এমন স্থান ও কালের অতীত, এমন সার্বজনীন।

শিশুর ভয়-বিস্ময়, সুখ-দুঃখজড়িত হৃদয়টি কিভাবে ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠে তাহা কি সহজেই না তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন! নিজের বাল্যস্মৃতি হইতে এই অরূপরতন না মিলিলে ইহা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত? ইহারই

সাহায্যে শিশুর রহস্যময় রূপটি তাঁহার কাছে একান্ত কাছের জিনিস বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল, আর মনে হইয়াছিল সমস্ত জগৎ-সংসারটাই একটি বিরাট শিশুর মেলা, অহরহ এখানে খেলিয়া চলিয়াছেন এক বিরাট শিশু তাঁহার সহস্র রকমের ছেলেমানুষির খেলা। তাই কবি লিখিলেন,

"ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা
তাই তো এমন বুড়ো হয়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল
জমাই এটা ওটা
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।

* * * *

শিশু হবার ভরসা আমার
জাগুক আমার প্রাণে
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে
ভবিষ্যতের মুখোসখানা
খসাব এক টানে
দেখব তারে বর্তমানের কালে।"

নিজের বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতি মন্থন করিয়া যে সম্পদের সন্ধান পাইয়াছিলেন কবি তাহা তিনি কত শত ভাবে শিশুর পাঠ্য-পুস্তক রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি লিখিতেছেন, "ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই ; এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'কি আছে বলো দেখি?' কোনটা যে থাকা অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।"

শিশুর মনের প্রথম বিস্ময়, প্রথম কৌতূহল প্রকাশ পায় তাহার মাকে ঘিরিয়াই। "মা, আমি কোথা হইতে আসিলাম? কোনখানে তুই আমাকে কুড়াইয়া পাইলি?" সেই একই বিস্ময়ভরা প্রশ্ন আবার শুনি তাহার মুখে—

"কাল ছিল ডাল খালি
আজ ফুলে যায় ভরে,
বল দেখি তুই মালী
হয় সে কেমন করে?"

শিশুর জীবনের "বিস্ময়-পর্যায়" যাহাকে মনোবিজ্ঞানিগণ "Wonder stage" বলেন, তাহারও কত প্রকারের অভিব্যক্তি দেখি কবির লেখায়—আকাশের মেঘ দেখিয়া, কখন বৃষ্টি কখনও বা রৌদ্রের খেলা দেখিয়া শিশু জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা?"

কিম্বা

"উপরে নীচে আকাশ ভ'রে
এমন বদল কেমন করে
হয় সে কথাই ভাবি।
উলট পালট খেলাটি এই
সাজের তো তার সীমানা নেই
কার কাছে তার চাবি?"

শিশু মনে করে প্রতিদিন প্রত্যূষে পৃথিবী তাহাকে নূতন কিছু দিতে চায় বলিয়াই প্রস্তুত হইয়া আসে। এই রহস্যেভরা পৃথিবীর ভিতরে বাহিরে কি আছে তাহা জানিবার জন্য বালকদের মনে কত আগ্রহ। পৃথিবীকে শিশু আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"প্রত্যূষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা—
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টানি আনি'
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি করো যে মুগ্ধ মনে।"

পৃথিবীর রহস্য জানিতে শিশুমনে যে কৌতুহল থাকে তাহার কথা মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সে যখন তিনি "জীবন-স্মৃতি"তে লিখিলেন যে মাঘোৎসব

উপলক্ষ্যে তাঁহাদের বাড়ির প্রাঙ্গণের চারিধারে মাটি কাটিয়া কাঠের থাম পোঁতা হইত। ইহাতে ঝাড়লণ্ঠন টাঙানো হইত। বালক কবি ভাবিতেন যদি একটার পর একটা বাঁশ ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁতা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর গভীরতম তলাটাকে হয়তো একরকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইলেও যাইতে পারে। আর যেখানে আকাশের নীলিমা সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘিরিয়া আছে তাহারও পশ্চাতে আকাশের কি রহস্য লুকাইয়া আছে তাহা জানিবার জন্ত তাঁহার মন ক্রমাগত ব্যস্ত হইয়া উঠিত। যেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষ্যে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আকাশের ওই নীল গোলকটি কোনো-একটা বাধামাত্রই নহে, তখন সেকথা বালক রবীন্দ্রনাথের কি অসম্ভব আশ্চর্যই না মনে হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন, "সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া যত উপরেই উঠিয়া যাও না কোথাও মাথা ঠেকিবে না।" এই কথা শুনিয়া কবি বলিতেছেন, "আমি ভাবিলাম সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি—শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনই লাভ নাই তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।" শিশুর এই যে অসম্ভবের উপর প্রবল বিশ্বাস, ইহারই অভিব্যক্তি দেখি কবির "সংশয়ী" কবিতাতে—

"ভাবনা আমার দেখে বাবা
বললে সে দিন হেসে,
"সে জায়গাটি মেঘের পারে
সন্ধ্যা তারার দেশে।"
তুমি বল, "সে দেশখানি
মাটির নীচে আছে
যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে
ফুল ফোটে সব গাছে।"
মাসি বলে, "সে দেশ আমার
আছে সাগর তলে
সেখানেতে আঁধার ঘরে
লুকিয়ে মানিক জলে।"

আমি শুনে ভাবি আছে
সকল জায়গাতেই
সিধু মাষ্টার বলে শুধু,
"কোনোখানেই নেই।"

শিশু ভোলানাথ

সিধু মাষ্টারেব ন্যায় প্রবীণ প্রাগৈতিহাসিক জীবগণের সম্বন্ধে কবি গল্পগুচ্ছের "অসম্ভব কথায়" লিখিতেছেন, "শিশুরও প্রবল বিশ্বাস। * * * কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু, এ সৌন্দর্য রসাস্বাদনের জন্যও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে যে পরাঙ্মুখ হয় তাহার কাছে কোনো কিছুর আর "তাবপবে" নাই। সমস্ত হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে।"

এই কথাই স্মবণ কবিয়া ববীন্দ্রনাথ ছড়ার ছবিতে "আতাব বিচি" নামে এক কবিতা রচনা কবেন। তাঁহার "জীবন-স্মৃতি"তে এই আতার বীজ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "বেশ মনে পড়ে দক্ষিণেব বাবান্দায় এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া বোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে একথা মনে করিয়া ভাবি বিস্ময় ও ঔৎসুক্য জন্মিত।" বডরা যে এই সকল কল্পনাসঞ্চিত আনন্দে বঞ্চিত তাহা অনুভব কবিয়া তিনি আবও লিখিতেছেন, "আতাব বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহিব হয কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আব বিস্ময় অঙ্কুবিত হইয়া উঠে না। সেটা আতাব বীজেব দোষ নহে, সেটা মনেবই দোষ।" এইভাবে শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলিতেছেন যে শিশুব মত মন লইয়াই শিশুব নিকটে যাইতে হয়। তাহাকে শিক্ষিত কবিতে হইলে তাহাব কৌতূহলী কল্পনাপ্রবণ মনেব খোরাক জুগাইতে হয়। একথা যিনি মনে রাখিতে পাবেন না, তিনি কোনমতেই শিশুব শিক্ষাব ভাব গ্রহণ করিতে পাবেন না।

শিশু অসম্ভবকে "সম্ভব" বলিয়া বিশ্বাস কবে কেননা সে যে আশুবিশ্বাসী। বালক-কবিব ভৃত্য শ্যাম কবিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া তাঁহার চাবিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিবে গেলেই বিষম বিপদ। কবি বলিতেছেন, "বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতাব কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা

রামায়ণে পড়িয়াছিলাম এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।" সিধু মাষ্টারের মত নীরস লোক হইলে কি কল্পনাপ্রবণ শিশুর শিক্ষক হওয়া যায়?

কল্পনায় বাল্যজীবনের অতৃপ্ত বাসনাগুলি উপভোগ করার বৃত্তান্ত কবির "জীবন-স্মৃতি"তে বহু স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি যখন ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন তাঁহার তেতালার ঘর বন্ধ থাকিত। এই নিষিদ্ধ-প্রবেশ ঘরে কবি যেন একটি রহস্যময় অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান পাইতেন তাই, খড়খড়ি খুলিয়া হাত গলাইয়া ছিট্‌কিনি টানিয়া দরজা খুলিতেন এবং পিতার আরামকেদারায় বসিয়া কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিতেন। বাড়িতে আরও একটি জায়গা ছিল যেখানে তাঁহার সমবয়স্কা ভাগিনেয়ী খেলা করিতেন। বালিকা কোনমতেই জায়গাটির ঠিক স্থান নির্ণয় করিয়া বলিতেন না, কেবল প্রহেলিকাময় ইঙ্গিতে বালক মাতুলকে লোভ দেখাইয়া বলিতেন, "আজ সেখানে গিয়াছিলাম।" কাজেই কবি বলিতেছেন, "সেই জায়গাটা যে গৃহের ঠিক কোনখানে, সেই আশ্চর্য রাজার বাড়ি—যেখানে খেলাও যেমন রমণীয়, খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ।" সেই স্থানটি তিনি কোন-দিনই জানিতে পারিলেন না। এই ছেলেবেলাকার স্মৃতিকথা মনে পড়াতে কবি "গল্পেসল্পে", "রাজার বাড়ি"তে লিখিয়াছেন,

"চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।"

আবার লিখিয়াছেন,

"রাজকন্যে ঘুমোয় কোথা শোন্ না কানে কানে
ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আছে যেইখানে॥"

বাড়ির বাহিরে যে একটি অনন্ত প্রসারিত জীবন ছিল তাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ রুদ্ধ দ্বার ও জানালার ফাঁকে ফাঁকে বালককবিকে ছুঁইয়া যাইত। শহরে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলির সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া, "চাই চুড়ি চাই, খেলোনা চাই হাঁকিয়া যাইত।" কবি বলিতেছেন, "আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।" যে কল্পনার দ্বারা বালক কবি বাহিরের

মুক্ত উদার জীবনের মধ্যে নিজেকে বিস্তার করিয়া দিতেন, তাহারই অভিব্যক্তি দেখি "বিচিত্র সাধ" কবিতাতে, যেখানে খোকার মুখে শুনি,

"ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ঐ ফুলবাগানের মালী

* * * *

ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই ফেরি নিয়ে।"

কিম্বা "আমাব যেতে ইচ্ছে কবে
নদীটিব ঐ পাবে
যেথায় ধারে ধাবে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙ্গি নৌকা
বাঁধা সাবে সাবে

* * * *

মা যদি হও বাজি
বড হলে আমি হব
খেয়াঘাটেব মাঝি।"

ছুটির দিনে দ্বিপ্রহব রৌদ্রে ছাদে দাঁড়াইয়া বালক রবীন্দ্রনাথ পাখিব খেলা দেখিতেন তাহাবই কথা স্মবণ কবিয়া তিনি শিশুদের জন্য লিখিলেন,

"ছুটিব দিনে কেমন সুরে
পূজোর সানাই বাজায় দূরে
তিনটি শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরেব চালে।
শীতের বেলায় দুই পহবে
দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগ্‌নি রঙের শাড়ি।"

সেই বাল্যকালের সুদূর দিনের কথা মনে করিয়া তিনি "জীবনস্মৃতি"তে আরও লিখিয়াছেন, "তরুচূড়ার সহিত মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের নানা আয়োজনের উচ্চ-নীচ ছাদের শ্রেণী। সেই সকল অতি দূর ছাদে এক-একটি চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত

তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনকার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সঙ্কেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে।" এই কলিকাতা শহরের রহস্যসঙ্কেত একদিন কবির শিশুসাহিত্যে স্থান পাইল শিশুর শিক্ষা ও আনন্দের জন্য,

"একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
"চেয়ে দেখো" "চেয়ে দেখো" বলে যেন বিনু
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে গড়া গণ্ডাব বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে দুদ্দাড় জানালা দরোজা।
রাস্তা চলেছে যেন অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপধাপ।
দোকান বাজার সব নামে আব উঠে
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে
হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেন্টের দোল, যেন খ্যাপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।" ইত্যাদি।

কত খেলার বস্তু যাহা আজকালকার ছেলেমেয়েরা সহজেই পায় বলিয়া হেলায় ফেলিয়া দেয় তাহা কবি বলিতেছেন তাঁহাদের বাল্যকালে দুর্লভ ছিল বলিয়া তাঁহারা সামান্য যাহা কিছু পাইতেন তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতেন, তাহার খোসা আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলিয়া দিতেন না।। কবিগুরু লিখিয়াছেন, "এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাদের অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়ে নষ্ট হয়।" সেই যে ছেলেবেলায় বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা জামায় পকেট জুড়িত না, সেই অবহেলার কথা "খাপছাড়া" কবিতাতে প্রকাশ করিয়া কবি বড়দের নজর খুলিয়া দিয়াছেন।

গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথর উঠাইয়া আনিয়া কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাদের পড়ার ঘরে একটি নকল পাহাড় তৈয়ারি

কাবয়াছিলেন। এই পাহাড়টার প্রতি তাঁহাদের কি বিস্ময় ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না কিন্তু বড়দের কাছে তাহা মোটেও আশ্চর্যের সামগ্রী বলিয়া বোধ হয় নাই দেখিয়া বালককবির আর আক্ষেপের সীমা নাই। যেদিন তাঁহাবা বড আগ্রহ করিয়া তাঁহাদেব স্বষ্টিকর্ম বড়দের দেখাইতে গেলেন সেইদিন বড দুঃখেব সহিত তাঁহারা শিখিলেন যে তাঁহাদের লীলার সহিত বডদেব ইচ্ছাব বহু প্রভেদ আছে। কেননা, সেইদিনই তাঁহাদের গৃহকোণের পাহাড তাহাব গাছপালা সমেত কোথায় যে অন্তর্ধান বরিয়া গেল তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। এই ঘটনায় তাঁহাব মনে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে পবে কবিব "পাখিব পালক" কবিতায়। শিশু যখন প্রস্তবখণ্ড, ফুল, শামুক, ঝিনুক, কাঁচখণ্ড, পাতা, পালক ইত্যাদি সংগ্রহ কবে তখন সেগুলি উপেক্ষা কবা উচিত নহে। শিশুর সংগ্রহ কবিবাব প্রবৃত্তি, চবিতার্থ কবিবাব যে স্পৃহা তাহা এইভাবেই তৃপ্ত হয় এবং সেই কথাই শুনি তাঁহাব নানা কবিতায় ও প্রবন্ধে। তাহাবই একটি নমুনা এই "পাখিব পালক" কবিতা।

"বলে হেসে হেসে "ওমা দেখ দেখ্
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।"
মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে
"কী বা জিনিসেব ছিবি,"
ভূমিতে ফেলিয়া গেল সে চলিয়া
আর না চাহিল ফিরি।
মেয়েটিব মুখে কথা না ফুটিল
মাটিতে রহিল বসি'
শূন্য হতে যেন পাখিব পালক
ভূতলে পডিল খসি।
খেলাধুলো তার হলো নাকো আব
হাসি মিলাইল মুখে
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার,

আপনি খেলিত আপনি তুলিত
দেখাত না কারে আর ॥"

"পুরানো বট" কবিতাটি পড়িলে সেই জোড়সাঁকোর বাড়ির পূর্ব-ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড চীনা বটগাছটির কথা কাহার না মনে পড়িবে? কবি সেই বটগাছটির কথা স্মরণ করিয়া উত্তরকালে লিখিয়াছিলেন,

"নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট?"

সেই বটগাছটির গুঁড়ির চারিদিকে ঝুরি নামিয়া একটি অন্ধকার রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই স্মরণ করিয়া কবি "জীবন-স্মৃতি"তে বলিতেছেন, "সেই কুহকের মধ্যে যেন স্বপ্নযুগের একটি অসম্ভব রাজত্ব বিরাজ করিতেছে।" জানালার নীচের পুকুরটিতে রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলি সারাবেলা ডুব দিয়া গুগ্‌লি তুলিয়া খাইত এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিত। এই চিত্রটি প্রতিফলিত হইয়াছে কবির "নাম তার মোতিবিল" কবিতায়।

বালকবালিকাদের শাসন করিতে হইলে কত সংযমের সহিত, কত স্নেহের সহিত সেই কর্তব্য সাধন করিতে হয় তাহা কবি নানা স্থানেই উল্লেখ করিয়াছেন। বাল্যকালে শাস্তি দেওয়ার জন্য ভৃত্যেরা জল রাখিবার বড় বড় জালার মধ্যে বালকদের ঢুকাইয়া দিত। ভৃত্যেরা তো বুঝিত না যে ছোট ছেলেদের যদি ছোট ছেলে হইতে দেওয়া হয়, যদি তাহারা খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতূহল মিটাইতে পারে তবেই তাহারা সহজ হইতে পারে। কিন্তু তাহারা মনে করিত যে বালকদের বাহিরে যাইতে দিবে না—খেলায় বাধা দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিবে—কাজেই তাহাদের দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত। বাল্যকালের এই সকল কথা তাঁহার মনে ছিল তাই তিনি মাতার জবানীতে বলিতেছেন,

"খোকা বলেই ভালোবাসি
ভালো বলে নয়।"

তাহার পর ভৃত্যদের নির্মম ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তিনি আরও লিখিতেছেন—

"আমি তারে কাঁদাই যেগো—আপনি কেঁদে—

শাসন করা তারই সাজে
সোহাগ করে যেগো।"

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব কবির জীবনে কি চিরন্তনভাবে স্থায়ী হইয়াছিল তাহার প্রমাণ তাঁহার শিশুকাব্যে বারবার দেখিতে পাই। শান্তিনিকেতনে বালকদিগের ভাষা-শিক্ষায় কবি এই দুইটি মহাকাব্য তাহাদের পাঠের প্রধান উপাদান বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। "শিশু" কাব্যে "বনবাস" কবিতাতে শিশু মাকে বলিতেছে—

"চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়
জানি নে মা, ঠিক—
দণ্ডক-বন আছে কোথায়
ঐ মাঠে কোন্ দিক।
কিন্তু আমি পারি যেতে,
ভয় করি নে তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে"।

কিম্বা—

"দুপুরবেলা মহাভারত হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে।"

—লুকোচুরি

কিম্বা—

"সীতার বনবাসের ছড়া
সবগুলি তোর আছে পড়া।"

—দুয়োরানী

কিম্বা—

"ঐখানে মা পুকুর পাড়ে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী
কেউ কোথাও নেই।"

—দুয়োরানী

এই দুই মহাকাব্য ভারতের নিজস্ব কথাকেই সহজ করিয়া দেখাইয়াছে।

পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে ভক্তি ও প্রীতির সম্বন্ধ, প্রজাপালনের যে বিশাল দায়িত্ব ও মহৎ কর্তব্য রামায়ণ তাহাই এত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম কেবল গৃহস্থের নিজের সুখের বা সুবিধার জন্য ছিল না—কিন্তু তাহা সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। যাহাতে বালকেরা এই আদর্শ চিরকাল মনের মধ্যে ধারণ করিতে পারে এই চিন্তাতেই কবি শান্তিনিকেতনে পাঠ্যের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীগুলিকে একটি বড় স্থান দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্যকরুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তাছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম। দিনের পর দিন একটা ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। * * * এমনিভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছি। * * * আমি জানি ছেলেদের এমনিভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খুব বড় কথা। মানুষের যে এত বড় বিশ্বের মধ্যে এত বড় মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এত বড় উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতা খাঁটি করে তোলা দরকার।" তাহার পর গুরুদেব আরও বলিয়াছেন, "রামায়ণের মধ্যে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়নমধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশ করিতে পথ পাইবে।"

শান্তিনিকেতনে প্রচলিত পাঠ্য-পুস্তক সম্বন্ধে তথাকার প্রাক্তন ছাত্র প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথের "শিশু" কাব্য দিয়ে পাঠ আরম্ভ হয়। শ্রেণীটি অক্ষর পরিচয়ের ঠিক উপরের ধাপ। * * * সব চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য, এই অল্প বয়সে "জোড় করি হাত, করি প্রণিপাত" জাতীয় কবিতা পড়িবার সুযোগ হয় নাই। দ্বিতীয় পুস্তক ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "ছেলেদের

মহাভারত।" শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভেই রামায়ণ-মহাভারত ও রবীন্দ্রকাব্যের উপরে প্রতিষ্ঠা পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম।"

কেবল রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করার কথা যে কবির বাল্যস্মৃতির সহিত জড়িত ছিল তাহা নহে। আরও একটি কথা তাঁহার মনে ছিল। সন্ধ্যা-বেলায় নিদ্রাকাতর চক্ষে নীরস বিজাতীয় ইংরাজীভাষা-শিক্ষার দুঃখও তিনি কোনমতেই ভুলিতে পারেন নাই। "সমস্ত দুঃখ দিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিম্‌টিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালী ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যেমন পড়া সুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া, বারান্দায় দৌড় করাইয়া কোন স্থায়ী ফল হইত না। এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্তকাল বিলম্ব হইত না।" এই কথাই স্মরণ করিয়া কবি শিশুমনের আকুল আবেদনটি তাঁহার মনোরম কবিতায় লিখিয়াছেন,

"মাগো আমায় ছুটি দিতে বল্
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখিয়াছেন, "সন্ধ্যাবেলায় পাখিরা আলো জ্বালিতে পারে না, এটা যে পাখির বাচ্চাদের পবম সৌভাগ্য, একথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে-ভাষা শেখে সেটা প্রাতঃকালেই শেখে এবং মনের আনন্দেই শেখে সেটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য সেটা ইংরেজি-ভাষা নয়, একথাও স্মরণ থাকা উচিত।"

এই সকল কথা মনে রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রমে সন্ধ্যাকাল যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন অন্যরূপ। কর্মমোহগ্রস্ত অতি ব্যস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম যে কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া "ফিলজফি অব লেজার" (Philosophy of Leisure) নামক একটি বক্তৃতায় তাঁহার মনের কথাটি তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমস্ত কর্মের মধ্যে অবকাশের উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কর্মবিরতি যেমন জীবনের কাম্য নহে তেমনি অবিরাম কর্মের চিন্তায় বিব্রত থাকাও সুস্থ জীবনের লক্ষণ নহে। কবিগুরুর শিক্ষা-পদ্ধতির যে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য তাহাই এইখানে। কর্ম ও অবকাশের

মধ্যে একটি যথার্থ সাম্য রক্ষা করিতে তিনিই আমাদের পথ দেখাইয়াছেন। সেই সত্যটির মর্ম আছে তাঁহারই রচিত দুই পংক্তির একটি কবিতার মধ্যে—

"বিরাম কাজেরই অঙ্গ একসাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।"

কণিকা।

"শিক্ষা সমস্যায়" রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা (ছাত্রেরা) নক্ষত্র পরিচয়ে, সঙ্গীতচর্চায়, পুরাণ কথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।" অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয় শান্তিনিকেতনের সান্ধ্য-বিনোদন-পর্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরের পর বৎসর গুরুদেব প্রায় সর্বদাই ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। রাত্রিতে ছেলেদের পড়াশুনার পাঠ ছিল না। * * * সন্ধ্যায় গুরুদেব ছেলে ও অধ্যাপকদের লইয়া পুস্তকপাঠ, গল্প ও নানারকম খেলা করিতেন। সে এক আশ্চর্য সান্ধ্য-সম্মিলনী ছিল।" সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন, "সেই একতলা ঘরের বারান্দাতে ঘনিয়ে আসত সন্ধ্যার নীরবতা। স্তব্ধ হয়ে থাকত শালবীথি, তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে উঠত। সেই স্তব্ধ পারাবারের বুকে গোমুখীর নির্গত কলস্বরের মতো সুমিষ্ট বাণীধারা প্রবাহিত হতো গুরুদেবের মুখ থেকে। মনে হতো, সেই প্রাচীন তপোবনের কোনো একটি সন্ধ্যা—ঋষি এবং শিষ্যদের নিয়ে তার কাল ভুলে দাঁড়িয়েছে এসে একালের এক কোণে।"

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য যে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল "শিশু" ও "শিশু ভোলানাথের" মধ্যেই আবদ্ধ নহে, যদিও তাহার প্রধান অংশ এই দুইটি কাব্যগ্রন্থেই সঙ্কলিত হইয়াছে। অসম্ভব, অদ্ভুত ও অসংবদ্ধ কথার মধ্যে শিশুমন যে প্রচুর আনন্দ পায় একথা কবি ভালো করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি নানা রসচিত্রের অবতারণা করিয়া শিশুর হাস্যরস উপভোগ করিবার ক্ষমতাকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সকল অদ্ভুত চরিত্রের বহু উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁহার "খাপছাড়া" কাব্যে।

"ঠিকানা নেই আগু-পিছুর
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

*   *   *

দাড়ীশ্বরকে মানৎ করে গোঁপ গাঁ গেল হাবল
স্বপ্নে শেয়ালকাঁটা পাখী গালে মারল খাবল ॥
দেখতে দেখতে ছাড়ায় দাড়ি ভদ্রসীমার মাত্রা
নাপিত খুঁজতে করল হাবল রাওলপিণ্ডি যাত্রা।
উর্দু ভাষায় হাজাম এসে বকল আবল-তাবল ॥
তিরিশটা খুর একে একে ভাঙ্গল যখন পটাৎ
কামারটুলি থেকে নাপিত আনল তখন হঠাৎ
যা হাতে পায় খাঁড়া বঁটি কোদাল করাৎ শাবল ॥"

তাহার পরে দেখি কল্পনার ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চড়িয়া শিশুরা চলিয়াছে কবি-গুরুর সহিত এক মজার দেশে। সেদেশে এক মজার পাকশালা, সেখানে এক মজার ভোজ প্রস্তুত করা হয়। কবি এমন এক মজার খাদ্যদ্রব্য দিয়া থালা সাজাইয়া দিলেন যে সেরূপ ভোজ্য অতি বড় রাঁধুনীতেও রাঁধিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। "জিরাফের মুড়িঘণ্ট, সরষেবাটা দিয়ে তিমিমাছ ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহস্তী।" এমন ভোজ খাইয়া শিশুদের মহা আনন্দ।

উদ্ভট কল্পনাতে ঠাসা মজাদার তাজা প্রাণের যে পরিচয় পাই আমরা এই "সে" বইখানাতে তাহা কবির নাত্‌নী পুপেদিদির জন্য যে কেবল লেখা হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত শিশুজাতির জন্যই তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ইচ্ছামত রঙ চড়াইয়া খাপছাড়া যে-সকল মজাদার চরিত্র ও চিত্র রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার ঘরের ছোট নাত্‌নীটির জন্য তাহারা যে সমস্ত বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শিশুর স্থকুমার মনের সহিত কবির যে অপূর্ব আত্মিক যোগ ঘটিয়াছে তাহার আরও নমুনা দেখি পুপেদিদির জন্য লেখা গল্পে। "তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তন্ন ছিল যাকে বলে দেখা-বিন্‌তি। কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, তাঁর গিন্নীর নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুস্কুনা। তাঁদের বড় মেয়ের নাম পামকুনিদেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিন্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। * * * এতো গেল তরকারি। আর জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙচুটোর সাঙচানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁকস্থটো ফলের ছোবড়া চোয়ান। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইকটিকুটির ভিকটিমাই ঝুড়ি ভর্তি।" কত আর লিখিব ?

এতো গেল কবিতা ও গল্পের কথা। এসকল ছাড়া শিশুদের জন্য নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গান, নাটক, ধর্ম-সঙ্গীত প্রভৃতি রচনা করিয়া শিশুশিক্ষার সকল দিক তিনি পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের পর রবীন্দ্রনাথের "সহজপাঠ" শিশুর বর্ণপরিচয়ের জন্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পুস্তক। বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৫৫ সালের এপ্রিলমাসে আর সহজপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ বাহির হয় তাহার ঠিক পঁচাত্তর বৎসর পরে। বর্ণপরিচয় লেখা হইয়াছিল যৌক্তিক পদ্ধতিতে। ইহাতে প্রথমে অক্ষরের প্রতীকগুলি আয়ত্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে জটিলতর অংশ আয়ত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এই পুস্তকখানি মুখস্থ করিয়া বাংলাভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু এই পঁচাত্তর বৎসরে শিক্ষাবিজ্ঞানের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাতে এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে শিশুর পাঠ্যপুস্তক তাহার রুচি, প্রকৃতি, যোগ্যতা ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের উপরে নির্ভর করিয়া রচনা করিতে হইবে। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ঠিক এই নীতি অনুসরণ করিয়া লিখিত হয় নাই। এই অভাব পূর্ণ করিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেখিলেন যে বর্ণপরিচয়েব সাহায্যে শিশুর ভাষা-শিক্ষা হয় বটে কিন্তু সে আনন্দ পায় না। তখন তিনি মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিতে লিখিলেন, "সহজ পাঠ"। ইহা লিখিবার জন্য তিনি কোন মনস্তত্ত্বের গ্রন্থ পড়িতে বসেন নাই কিন্তু নিজের বাল্যস্মৃতি মন্থন করিয়া যাহা তাঁহার ছেলেবেলায় ভাল লাগিত, যে পুস্তক, ছড়া বা ছন্দ তাঁহার মনকে নাড়া দিয়াছিল, যে হাস্যরসের পরিবেশনে তাঁহার মন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, যে সৌন্দর্য তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়াছিল, যে বীরত্বের গাথা তাঁহার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ কারয়াছিল তাহাই তিনি সাজাইয়া দিলেন সহজ-পাঠের তিনটি ভাগে। কবিতায়, প্রবন্ধে, চিত্রে, ছন্দে, বর্ণপরিচয়ের অভিনব পদ্ধতিতে তাঁহার পুস্তকগুলি শিশুর ভাষা-শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশুশিক্ষার জন্য "বর্ণপরিচয়", "বোধোদয়", "কথামালা", "আখ্যানমঞ্জরী" প্রভৃতি যে কয়টি শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিলেন—সেইগুলিকে রবীন্দ্রনাথ অবজ্ঞাভরে দূরে সরাইয়া দেন নাই কিন্তু সেই সৃষ্ট শিল্পকাজগুলিকে সুরে, রেখায়, বর্ণে ও ছন্দে আরও সুষমাময় করিয়া তুলিলেন।

বালকদিগের ভাষাশিক্ষার জন্য তিনি যে আরও একটি পদ্ধতি ব্যবহার

করিতেন তাহা সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। তিনি ছেলেদের কেবল বাহিরের পুস্তক পড়াইতেন না, তাহাদের দ্বারা পুস্তক তৈয়ারি করাইয়া লইতেন। যে বিষয়টি পড়াইবেন প্রথমে তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন; পরে তাহা বালকদিগকে নিজের ভাষায় বলিতে সাহায্য করিতেন। ভাষায় প্রকাশ যখন বেশ সড়গড় হইয়া যাইত তখন তিনি তাহাদের বিষয়টি লিখিয়া দিতে বলিতেন। ক্রমে তাহা শুদ্ধ করিয়া একটি পাকা লেখায় দাঁড়াইত। শিশুর ভাষাশিক্ষা এইভাবে বেশ মজবুত ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিত। "তোতা-কাহিনী"র পাখির ন্যায় "পাখিগুলিকে সোনার খাঁচায় বন্ধ" করিয়া কবি ভাষা শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার শিখাইবার কায়দাটা পাখিগুলিকে ছাড়াইয়া যায় নাই—"রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া" তিনি বালক-দিগের মুখ বন্ধ করিয়া দেন নাই।

ছেলেরা যেন দেশকে ভালোবাসিতে ও সেবা করিতে শেখে তাহার জন্য কবি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। যে ভারতকে তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে তাহাই তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন জীবনের আদর্শরূপে। তাই তিনি বৌদ্ধসাহিত্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, রাজপুত, শিখ ও মারাঠাগণের কাহিনী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অবলম্বনে "কথা" রচনা করিয়া দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দিলেন। ইতিহাসের এই কাহিনীগুলি কবির হাতে ছবির ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বীররসে ভরা নাটকীয়তায় এগুলি এমনই অপূর্ব যে ছেলেরা সেই গৌরবময় ভারতের ইতিহাসে ডুব দিয়া নূতন তেজে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে—একথা নিশ্চিত।

তাই দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথ শিশুদের পূজা হেলা ফেলা করিয়া সারিয়া ফেলেন নাই। নৈবেদ্যের থালা সাজাইতে গিয়া শিক্ষাব্রতী দেখিলেন পূজা-উপচারের নিতান্তই অভাব। বালকের মনঃপ্রকৃতি তাহার বিচিত্র পারি-পার্শ্বিকের আকস্মিক ও অপরিহার্য ঘটনাসমবায়ে কিভাবে পরিণত হইয়া উঠে তাহা না বুঝিতে পারিলে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায় না।

কবি তাই নিজের বাল্যজীবনের সহিত সমস্ত ছেলেমেয়েদের আশা আকাঙ্খাভরা জীবনগুলিকে মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন—তবেই তো তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি এমন প্রাণবন্ত, এমন সজীব ও সার্থক হইয়াছে। যে "পোষণ পদার্থ" তাঁহার প্রাণের সহিত মিলিয়া তাঁহার কিশোর জীবনকে পূর্ণ করিয়াছিল, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও তাঁহার জীবন যে ব্যর্থ

হইয়া যায় নাই, একথা যখন তাঁহার মনে হইল, তখন সেই "পোষণ-পদার্থ-গুলি" কি ছিল তাহারই সন্ধানে তিনি রত হইলেন। এবং তখনই শিশুর বিশ্বাসপরায়ণ, কল্পনাপ্রবণ, রহস্যময়, সরস, সতেজ, সুকুমার মনটি তাঁহার স্নিগ্ধ করুণা-কিরণ-পাতে ক্রমে ক্রমে শতদলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল।

শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ শিশু-জীবনে এমন গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার শিশুসাহিত্য এমন প্রাণবান। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে দেখাইয়াছিল যে খুশির খেলা হইল সত্য, শিব ও সুন্দরের খেলা। সমস্ত সৃষ্টিই সেই মহান শিশুর ক্রীড়াক্ষেত্র যেখানে তাঁহার শিশুরা খেলার আসন পাতিয়াছে। সেই শিশুদের যাহাতে তিনি সেবা করিতে পারেন, তাই কবি প্রার্থনা করিলেন,

"—ওগো শিশুর সাথী
শিশুর ভুবন দাও তো পাতি
করবো খেলা তোমায় আমায় একা
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়—তোমার জগৎটিকে
সহজ চোখে দেখবো সহজ দেখা।"

॥ ৮ ॥

লোকশিক্ষক

মহাভারতে আছে "গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥"

হংসগীতা শান্তি ২৯৯।২০

"একটি গুহ্য ও মহৎ তত্ত্ব তোমাদের বলিতেছি, মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।"

বাংলার প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠেও আমরা এই একই বাণী শুনিতে পাই,

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

রবীন্দ্রনাথও সেই পুরাতন কথা গাহিয়াছেন নূতন সুরে—

"দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।"

আমাদের পিতামহগণ মানুষের আত্মাকে এমন বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নিকটে মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না। চাণক্য-শ্লোকে আমরা পড়ি—

"ত্যজেদকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥"

"মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়েও বড়ো।" এই সত্য ভারত একদিন উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া তখনকার দিনে সমগ্র দেশের চিত্ত একটি উঁচু সুরে বাঁধা ছিল। আপামর জনসাধারণের এমন একটি অদ্ভুত নৈতিক উৎকর্ষ ও চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়াছিল যে তাহা দেখিয়া বিদেশী পর্যটকগণ পর্যন্ত বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। মানুষের মন এরূপ উচ্চ লক্ষ্যে বাঁধা ছিল বলিয়াই তাহার আত্মপ্রত্যয় ছিল এত গভীর ও চিত্তের একাগ্রতা ছিল এত নিবিড়। এই গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ফলে ভারতবর্ষ একদিকে যেমন কৃষি-বাণিজ্য ও ব্যবসার দ্বারা প্রভূত ধন উৎপাদন করিয়াছিল আর একদিকে তেমনি তাহার চিত্তের একাগ্রতার ফলে সে সভ্যতার চরম

শিখরে পৌছিয়াছিল। মানুষের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করা—নিজেকে উপলব্ধি করা—আত্মানাং বিদ্ধি। প্রাচীন ভারতবর্ষ এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই বলিয়াই সেদিন সে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল।

চার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এই ভারতেরই এক নারীর কণ্ঠে পৃথিবী শুনিয়াছে, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?" যাহাতে আমি অমৃতা হইতে পারিব না তাহা লইয়া আমার কি হইবে? ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিতেন ঐহিকতা মানুষকে সুখসাচ্ছন্দ দিতে পারে বটে কিন্তু অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করিতে পারে না। কি করিবেন তিনি ধনসম্পত্তি লইয়া যাহা তাঁহাকে অমৃতা করিবে না? ভারতের এই যে সভ্যতা যাহার ফলে বস্তু উৎপন্ন হইলেও যাহা বস্তুতান্ত্রিক ছিল না—এই অনন্যসাধারণ সমাজব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়া গেল কিভাবে? ইতিহাস বলে যে মানব সম্বন্ধের বিকৃতিই ইহার প্রধানতম কারণ। ক্ষমতাশালী বিজেতা ও বিজিত অক্ষম লোকেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবধান ক্রমশঃ এমনই প্রশস্ত হইয়া গেল যে মানুষের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ তাহা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া গেল। এবং ইহারই ফলে দেখা গেল জাতির একটি অঙ্গ অতি পুষ্ট এবং অন্য অঙ্গ অতি শীর্ণ হইয়া সমাজদেহে ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে। দেশের যে বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত ছিল, যে শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্মের প্রবাহ সর্বত্র সঞ্চারিত ছিল, যাহার দ্বারা সমস্ত পল্লীসমাজ সজীব প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হইত, সেই প্রাণ-প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটিল এবং অবশেষে থামিয়া গেল। তাই দেখিতেছি মনুষ্যসম্বন্ধের বিকৃতিই ভারতের দৌর্বল্যের এক প্রধান কারণ।

যৌবনে যে ভারতবর্ষের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিল সে ভারতবর্ষ তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও রিক্ত। দেশের এই ভগ্নদশা দেখিয়া কবি যে গভীর মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন তাহার প্রকাশ দেখি "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাতে। এই লাঞ্ছিত, আত্মমর্যাদাবিস্মৃত মানুষকে আপন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিলেন। তিনি গাহিলেন,

"কবি তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনার কার্যে দেশের যে মূর্তি তিনি দেখিলেন, তাহার সহিত তাঁহার ধ্যানের ভারতবর্ষের কত প্রভেদ! সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ—ধনে জনে সম্পদে পরিতৃপ্ত ভারতবর্ষ—কর্মে ও ধর্মে মহান ভারতবর্ষ আজ একি দরিদ্রের বেশ ধারণ করিয়াছে? মানুষের আত্মার একি চরম দুর্দশা! তাই দেখি রবীন্দ্রনাথ নিজের এই আত্মবিস্মৃত জাতিকে উদ্বোধিত করিতে ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং সেই প্রাণ উদ্বোধনের যজ্ঞস্থল হইল তাঁহার শান্তি-নিকেতনের যজ্ঞভূমিতে।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ভারতের এক যুগ-সন্ধি-ক্ষণে। তাঁহার যৌবনকালে দেশে আসিয়াছিল একটি বিপর্যয়ের যুগ, আদর্শের সংঘাতের সময়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটে দেশের চারিত্রিক বল যখন লুপ্তপ্রায়—সেই সময়ে বাংলার পল্লীগুলির সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়া যেন একরূপ ভবিতব্য বলিয়াই মনে হয়। জন্ম-অভ্যস্ত আভিজাত্যের গণ্ডি ঠেলিয়া তিনি যে কোনদিন জনগণের সহিত মিলিত হইবেন, এ চিন্তা তাঁহার কল্পনাতেও ছিল না। জমিদারির কাজের মধ্যে তিনি এমন এক কঠোর বাস্তবতার পরিচয় পাইলেন যে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে যাচাই করিয়া তাঁহার কর্তব্য কি তাহা এই সময় বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি এই সময়েই তাঁহার জীবনের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন আর পাইয়াছিলেন তাঁহার বিশাল সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান। এই উপাদানের সাহায্যেই তিনি তুলিয়া ধরিলেন জনগণের অবস্থা সকলের সম্মুখে—দেশের রাজা ও দেশের নেতাদের নিকটে।

বাংলার শত শত পল্লী ভ্রমণ করিয়া কবি বঙ্কিমের "সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা" বাংলাদেশকে দেখিতে পান নাই। দেখিতে পাইয়াছিলেন কৃষককুলের দুর্গতি, মহাজন ও জমিদারের শোষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবস্থার অধোগতি এবং অর্থনৈতিক ব্যর্থতা। দেখিলেন, ঐক্য নাই অনৈক্য আছে, দল নাই দলাদলি আছে, কর্মশক্তি নাই কার্যে

অক্ষমতা আছে, ভাব নাই ভাব-প্রবণতা আছে। "রাশিয়ার চিঠিতে" তিনি লিখিয়াছেন, "আমি গ্রামে অনেক দিন কাটিয়েছি, কোনো রকম চাটুবাক্য বলতে চাই নে। গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমার সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি। শহরে কতকগুলি সুবিধা আছে, গ্রামে তা নেই, গ্রামে যেটা আপন জিনিস ছিল তাও আজ সে হারিয়েছে।"

তাঁহার ব্যথিত চিত্তের এই চিন্তা প্রকাশ পাইয়াছে গোরার কর্মবহুল পরিভ্রমণের মধ্যে। "গোরা" উপন্যাসে পড়ি কবি লিখিতেছেন, "গোরা যতই ইহাদের ভিতরে প্রবেশ করিল ততই একটা কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে দেখিল, এইসকল পল্লীতে সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি। * * * কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারের নিষ্ঠায় ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মত ভীত অসহায় আত্মহিত-বিচারে অক্ষম জীব জগতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। * * * কী করিতে নাই এই কথাটাই পদে পদে শাসনের দ্বারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদ-মস্তক জালে বাঁধিয়াছে। * * * * ইহাদের মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে। * * * মা-বাপের মৃত্যুর অপেক্ষা মা-বাপের শ্রাদ্ধ সন্তানের পক্ষে গুরুতর দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। অল্প আয় অল্প শক্তির দোহাই কেহই মানিবে না, যেমন করিয়াই হউক সামাজিকতার হৃদয়হীন দাবি ষোলো আনা পূরণ করিতে হইবে। বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্যার পিতার বোঝা যাহাতে দুঃসহ হইয়া উঠে এইজন্য বরের পক্ষে সর্ব প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়, হতভাগ্যের প্রতি লেশমাত্র করুণা নাই। গোরা দেখিল এই সমাজ মানুষকে প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করে না, বিপদের সময় ভরসা দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইয়া বিপন্ন করে।"

একটি বলিষ্ঠ জাতি এমন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ, নির্বীর্য, উৎসাহহীন, বিমর্ষ, মানসিক ও দৈহিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের হৃদয় বেদনায় ফাটিয়া পড়িল। তিনি লিখিলেন—

"ঐ যে দাঁড়ায়ে নতশির—
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি' চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি'
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি'
মানুষেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি, কোনো মতে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"

ভারতবর্ষের বুকের উপর এই যে অভ্রভেদী দুঃখ চাপিয়া বসিয়াছে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই তাহার মূল কারণটি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য, নৈতিক ও চারিত্রিক অধোগতি যাহা কিছু ভারতবাসীর স্বভাবে দেখা দিয়াছে তাহার সমস্তের মূলে আছে অশিক্ষা। প্রায় দুই শত বৎসর ইংরাজ রাজত্ব করিয়া গেল কিন্তু আমরা না পাইয়াছি শিক্ষা, না পাইয়াছি স্বাস্থ্য, না পাইয়াছি সম্পদ। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন তো স্বীকার করিয়াই গিয়াছে যে ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার প্রসার হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়, গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচোট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে, জিনিসপত্র কেবলই হারায় তার পরে খুঁজে পায় না—অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত, অতএব নিজের গৃহস্থালীর তদারকের ভার তার উপর দেওয়া চলে না—তার পরে সবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয় আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি তাহলে সেটা কেমন হয়?"

তাহার পর তিনি এই প্রসঙ্গেই আরও বলিয়া চলিয়াছেন, "ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেছে,

ধর্মমতের স্বাতন্ত্রকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেছে, নিজেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব করে রেখেছে, এ ছাড়া কত অন্ধতা, কত মূঢ়তা, কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায় এ সমস্ত দূর হলো কী করে? বাইরেকার কোনো "কোর্ট অফ ওয়ার্ডস"-এর হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কারসাধনের ভার দেওয়া হয় নি; একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিলেন, ভারতের যত শৈথিল্য, যত দৌর্বল্য, যত কুসংস্কারের কারণ হইল যে তাহার অন্তরের সম্বল কমিয়া গিয়াছে। তাহার চিত্তের দৈন্য দূরীভূত না হইলে সে কখনই আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। কিভাবে উপযুক্ত কর্মপ্রণালীর দ্বারা দেশকে আবার সবল করিয়া তোলা যায় তাহার জন্য "স্বদেশীসমাজ" প্রবন্ধে কবি বিস্তারিতভাবে একটি বৃহৎ পরিকল্পনা দেশের নেতৃবর্গ ও শিক্ষিত সমাজের নিকটে পেশ করিলেন। দেশের যুবক সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো। তাহাকে জানাইয়া দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ-সংসারে অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞানতা তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর।" শিক্ষিত কয়েকজন ও দেশের বহু কোটি অশিক্ষিত লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়া যে ভীষণ শ্রেণীভেদের সৃষ্টি করিতেছে তাহা রবীন্দ্রনাথকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। এই সময়ে দেশের শিক্ষিত লোকের মন দেশের মাটি হইতে দূরে দূরে ভাবের আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মাটির লোকের সঙ্গে যোগ না হইলে কোনমতেই দেশের কাজ সার্থক হইবে না ইহা রবীন্দ্রনাথ বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন যে ভারতবর্ষ চিরদিনই বিদ্যা বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছে। গরীবের ছেলে ধনীর চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় বসিয়া বিদ্যা অর্জন করিয়াছে—রাজার সভায় যে উৎসব হইয়াছে দরিদ্র প্রজা সেখানে বিনা আহ্বানে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশলাভ করিয়াছে। টোল-চতুষ্পাঠীতেও অপ্রতিগ্রহী ব্রাহ্মণ শিক্ষাদান করিয়াছেন। ইহাতেই দেখি যে সমাজ শিক্ষাকে সুলভ

করিয়া রাখিয়াছিল। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভার সমাজের উপরে ছিল, সমাজই ইহাকে রচনা করিয়াছে এবং সমাজই ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। দেশের শিক্ষার জন্য সমাজ বাহিরের কোন সাহায্যের উপর নির্ভর করিত না। এখনই বা কেন আমাদের শিক্ষার জন্য আমরা বিদেশী রাজার উপরে নির্ভর করিব? ইংরাজ শাসনের ফলে যে শিক্ষার প্রসার হইতেছিল তাহা ক্রমশঃ ব্যয়সাধ্য হওয়াতে বিদ্যা সঙ্কীর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে বিদ্যা কোনমতেই এমন দুর্মূল্য ও দুর্লভ হওয়া উচিত নহে।

পাবনা কন্‌ফারেন্সের পরই তিনি রাষ্ট্র-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির যে একমাত্র পথ তাঁহার কাছে সুনিশ্চিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহাই তিনি নির্বাচন করিয়া লইলেন, কেননা, "তলার লোকেদের" মানুষ করিয়া তোলা ভিন্ন যে দেশের প্রকৃত মুক্তি কখনই আসিতে পারে না, এই সময় হইতে তাঁহার এ বিষয়ে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। "দেশের মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে * * * * একথা বলা বাহুল্য। প্রধানতঃ মানুষ শিক্ষার দ্বারাই তৈরি হয়—'মানুষ করে তোলা' কথাটার মধ্যে এই অর্থ আছে, প্রকৃতির ক্রিয়া জন্তুকে জন্তু করে। মানুষের শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে তোলে। * * * আমি এই বলি মানুষকে একদিকে অসম্পূর্ণ করে আর একদিকে তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কলসীর একদিক ছিদ্র করে, আর একদিক থেকে তাতে জল ঢালা।"

আরও একটি কথা তাঁহার নিকটে অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে বিদেশী শাসক নিরস্ত হইলেও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে সর্বসাধারণের যোগে দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রাতিষ্ঠিত হইবে না—কিন্তু শক্তিমান কয়েকজনের দৌরাত্ম্যে আত্মবিপ্লবের সূচনা হইবে। এই স্বল্পলোকের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সংযত করিবার একমাত্র উপায় হইল বহুলোকের সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্বোধন। যতক্ষণ না দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবে ও যথার্থভাবে তাহা দাবি করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের কখনই প্রকৃত মুক্তি হইতে পারে না।

তখনকার দিনে খুব কম জনেই বিশ্বাস করিতেন যে দেশের পল্লীগুলিই প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র এবং পল্লীবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবেই দেশের প্রকৃত উপকার করা হইবে। দেশে যে কেরানী

তৈয়ারি করিবার কারখানা বসিয়াছিল তাহাতে দেশবাসীর যথেষ্ট শিক্ষা হইতেছে মনে করিয়া দেশের নেতৃবর্গ বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। যে-পরিমাণ ও যে-প্রকৃতির শিক্ষায় বৃহৎভাবে সমস্ত দেশের চৈতন্য হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে ইংরাজও প্রস্তুত ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে আমরাও তাহা পরের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না। সেইজন্যই শিক্ষা-বিস্তারের সাধনাকেই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্যরূপে নিজেদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। দেশকে বাঁচাইতে হইলে কেবল ভাবুকতা নহে, রুদ্র পন্থাও নহে কিন্তু প্রকৃত ও বিস্তারিতভাবে জ্ঞানপ্রসারের প্রয়োজন। শুধু ভোট দিবার অধিকারে তো দেশের পরিত্রাণ নাই—পরিত্রাণ আছে সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্ত চিত্তের ঔজ্জ্বল্য যাহা কেবল শিক্ষার দ্বারাই লাভ করা যায়।

ইংরাজশাসনকালে দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যখন ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল এবং কেবলমাত্র শহরে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল তখন রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, "একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকুরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব। শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হলো এনলাইটেন্‌ড্‌—আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকী দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজী পড়া মুখস্থ করলেন; শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বল, পথকষ্ট বল, রোগ বল অজ্ঞানতা বল জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে।"

রবীন্দ্রনাথ একটি কথা বারবার দেশের লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে ভারতের মর্মস্থল তাহার গ্রামে; সেই গ্রামের সমস্যা ভারতের সমস্যা। গ্রামে গ্রামে নূতন প্রাণ আনিতে পারিলে তবেই ভারতের কল্যাণ। এককালে দেশের জনশিক্ষার প্রসার হইত সমাজের প্রচেষ্টায়; জনশিক্ষার প্রবাহ গৃহে গৃহে স্বতঃসঞ্চারিত হইত কথকতা, শাস্ত্রালোচনা, নাটমন্দিরের

পূজা-পার্বণের মাধ্যমে। কিন্তু জাতির এই প্রবহমান সনাতন শিক্ষাব্যবস্থা ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনে ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে যখন একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল তখন দেশ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। মানুষের সহিত মানুষের যে সহজ সম্বন্ধের পথ তাহা এই সময় হইতে নষ্ট হইয়া গেল। এছাড়া দেশের চিত্তের আলোক যতই ম্লান হইয়া উঠিল আত্মবিশ্বাস ততই দুর্বল হইতে লাগিল। যাহাদের আত্মবিশ্বাস নাই তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠাও নাই। দেশের প্রকৃত কল্যাণ রাহিয়াছে এই আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে এবং ইহা কেবল ঐক্য, প্রেম ও শ্রমের দ্বারা, আত্মবিশ্বাসের দ্বারা লাভ করা যায়। অতএব লোকগুরু রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য হইল যে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করিয়া মানুষের আত্মাকে জাগ্রত করা। দেশের মুক্তির ইহাই একমাত্র পথ।

আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক ও মূঢ় অবস্থায় জীবনের সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্তরের দৈন্য ও শরীরের অক্ষমতায় সমাজের নীচে পড়িয়া আছে, বিদেশে ভ্রমণকালে বহু স্থানে এই শ্রেণীর লোকদের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। তিনি এই সময়ে আরও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন যে সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কি প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত থাকে, কি অসীম তাহার অপব্যয় হয় এবং কি নিষ্ঠুর অবিচারে মানুষের মননশক্তিকে খর্ব করা হয়। বিদেশের সেই জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহাদের শক্তির উৎস কোথায় তাহারই অনুসন্ধান করিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেখিলেন অশক্তকে শক্তি দিয়াছে শিক্ষা। অন্ন, স্বাস্থ্য, শক্তি সমস্তই তাহারা পাইয়াছে প্রকৃত শিক্ষার ফলে। সেই শিক্ষার দ্বারা তাহাদের আন্তরিক সম্পদ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, উন্নতির পথ অবারিত হইয়াছে, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে—জগতে তাহাদের পরিচয় উজ্জ্বল হইয়াছে।

এই যে শিক্ষা—ইহার প্রবাহ বিগলিত হইয়া জনসাধারণের গৃহে পৌঁছাইয়াছে তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে, দিগন্তবিকীর্ণ ইহার পরিধি, বিস্তীর্ণ ইহার পরিব্যাপ্তি। কাজেই সে দেশের লোকের একটি বলিষ্ঠ মন গড়িয়া উঠিতে সময় লাগে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই পরামর্শ দিলেন যে ইস্কুল-কলেজের বাহিরে শিক্ষা প্রসারিত করিতে হইবে এবং তাহার জন্য চাই জাতীয় সাহিত্য। বিদেশী রাজপুরুষদিগের কর্ণে হিতকথা শুনাইবার চেষ্টা যে পণ্ডশ্রম-

মাত্র তাহা তিনি জানিতেন ; সেইজন্ত রাষ্ট্রনেতাদের বারবার জাতীয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে কবি আহ্বান করিলেন। তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবার সময় বা ইচ্ছা সে সময়ে রাষ্ট্রনেতাদের ছিল কিনা জানি না কিন্তু বিদেশী প্রভুদের অত্যাচার ও ছাত্রদের আন্দোলনে একদিন জাতীয় বিশ্ববিত্থালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব লইয়া রাষ্ট্রনেতাগণ একটি জাতীয় শিক্ষাপরিষদ স্থাপন করিলেন বটে এবং সেই পরিষদে রবীন্দ্রনাথও একজন সদস্থ হইলেন। কিন্তু এই পরিষদের কর্মপদ্ধতি ও অন্যান্য সদস্যদের ভাবধারা কবির মনঃপূত হইল না। তিনি দেখিলেন, উত্থোক্তাদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই এবং নূতন পরিকল্পনা দিবার মত লোকও কেহ নাই। পরিপূর্ণ শিক্ষা বলিতে কি বোঝায় তাহাও সকলে ঠিকমত জানেন কিনা সন্দেহ। কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের অনুকরণে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাহার গায়ে "জাতীয়" লিখিয়া দিলেই যে তাহা জাতীয় শিক্ষায়তন হইবে না একথা রবীন্দ্রনাথ বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া বলিলেন কিন্তু কবির বাণী শুনিবার মতো ধৈর্য তখন দেশবাসীর ছিল না, দেশের নেতাদের তো ছিলই না।

তাঁহাদের চিন্তাধারা ও দেশের মুক্তিসাধনের উপায় ছিল অন্যরূপ। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই তাঁহারা আত্মশক্তির সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করার পথ মনে করিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেরূপ কার্যে সহায়তা করিতে পারিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তিনি লিখিলেন, "উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ-পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। তাই আমি ঠিক করিয়াছি যে অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।" তিনি আরও বলিলেন, "দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে একথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস। বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।"

"স্বদেশী সমাজ" ও "সফলতার সদুপায়" প্রবন্ধ দুইটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং জনসেবার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন বিস্তারিতভাবে এবং কেবল তাহাই নহে "আপনি আচরি' ধর্ম অপরে শিখায়"— এই নীতির অনুসরণে তিনি নিজের জমিদারিতে তাঁতের কারখানা, সমবায়

ভাণ্ডার, সালিসী বৈঠক, পল্লী-পঞ্চায়েত, কৃষি-ব্যাঙ্ক প্রভৃতির পত্তন করিলেন। জমিদারিতে চাষের উন্নতির জন্য নিজের পুত্র রথীন্দ্রনাথ, জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে বৈজ্ঞানিক ধারায় কৃষিবিদ্যা শিখিবার জন্য আমেরিকায় পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া আনিলেন। পল্লীত্যাগী, শহরবিলাসী জমিদারদের শিক্ষার জন্য নিজে সপরিবারে সাহাজাদপুর, কালীগ্রাম ও শিলাইদহে বহুদিন প্রায় স্থায়িভাবে বাস করিয়া জমিদারির মধ্যে একটি বিরাট সংগঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম, জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি।"

অতি অল্পকালের মধ্যেই কিভাবে স্বদেশকে সচেষ্ট ও সবল করিয়া তোলা যায় তাহার জন্য তিনি ভারতের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি মন্থন করিয়া দেখাইলেন দেশের যথার্থ কাজের ক্ষেত্র কোথায়। দেশের লোকদের কিভাবে চালনা করিলে তাহারা আত্মশক্তি লাভ করিবে, আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে তাহাও তিনি নানা প্রবন্ধে, পত্রিকায় ও নানা রচনায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচারণভূমি প্রভৃতি দেশে যে-সমস্তের অভাব ছিল তাহাও কিভাবে দূর করা যায় তাহা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেশবাসীকে কাজে প্রেরণা দিলেন। আজকাল আমরা গ্রাম-সংস্কার বা পল্লী-সংগঠনের যে সকল কথা শুনি তাহার সূত্রপাত যে রবীন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন একথা অত্যুক্তি নহে। বহু পরে ১৯২১ সালে যখন রাজনৈতিক নেতারা সম্যক উপলব্ধি করিলেন যে গ্রামোন্নয়নই দেশের প্রকৃত কাজ তখন অনেকেই জানিতেন না যে ইহা রবীন্দ্রনাথেরই আদর্শের কথা।

জনসংঘকে একত্র করিয়া বিলাতী ছাঁচে একটা সভা করিবার পক্ষে কবি বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মত ছিল যে ঐরূপ সভার পরিবর্তে একটি বৃহৎ মেলার আয়োজন করিয়া দেশের সকলে সেখানে মিলিত হইবেন। ইহাই প্রকৃত ভারতীয় পদ্ধতি। এই মেলায় ভারতের জনসংঘ একত্র হইবে, সেখানে যাত্রা-গান, কথকতা, কীর্তন শুনিতে দূর-দূরান্তের লোক আসিয়া মিলিত হইবে। সেইখানেই নানা পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। আমোদ-আহ্লাদের সহিত জনসাধারণের শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে। যেমন, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে সহজ ভাষায় স্বাস্থ্য-তত্ত্বের কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং

যে-সকল সুখ-দুঃখের পরামর্শ আছে তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা হইবে। ইহাতেই মানুষের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ আজ বিকৃত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা আবার সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে বলিয়াই কবিগুরুর আশা ছিল; এবং এই আশা ও উদ্দেশ্য লইয়াই গুরুদেব শান্তিনিকেতনের পৌষমেলাকে কেবলমাত্র ধর্মসম্মেলনের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই, তাহাকে একটি সার্বজনীন রূপ দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

কবির "স্বদেশীসমাজের পরিকল্পনা" অনুযায়ী কয়েকজন উৎসাহী যুবক গ্রামোন্নয়নকার্যে ব্রতী হইলেন কিন্তু পুলিসের উপদ্রবে সে কাজ বন্ধ করিতে হইল। তাহার পর শিলাইদহে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ গ্রামের কাজের জন্য নানা আয়োজন করিলেন বটে কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ সে কাজ ব্যর্থ হইল। ১৩৫৮ আশ্বিন সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে "রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ" নামক প্রবন্ধে আমরা পড়ি, "রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বপ্নই দেখেন নাই। সুবৃহৎ পরিসরে তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন—এই সংবাদ নানা কারণে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকটে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। * * * অজ্ঞাত থাকার কারণ যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বৎসরাধিক কালের মধ্যে নেতা অতুল সেন-সহ তাঁহারা সকলেই রাজরোষে পতিত হইয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য অন্তরীণ ও নজরবন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই কর্মযোগের দিকটা দেশের লোকের কাছে প্রচারের সুযোগ পান নাই।"

দেশের নেতারাও যখন তাঁহার পরিকল্পনানুসারে কাজে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, তাহার উপর নিজের চেষ্টায় যে কাজ তিনি করিতেছিলেন, তাহাও রাজরোষে বন্ধ হইয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত কর্মশক্তি বিদ্যালয়েই কেন্দ্রীভূত করিলেন। আশা করিলেন যে, আশ্রমের মুষ্টিমেয় ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান ও সংযম আনিয়া তাহাদের শক্তিমান করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে তাহারাই একদিন দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করিতে এবং দেশের চিত্তকে স্বাধীন করিতে পারিবে। স্বাদেশিকতার উত্তেজনাকে বিদ্যালয়ে ও তাহার চারিপার্শ্বে গঠনমূলক কর্মের দ্বারা সার্থক করিয়া তুলিবেন ইহাই এখন হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল। রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন যে যদি একটি পল্লীরও সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিয়া তাহাকে আদর্শ পল্লীরূপে গড়িয়া তুলিতে

পারেন তবে তাহা হইতেই দেশের বৃহত্তম কল্যাণের সূচনা হইবে। তাই তিনি আর তাঁহার কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত না করিয়া তাহা কেন্দ্রীভূত করিলেন এবং গঠনমূলক কর্মযোগের সূত্রপাত করিলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে। তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়া বলিলেন,

"রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলাবালি
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।"

"স্বরাজ সাধনায়" তিনি লিখিলেন, "সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের কথা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব—আর সেই অভাবেই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্ত-দৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য-অনুষ্ঠানের জোরে এদেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরাজিতে একটা কথা আছে সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে, তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আহ্বান করে আনবে।"

মানুষের চিত্তের দৈন্যকে দূর করিবার জন্য যে কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিলেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে লোকশিক্ষার জন্য তিনি ক্রমে ক্রমে বহু আয়োজন করিলেন। বালক-বালিকাদের উৎসাহ দিলেন যাহাতে তাহারা কাছের গ্রামগুলিতে গিয়া নিয়মিত নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে। মেয়েরা নিয়মিত ভাবে গ্রামের মেয়েদের সেলাই শিখাইতে সুরু করিলেন। অধ্যাপকগণ ছাত্রদের লইয়া পল্লীসমাজের তথ্য-সংগ্রহ কাজে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আশ্রম-ভৃত্যদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসারের জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল।

শান্তিনিকেতনই তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র হইলেও বাংলার সুদূর পল্লী-গুলির কথা তিনি ভুলিয়া যান নাই। যাহাতে দূর-দূরান্তেও শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হইতে পারে তজ্জন্য তিনি "লোকশিক্ষা সংসদ" প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সংসদের উদ্দেশ্য হইল নিরক্ষরকে অক্ষরদান করা এবং যাহারা সাধারণভাবে একটু লেখাপড়া শিখিয়া নানা কারণে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই তাহাদের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া শেখার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া। বাঁধা

শিক্ষালয়ের বাহিরে সমস্ত দেশ জুড়িয়া একটি শিক্ষার ক্ষেত্র গড়িয়া তোলাই এই সংসদের লক্ষ্য। তাহার পর তিনি আরও একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন। যাহাতে সাধারণ জ্ঞানের সহিত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বিশিষ্ট জ্ঞান সর্বজনাধিগম্য হয় তাহার জন্য "লোকগ্রন্থমালা" প্রকাশেরও ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে শিক্ষার মন্দাকিনী ধারাকে রুদ্ধকুণ্ড হইতে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেশের সর্বত্র প্রবাহিত করিয়া দিলেন গুরুদেব। ইহাতে জনসাধারণের কি প্রভূত কল্যাণসাধন করিলেন কবি, তাহা আজ আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

কবির নিকটে সরল জীবনযাপন ও সৌন্দর্যহীনতা একার্থক ছিল না। সেইজন্য তিনি শ্রীনিকেতনে এমন এক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে দেশের লোকের ললিতকলার প্রতি যথার্থ অনুরাগ জন্মে। পাশ্চাত্য-শিক্ষার আলোকে চোখ ধাঁধিয়া যাওয়াতে শিক্ষিত জনসমাজের নিকটে সেদিন ভারতীয় নিজস্ব হস্তশিল্পের আদর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। কারুশিল্প, দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, তন্তুশিল্প প্রভৃতি যাহাদের ব্যবসা তাহারা নিতান্ত না খাইয়া মরিবার পথে—বাংলার পল্লীভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের এই তীব্র অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। কাজেই তিনি হস্ত-শিল্পের রূপ-উন্নয়নের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আজ দেখি কত শত কুমোর, কামার, ছুতার, পটুয়া, পিত্তলকার, ও তাঁতী নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে। তাহাদের গতানুগতিকতা ঘুচাইবার অগ্রদূত যে রবীন্দ্রনাথ একথা যেন আজ আমরা ভুলিয়া না যাই।

যুগ-পরিবর্তনে ক্রেতাদিগের যে রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেই পছন্দমত শিল্পকার্য তৈয়ারি হইলে তাঁহারা পুনর্বার দেশীয় জিনিসপত্রে আকৃষ্ট হইবেন, এই সঙ্কল্পে কবিগুরু শ্রীনিকেতনে এক শিল্পকেন্দ্র গঠনে এবং প্রতিভাবান শিল্পীগণের সাহায্যে লোকশিল্পের উন্নয়নে মন দিলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোক পাঠাইয়া নানা ঢঙের শিল্পকর্ম সংগ্রহ করিয়া নমুনার জন্য এখানে সংগ্রহশালা স্থাপিত করিলেন এবং প্রথাগত ধারাকে যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া তিনি এই সকল শিল্পে নূতনত্বের সঞ্চার করিলেন। আধুনিকতার নামে যদি এই সকল কাজের নকশা ও রচনাশৈলী কোনমতে নষ্ট হইত, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতেন; কাজেই শ্রীনিকেতন হইতে শিল্পকর্মের যে-সকল নমুনা বাহির হইয়াছে তাহাতে একদিকে যেমন

যুগোপযোগী রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি নন্দনতত্ত্ব ও আঙ্গিকের বিচারেও তাহারা রসোত্তীর্ণ হইয়াছে।

কবি বলিয়াছিলেন এই সময়ে, "আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনো ইচ্ছে করিনে যে গ্রাম্যতা আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামবাসীর বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত, বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়—যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতি কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।"

আমাদের দেশের গ্রামগুলি যাহাতে শহরের উচ্ছিষ্ট উদ্বৃত্ত-ভোজী না হইয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করিতে পারে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কামনা। সঙ্গীত, কাব্যে, কথায়, পূজা-পার্বণ-অনুষ্ঠানে, আনন্দে, শিক্ষায়-দীক্ষায় একটি সুমিত সৌন্দর্যে গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলে দেশে বিদেশে ভারতের যে অবমাননা তাহা ঘুচিয়া যাইবে, তাহাতে কবিগুরুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই তিনি লোকশিক্ষার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাতে ছিল গণসাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নাট্যকলা, শিল্পকলা ও চারুকলার প্রয়োগ ও প্রসারের ব্যবস্থা—যাহাতে একদিকে দেশের ছেলে-মেয়েরা সুশিক্ষিত, নিপুণ, অর্থকরী-কর্মে-কুশল পুরজন-রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে, অন্যদিকে তাহাদের দেহ, মন ও আত্মার অভিব্যক্তির দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টির যে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিবে তাহাতে ধর্মের পুষ্টিসাধন হইতে পারে। এইভাবে বিদেশীর নিকটেই হউক কি স্বদেশী লোকের কাছেই হউক ভারতের কেহ আর প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবে না কিন্তু কৃতীপুরুষ বেশে দাঁড়াইবে, তাহারই চেষ্টায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

দেশের লোকের এই সর্বাঙ্গীন বিকাশ কেবলমাত্র সমবায় প্রণালীতেই ঘটিতে পারে; এইজন্য জনসাধারণকে শক্তিসমবায়ের সাধনাতে আহ্বান করিলেন গুরুদেব। এই সাধনায় যাঁহারা ব্রতী হইবেন—এই শিক্ষা যাঁহারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রসার করিবেন তাঁহাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কি নির্দেশ তাহাও তাঁহার সাহিত্যে অতি সুস্পষ্ট। যে অশিক্ষিত অনুন্নত

ব্যক্তিদের ইহারা শিক্ষা দিবেন তাহাদের প্রতি থাকিবে শ্রদ্ধা। অনুকম্পা, অহঙ্কার বা আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে গেলে যে সেবার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, দয়ার দান যে মূর্খেও বোঝে একথা কবি বারবার মনে করাইয়া দিতেন তাঁহার কর্মীদের। তিনি বলিয়াছেন যে জনসেবার মূলমন্ত্র হইবে "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্।" কবির এই সতর্ক-বাণী আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন,

"যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
সবারে না যদি ডাক এখনো সরিয়া থাক
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

আরও একটি কথা সর্বদাই কবির মনে জাগিত। জীবিকাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে মানুষকে সভ্য বলা যায় না। জীবিকার জন্য সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর মানুষ আরও কিছু চায়। এমন একটি অবসর-বিনোদনের উপায় খোঁজে মানুষ যাহাতে সে আপনাকে ভুলিতে পারে। আনন্দ ও বিশ্রামের উৎসে স্নান করিয়া শরীর ও মনকে সতেজ ও সবল করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় হইল অবসরকাল। এছাড়া দুর্ভাগ্যের দাসত্ব, অপমানের জ্বালা, সারাদিনব্যাপী ঠেলাঠেলি হইতে প্রত্যেক দিনই মানুষ একবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে চায়। অবসর-বিনোদনের দ্বারা মানুষ যে তৃপ্তি পায় তাহার মূল্য একদিন আমাদের সমাজ বুঝিয়াছিল বলিয়াই তাহার জন্য প্রভূত অয়োজনও করিয়াছিল। কেননা, তখন সমাজ জানিত যে দেশের বিপুল জনসাধারণই দেশের শক্তি—তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিলে দেশ বাঁচিয়া থাকে। এবং একথাও মনে রাখিতে হইবে যে যথেষ্ট পরিমাণে অবসর না থাকিলে সত্যকারের শিল্পকলাও গড়িয়া উঠিতে পারে না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই কবিগুরু আশ্রম বিদ্যালয়ে প্রচলন করিলেন ঋতু-উৎসবগুলি। অবসর বিনোদনের জন্য আশ্রমবাসীদের আশ্রমের বাহিরে আর উপায় খুঁজিতে যাইতে হইবে না—তাঁহারা

নিজেরাই গড়িয়া তুলিবেন তাঁহাদের অবসরযাপনের উপায়। এই ঋতু-উৎসবগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব। বর্ষামঙ্গলের সহিত কবি পরে আরও দুইটি অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করেন; সে দুইটি হইল হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ। কিছুদিন পরে নবান্ন পার্বণটি আর একটি আনন্দময় উৎসব-অনুষ্ঠানরূপে আশ্রমে প্রচলিত হইল। অনেক উৎসব আমাদের জীবনে আচারমাত্রে পর্যবসিত হইয়া অর্থহীন হইয়া গিয়াছে, অনেক অনুষ্ঠান গতানুগতিক ধারায় আমাদের সমাজে সম্পূর্ণরূপে তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে—এ সকলই গুরুদেব আপনার অন্তররসে অভিষিক্ত করিয়া তাহাদের প্রাণবন্ত করিয়া তুলিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানে আশ্রমবাসিগণ যেমন আনন্দ পাইতেন তেমনি ইহাদের প্রস্তুতির জন্য তাঁহারা নানাভাবে ব্যস্ত থাকিতেন। বিনা শিক্ষায় ও মহড়ায় এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি তো কোনমতেই সার্থক হইতে পারে না, কাজেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণ আবৃত্তি, অভিনয়ে, বাদ্য-গীত-নৃত্যে মুখরিত হইয়া উঠিত—বালক-বালিকা ও অধ্যাপকগণের সমাবেশে। যাহাতে তাঁহারা অন্তর দিয়া এই উৎসবগুলির সৌন্দর্য ও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন তাহার জন্য গুরুদেব তাঁহার কত সময় ও ক্ষমতা ব্যয় করিয়াছেন এই সকল কাজে তাহার সাক্ষ্য পাই সেই বিগতদিনের সাক্ষী যাঁহারা আজও বাঁচিয়া আছেন আমাদের মধ্যে—তাঁহাদের কাছে।

যে ঋতুসঙ্গীতের ভাণ্ডার আজ আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—তাহা সঞ্চিত হইতে সুরু হইয়াছিল এই সময়ে। বৃক্ষরোপণের বিখ্যাত গান "আয় আমাদের অঙ্গনে; মরুবিজয়ের কেতন উড়াও; ফুল বলে ধন্য আমি"; হলকর্ষণের গান—"আমরা চাষ করি আনন্দে; ফিরে চল মাটির টানে",—শিল্পোৎসবের গান—"নমো নমো যন্ত্র; সব কাজে হাত লাগাই মোরা" ইত্যাদি রচিত হইয়াছিল সেই আনন্দময় দিনগুলিতে। ইহারা যেমন দিকে দিকে আজ দেশের মনোরঞ্জন করিতেছে তেমনি দেশের আত্মাকে উদ্বুদ্ধও করিতেছে নূতনের আহ্বানে।

এই সকলের মধ্যে একটি গভীরতর কথা আছে। যে মানুষের আত্মাকে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, মানুষের যে শিল্পীমনটি জীবনের ভারে চাপা পড়িয়াছে সেই শিল্পীমনটিকে কবি মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন এই উৎসবগুলির সাহায্যে। "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই কথাটিই বড় হইয়া উঠে উৎসবের

দিনে, "সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্ম ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মান দান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসন দান করে। কারণ, আত্ম-পর ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য—এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসব-দিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর।" তাই গুরুদেব বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসব-সম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।"

যাহাতে ভারত আর দীন ও রিক্ত বেশে অবহেলায় দিন না কাটায় তাহারই সাধনায় রত হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের সম্পদ, ভারতের সৌন্দর্য, ভারতের শক্তি, ভারতের ভাষা—এ সকলই সর্বতোভাবে উজ্জ্বল করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন তিনি। তাই তিনি বিদ্যা ও শিল্পকে আশ্রয় করিয়া জীবন-গঠনের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার আশ্রমে। তাঁহার আদর্শমত পূর্ণ মনুষ্যত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত এক একটি ব্যক্তিকে দেশের কাজের জন্ম প্রস্তুত করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, বিশ্বভারতীর আদর্শে যে মানুষ গড়া হইবে তাঁহারাই কবিগুরুর চিন্তাধারা প্রবাহিত করিবে সমস্ত দেশের মধ্যে—দেশকে রূপান্তরিত করিবে সেই আদর্শে। একটি সংস্কৃতিময় জীবন-চর্চায় দেশের সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূরে যাইবে—সর্বত্র দেখা দিবে শরীরে ও মনে উন্নত এক মানুষ—যে মানুষ বিশ্বসমাজে আপনার স্থান করিয়া লইবে অসঙ্কোচে —জগৎ-সভায় আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে ভারত আপনার গৌরব-মহিমায়।

কবির সম্মুখে এই লক্ষ্যটিই ছিল ধ্রুবতারার ন্যায়। তিনি যেমন তাঁহার ভাবজীবনকে রূপ দিলেন সংগঠনে, চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করিতে বসিলেন কর্মযজ্ঞে, তেমনি তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেও সংগ্রাম চালাইলেন তাঁহার বাণীর সাহায্যে। যুগের যে বাণী তিনি প্রকাশ করিলেন তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতের মাধ্যমে তাহাই সেদিন প্রেরণা জুগাইয়াছে দেশকর্মীদের, সান্ত্বনা দিয়াছে দুঃখে, সঞ্জীবনী সুধায় সঞ্জীবিত করিয়াছে তাঁহাদের অবসন্ন মনকে। পরশাসন-লাঞ্ছিত দেশের দুর্দশার কথা তিনি বলিয়াছেন তাঁহার হৃদয়রক্তের ভাষায়, দেশ-প্রেমের তীব্র শিখা জ্বালাইয়াছিলেন তাঁহার অগ্নিময়ী কবিতায়। যে-কথা রাজনৈতিকগণ মঞ্চে দাঁড়াইয়া সোজাসুজি-ভাবে বলিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল—যে কথা অনেকেই বলিতে সাহস

রাখিতেন না।—সেই কথাই কবি বলিলেন তাঁহার সাহিত্যের মাধ্যমে। হিন্দু-মেলার যুগ হইতেই কবি স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন দেশের নানা অনুষ্ঠানের জন্য। "একি অন্ধকার এ ভারতভূমি"; "ও গান গাস্ নে গাস নে"; "শোন শোন আমাদের ব্যথা," বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ও পরে কবি যে-বহুসংখ্যক স্বদেশী গান রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে "বাংলার মাটি বাংলার জল"; "এবার তোর মরা গাঙে"; "আমার সোনার বাংলা"; "ও আমার দেশের মাটি"; "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে"; "যদি তোর ডাকে শুনে কেউ না আসে"; ইত্যাদি। এই বাণী যেমন একদিন ভারতের দেশসেবককে প্রেরণা দিয়াছিল তেমনি মহাত্মাজীকেও শক্তি দিয়াছিল তাঁহার জীবনের বহু সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে।

"জনগণমন অধিনায়ক" সঙ্গীতটি রচনা করা হইয়াছিল ১৩১৮ অথবা ১৯১১ সালে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে স্বদেশীযুগের এই গানগুলির অধিকাংশই সারি, বাউল, ভাটিয়ালি ইত্যাদি লোক-সঙ্গীতের সুরে রচিত। এগুলি বাংলার নিজস্ব সুর। সর্বসাধারণের নিকটে এই গানগুলির সাহায্যে যাহাতে দেশের বাণী পৌছিতে পারে এবং দেশের লোকের মর্মকে যাহাতে স্পর্শ করে এই উদ্দেশ্যেই বাংলার নিজস্ব সুরে কবি এই গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, এইখানেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা। কি অনিন্দ্য-সুন্দর ভাষায়, কি অপূর্ব কৌশলে, মনের কি একাগ্রতা ও নিষ্ঠায় তিনি দেশের আত্মাকে জাগাইয়া তুলিলেন। দেশকে উদ্ধার করা, তাহার বন্ধন-মোচন করা তো একলার কাজ নহে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজ নিজ পথে দেশের বন্ধনদশা ঘুচাইতে ব্যগ্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিলেন তাঁহার বাণীর দ্বারা, কেননা, "পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে তবে তাহা প্রেম।"

এই লোকসঙ্গীতগুলি সম্বন্ধে আরও কথা আছে। যে-সঙ্গীত আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে আপনার প্রাণধর্মের তাগিদে, তাহা সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে বাদ দিলে জাতীয় সঙ্গীতভাণ্ডার যে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন। সহজ সুরে, সহজ ভাষায় গভীর তত্ত্বের কথা প্রকাশ পাইয়াছে আউল বাউল দরবেশদিগের এই রচনাগুলির মধ্যে। ইহাদেরই ভিতরে আমরা পাই বাংলাদেশের নিজের কথা

—নিজের সুর। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এইসব গানকে সেকালে অন্ত্যজ-জ্ঞানে অবহেলা করিতেন কিন্তু কবি অতি সহজেই এই সব গানের কথা ও সুরের মধ্যে একটি চমৎকার সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মহিমায় তাহাদের মণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। এই সঙ্গীতগুলির হৃদয়াবেগ যেমন দূরব্যাপী, ইহাদের আবেদন তেমনই সত্য ও গভীর। তাই দেখি একদিন যাহা ছিল নিতান্তই অনাদরের বস্তু তাহাই কবির জাদুস্পর্শে জাতের এক অপূর্ব সম্পদে পরিণত হইল।

লোকশিক্ষার কাজ কবির এইখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। তাহা আরও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল দেশের প্রান্তসীমায় গুরুদেবের ছোটগল্প, নাটক ও কবিতার সাহায্যে। ভুলিলে চলিবে না যে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ সাহিত্যিক ও কবি এবং তাঁহার অমোঘ অস্ত্র হইল তাঁহার লেখনী। তিনি দেখিয়াছিলেন বাঙলা সাহিত্যের কৃত্রিমতা ও তাহাতে প্রকৃত প্রাণের স্পর্শের অভাব। শহরবাসী সাহিত্যিকেরা কাব্যে ও উপন্যাসে যতই বাংলাদেশের দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত করুন না কেন, সেই দুঃখ প্রত্যক্ষভাবে না দেখিলে অন্তরের সহিত অনুভব করা সম্ভব নহে। একমাত্র শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই মর্মস্পর্শী অবস্থার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া কবিগুরুর ছোটগল্পে। জনসাধারণের ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনা ও বিচিত্র সম্ভাবনাগুলি সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে তাহাদের সংস্পর্শে আসা চাই। সেই সুযোগ কবির আসিয়াছিল তাঁহার জীবনের প্রথম দিকেই এবং মন যখন উন্মুখ হইয়াছিল দিতে ও নিতে—তখনই বাংলাদেশের সহিত তাঁহার পূর্ণ যোগাযোগ ঘটিল এবং মানুষকেও তিনি দেখিলেন পূর্ণ দৃষ্টিতে।

এই সময় হইতেই কবি পল্লীজীবনের পটভূমিকায় সাধারণ নরনারীর সুখ-দুঃখের কথা ও দৈন্য-দুর্দশার সমস্যাগুলি লোকের চক্ষে তুলিয়া ধরিলেন তাঁহার ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও কাব্যের সাহায্যে। তবে একথা বলিলে ভুল হইবে যে কবি কেবলমাত্র কালের সমস্যা জানাইবার জন্যই তাঁহার গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন। কেননা, যে আনন্দ-বেদনা, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, যে সমস্যাগুলি তাঁহার কাহিনীতে ধরা পড়িয়াছে তাহাদের আবেদন চিরকালেরই—তাহা সমগ্রকালে সকল মনুষ্যের হৃদয়ের কথা। তবে একথাও সত্য যে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিবার সময়ে দেশের যে অবস্থা

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন তাহার বিচিত্র স্বাক্ষর অনিবার্যভাবে তাঁহার কথাসাহিত্যে ধরা পড়িয়াছে। প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার সংঘাত, আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনে মানবিক সম্বন্ধের যে জটিলতা বা অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও সচেতনভাবেই তাঁহার রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সঙ্গম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌচেছিল আমার হৃদয়ে, মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সঙ্কল্প বেঁধে তুলেছি। সেই সঙ্কল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা।"

উদাহরণস্বরূপে ধরা যাক "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পটি। ১৩০১ সনের আশ্বিন-কার্তিক মাসে এই কাহিনীটি লিখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ে তিনি প্রায়ই মফঃস্বলে থাকিতেন এবং ইংরাজ কর্মচারীদের অত্যাচারের যথেষ্ট পরিচয় পাইতেন। সেই সব উৎপীড়নের কাহিনী ও গ্রামবাসীদের চরিত্রের দুর্বলতা এই গল্পটিতে বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শশিভূষণের জীবন-স্রোত এক অত্যাচারী ইংরাজ কর্মচারীর চক্রান্তে ও দেশের লোকের ভীরুতায় কিভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল তাহার বর্ণনা পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারি কবির হৃদয়ে কি বেদনা—দেশের লোকেরা কি অসহায়, তাহাদের চরিত্রের কি দৈন্য। ১৩০০ সনে তিনি লিখিয়াছিলেন "এবার ফিরাও মোরে"; ১৩০১ সনের ভাদ্রমাসে তিনি লিখিলেন, "অপমানের প্রতিকার" আর সেই বৎসরই আশ্বিন-কার্তিক মাসে লিখিলেন "মেঘ ও রৌদ্র" নামক ছোটগল্পটি। শশিনাথ ইংরাজের কাছে বেশি না স্বদেশীয়দের হাতে বেশি লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন তাহাই এখানে বিচারের বিষয়। বাঙালী বিচারক—সাহেব ও বাঙালীর মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় অপরাধী সাহেবকে কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া দিলেন, তাহাও নিতান্ত ভয়ে ভয়ে; কিন্তু স্বজাতিকে শাস্তি দিলেন কিভাবে তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে অতি লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে।

তিনি লিখিলেন, "আমাদের স্বজাতিকে যে-সম্মান আমরা দিতে জানি না, আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরেজ আমাদিগকে সাধিয়া দিবে। * * ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল ও প্রধান কারণ আমাদের নিজেদের স্বভাবের মধ্যে—গভর্ণমেণ্ট কোনো আইনের দ্বারা, বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবে না।" এই সঙ্গে "রাজটিকা" গল্পটিকে জুড়িয়া দিলে দেখা যাইবে যে রাজখেতাবের জন্য লোকে প্রায় উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিত তখনকার দিনে এবং সেই চাটুকারবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ কি হীন চক্ষেই না দেখিতেন। নিজে কত সহজেই এই রাজটিকা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কি প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বিদেশী প্রভুর অত্যাচারের প্রতি। কি গভীর মনোবেদনা প্রকাশ পাইয়াছিল দেশের লোকের অসহায় অবস্থা দেখিয়া, কি চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন তিনি তাঁহার এই ত্যাগে—এ সকলই আজ ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। তিনি যে কেবল কাব্যরচনার রসেই ডুবিয়া ছিলেন না—সমাজসংস্কারের কাজেও ডুবিয়া ছিলেন, তাঁহার সমস্ত রচনাতে দেশের লোকের জন্য কোন-না-কোন বাণী ছিল—যাহার দ্বারা দেশের মানুষ তাহার চিত্তসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া জগতসভায় দাঁড়াইতে পারিবে একথা আজ স্বীকার না করিলে তাঁহার জীবনের অর্ধেক কথাই বলা হইল না।

তাহার পর ধরা যাক "দুর্বুদ্ধি" গল্পটি। কাহিনীর নায়কদ্বয় হইল পল্লীগ্রামের "নেটিভ" ডাক্তার ও দারোগা। তাহারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহায় ও বন্ধু। ফলে পরস্পরের মধ্যস্থতায় তাহাদের উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল—এরূপ ঘটনা যে চারিদিকে কত ঘটিয়া থাকে তাহা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই এবং একথা তাঁহার ছোটগল্পের সাহায্যে প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইভাবে তিনি সমাজের যাহা কিছু দূষণীয়, যাহা কিছু ক্ষতিকর তাহার বিরুদ্ধে কতবার তাঁহার লেখনীবেত্র উঠাইয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তবুও তাঁহার লেখার মধ্যে কেবলই অভিজাতবর্গের কথা শুনা যায় বলিয়া একটি অভিযোগ মাঝে মাঝে তাঁহার কানে আসিয়াছে। তাহাতে কবি লিখিয়াছেন, "আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অ-সাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনই যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না।"

আবার অনেকে একথাও বলিয়াছেন যে নদীস্রোতে ভাসমান নৌকা হইতে তীরভূমির পল্লীদর্শনের যে অভিজ্ঞতা তাহা বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড—কাজেই যে-

কথা কবি লিখিয়াছেন তাহা বাংলার সম্পূর্ণ চিত্র নহে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে যাহা সাধারণ লোকে সহজে হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা রবীন্দ্র-প্রতিভা চকিতে দেখিয়াই মানসপটে আঁকিয়া লইতে পারে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন এ সম্বন্ধে, "এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা, একটি মেয়ে নৌকা করে শ্বশুর-বাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগলো, আহা যে পাগলাটে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর না-জানি কি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে—সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায় তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হলো শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু দেখেছি—বাকীটা লিখেছি কল্পনা করে। * * * কিন্তু যা কিছু লিখেছি—নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি—সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা * * * ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"

সমালোচকদের মধ্যে এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে রবীন্দ্রনাথের লেখাতে, বিশেষ করিয়া গল্পগুচ্ছের কাহিনীগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে "সমাজ-চৈতন্য" নাই। এই কথা রবীন্দ্রনাথের কানে আসাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল, নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানব-জীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে, কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে—সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্র-তন্ত্র নয়।" বিষয়টি তিনি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, "আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন, তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এলো। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন।"

যাঁহারা বাংলাদেশের সত্যরূপ জানেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পল্লীজীবনের কাহিনীগুলি পড়িয়া কখনই বলিবেন না যে এই অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের মনগড়া। এইসব মানুষগুলিকেই কবি বাস্তবে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই সেই অভিজ্ঞতাকে লেখার মূল উপাদান-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া তিনি দেশের প্রকৃত অবস্থা পাঠকের নিকটে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ছিন্নপত্রে এক স্থানে পড়ি, "যখন গ্রামে চারিদিকে জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ে বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা সরু, রুগ্ণ ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির-জলের উপরে একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়, তখন সে দৃশ্য কোনোমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না, এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য্য, দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়?"

"অনধিকার প্রবেশ" গল্পটির সাহায্যে কবি কি গভীর আঘাত দিয়া আমাদের সমাজচৈতন্য জাগাইয়া তুলিতেছেন তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। হামারগ্রেন নামে এক সুইডিশ যুবক বাংলাদেশে সেবার কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। নিরন্তর অনিয়মে পরিশ্রম করিয়া অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু-কালে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন হিন্দুর ন্যায় তাঁহার দাহকার্য হয়। একদল লোকের বিরোধিতায় তাঁহার সেই অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া "বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য" নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সেই মাসেই "অনধিকার প্রবেশ" নামে গল্পটিও প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের সাহায্যে বলিতে চাহিয়াছেন যে হামারগ্রেন হিন্দুসমাজে অনধিকার প্রবেশ-অধিকার চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু যখন অপবিত্র শূকর শুদ্ধাচারিণী জয়কালীর পরম পবিত্র মন্দিরে জীবনরক্ষার জন্য অনধিকার-প্রবেশ করিল, তখন তিনি সকল আচার বিচার তুচ্ছ করিয়া উন্মত্ত ডোমদের হাত হইতে শূকরটিকে রক্ষা করিলেন। কবি লিখিলেন, "এই

সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজ-নামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতা নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।" জয়কালী পরনিন্দা, ছোট কথা ও নাকিকান্না অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। পল্লীবাসী যে ভদ্রপুরুষেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অগাধ আলস্যে দিন কাটাইত তাহাদের প্রতি তিনি ধিক্কার প্রকাশ করিতেন তাঁহার নীরব ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষের দ্বারা। গ্রামের একটি অতি অবাঞ্ছনীয় অথচ নিত্য পরিচিত অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সচেতন করিয়া দিতেছেন—ইহাই হইল কথাসাহিত্যের সাহায্যে সমাজচেতনা দান।

গল্পগুচ্ছের প্রায় প্রত্যেক গল্পের মধ্যেই কবির এই বাণী আছে। "ঘাটের কথায়" বালবিধবা কুসুমের অবস্থা যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, "পলাতকা" কবিতাগুচ্ছের "নিস্কৃতি" কবিতায় সেই একই কথা কি শুনিতে পাই না আমরা? অনেক অন্য সাহিত্যিক বালবিধবা কিংবা বিধবার অসহনীয় দুঃখের কথা লিখিয়াছেন বটে কিন্তু সেই সমস্যার সমাধানের কথা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের "নিস্কৃতি" কবিতাতে মীমাংসার কথাও আছে—বর্তমান যুগে তাহা গ্রাহ্য করাই যুক্তি ও বুদ্ধিসঙ্গত। "দেনা-পাওনা" গল্পে পণপ্রথার নির্মমতা, "তারাপ্রসন্নের কীর্তি"তে লেখকের দুর্দশা, "ত্যাগ" গল্পটিতে জাতিবিচারের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমাজকে সচেতন করিয়া দিতেছেন। কাবুলীওয়ালার গল্পে এক পিতৃত্ববোধের দ্বারা কলিকাতার শিক্ষিত নাগরিক পিতা ও অশিক্ষিত খুনী কাবুলিওয়ালাকে পরস্পরের নিকটে আনিয়াছেন। কলিকাতাবাসী পোস্ট-মাস্টারের আত্মীয়-স্বজনহীন নিঃসঙ্গ প্রবাসবেদনায় আমাদের অচেতন মনকে স্পর্শ করিয়াছেন যেমন করিয়াছেন "ছুটি" গল্পে—পল্লীগ্রামের ছেলেকে মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া শহরে আনিয়া দেখাইয়াছেন তাহার কি মর্মান্তিক নিঃসঙ্গ অবস্থা।

"হৈমন্তী" গল্পে একান্নবর্তী পরিবারের প্রাচীন দুর্ভেদ্য দুর্গে আসিয়া গিরি-লালিত শিশিরবিন্দুটুকু শুকাইয়া গেল। কি সুগভীর ধিক্কারে রবীন্দ্রনাথ হৈমন্তীর স্বামীর মুখ দিয়া বলিতেছেন, "যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা তাহা কি করিতে আছে?" "স্ত্রীর পত্রে" দেখি সেই দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রাচীর খসিয়া পড়িতেছে। মেজো বউ মৃণাল বুঝিয়াছে যে নারীর চরম বিকাশ কেবল পত্নীত্বে নহে, তাহা কেবল নারীত্বের

একটি অংশমাত্র এবং সেই একই কথা কবি "মুক্তি" কবিতাতে আরও সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন। মেজো বউএর পত্রে তিনি সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন যে নারীর পূর্ণ মর্যাদা তাহার নারীত্বে। এখন হইতে নারী সেই পূর্ণতার সাধনায় ব্রতী হইবে। নারী বলিতেছে, এতদিন—

"জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ [illegible] বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।"

সেই নারীই আজ বলিতেছে,

"আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠেছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহিয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা-ওঠা
মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা।"

অসহায়, অবহেলিত নারীর মধ্যেও কবি মনুষ্যত্বের উদ্বোধন দেখিয়া বারাঙ্গনার মুখ দিয়া বলিতেছেন,

"ধন্য রে আম ধন্য বিধাতা
সৃজেছো আমারে রমণী করি।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।"

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীই আবার বলিতেছে,

"ছেড়েছি ধরম লজ্জা সরম
জানিনে জীবনে সতীর প্রথা
তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা?"

"বোষ্টমী" গল্পে যেমন একদিকে সমাজের কলুষ কালিমা প্রকাশ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তেমনি তিনি দেখাইয়াছেন যে নারীত্ব গুরুবাদ-ধর্ম

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নারীত্বের চরম প্রকাশ দেখি "অপরিচিতা" গল্পের কল্যাণীর মধ্যে। কল্যাণীর পিতা শম্ভুনাথ সেন বাংলাদেশের যাবতীয় বর ও বরকর্তাকে এক বিরাট ধাক্কা মারিয়াছেন। বরকর্তার অসহনীয় জুলুম সহ্য করিতে না পারিয়া পিতা বরকে আসর হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন, একি কম সাহসের কথা! নারীর পক্ষে সংসারে যে অন্য পথ খোলা আছে এবং সেই পথে যে পরিপূর্ণভাবে নারী মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে—সমাজকে যে এরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—পিতা ও কন্যার দ্বারা গুরুদেব ইহাই বলিতেছেন। তাহার পর "নষ্টনীড়" গল্পটি দেখা যাক। কি সুগভীর আবেদন এই কাহিনীতে। নিঃসন্তান নারীর হৃদয় উজাড় করিয়া দিতে চায় তাহার ভালবাসা—লইতে যে কেহ নাই! ভূপতি যদি চারুকে নিজের কাজের সঙ্গী করিয়া লইত তাহা হইলে দুজনকেই এমন অসহ দুঃখ সহ্য করিতে হইত না। যে ভালবাসা ভূপতিকে ঘিরিয়া বাড়িয়া উঠিত সেই স্নেহ-তরুলতা বাড়িয়া উঠিল অমলকে ঘিরিয়া। সমাজকে আর কত চেতনা দিবেন রবীন্দ্রনাথ?

আবার দেখি বঙ্গভঙ্গ রঙ্গক্ষেত্রে কত শত চরিত্রের আবির্ভাব—তাহারা মুখে সমাজ-সংস্কারের বড় বড় কথা বলিতেছে অথচ কাজের সময়ে মনুষ্যত্ব হইতে সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে প্রবল। যথা, "না-মঞ্জুর" গল্পের অনিল অমিয়াকে বিবাহ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প কিন্তু যেমনই সে অমিয়ার হীনজন্মের ইতিহাস শুনিল অমনি শুকাইয়া গেল তাহাব প্রেম—জন্মগত সংস্কার তাহার প্রেমের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। "সংস্কার" গল্পেও দেখি স্বামী যখন পাড়ার লোকের দ্বারা উৎপীড়িত মেথরকে গাড়িতে তুলিতে যাইতেছেন খদ্দরধারিণী মিটিংযাত্রিণী স্ত্রী কলিকা বলিলেন, "মেথরকে গাড়িতে নিতে পারিব না।"

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধান আশ্রয় ছিল গ্রাম, পৈতৃক জোতজমি এবং বিষয়সম্পত্তি। ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসীরা যে চাকুরিজীবী হইয়া পড়িতেছে তাহারও বহু উদাহরণ আছে কবির সাহিত্যে। "হালদার গোষ্ঠী"তে দেখি বনোয়ারীলাল একাকী চাকুরি খুঁজিতে বাহির হইল। এছাড়া জমিদারবংশেরও কিভাবে ক্রমে ক্রমে ভগ্নদশা ঘটিতেছে তাহা শানিয়াড়ী চৌধুরীবাবুদের ও নয়ানজোড়ের জমিদার বংশের কাহিনীতে পাই। জমিদারী ব্যবস্থা একটি কুপ্রথা বটে কিন্তু সমাজ রচনায় ও রক্ষায় জমিদারদিগের বহু দান আছে—তাহা যে ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে

এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সেই কর্তব্যগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইবে ইহার জন্যও সমাজকে প্রস্তুত করিলেন রবীন্দ্রনাথ।

কবির কথাসাহিত্যে যে কত প্রকার সামাজিক শ্রেণী ধরা পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেদিন ছিল দ্রুত পরিবর্তনের যুগ—তাহার বেগের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক সমস্যা, তাহাদের বৃত্তি, সুখ-দুঃখ, সংস্কার-কুসংস্কার, মান-অভিমান প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ঔজ্জ্বল্য ও মালিন্য সমভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহার লেখনী প্রকাশ করিয়াছে বত্রাওনের নবাবপুত্রী বা শা সুজার কন্যার মনের কথা, যেমন করিয়াছে দিনমজুর রুই পরিবারের সমস্যার কথা। যে-কথা দেশ মনে-প্রাণে অনুভব করিতেছিল অথচ ব্যক্ত করিবার ভাষা পায় নাই—যে সমস্যাপীড়িত জর্জরিত সমাজদেহ দিনে দিনে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, যে পরাধীন দেশে মানুষের আত্মা সঙ্কুচিত হইয়া মানুষের সম্বন্ধকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছিল অথচ মুক্তির উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না—সেই নানা অন্তর্দ্বন্দ্বভরা জটিল সমস্যাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ কেমন সহজে প্রকাশ করিয়া দেশের রুদ্ধ বাতায়নগুলিকে খুলিয়া দিলেন। তিনি মনীষী, যুগের আবর্তনে যে নূতন পরিস্থিতির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা জরামুক্ত বলিষ্ঠ মনের সহিত গ্রহণ করা যে দেশের লোকের কর্তব্য তাহাই কবি বুঝাইয়া দিলেন তাঁহার সাহিত্যের সাহায্যে। ইহাই তাঁহার লোকশিক্ষার পথ—লোকগুরু রবীন্দ্রনাথের যুগবাণী।

জনশিক্ষার কাজ যে কেবল কবিতা ও ছোটগল্পের সাহায্যেই প্রসারিত হইয়াছিল একথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার নাটক ও উপন্যাসেও যুগের বহু সমস্যা ও তাহার সমাধান পাওয়া যায়। "তপতী", "প্রায়শ্চিত্ত", "মুক্তধারায়" দেখি রাষ্ট্র অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের প্রতিবাদ। "গোরাতে" দেখি মধ্যবিত্তের দুর্দশা-মোচনে গোরা নামিয়াছে সংগ্রামে। ধনিকসম্প্রদায়ের নিষ্পেষণে, কলের যুগে ব্যক্তি হারাইয়া গিয়াছে একটি সংখ্যা বা যুনিটের মধ্যে,—মানুষের আত্মা এই শ্রান্তিকর পরিণতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ করিতেছে তাহা বিদ্রোহের আকারে দেখা দিয়াছে "রক্ত করবীতে"। অবশেষে "কালের যাত্রায়" রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন শূদ্রদের জয়। প্রথমে মাভৈঃ রবে তিনি গাহিলেন,

"ভয় নাই তোর ভয় নাই ওরে ভয় নাই,—
কিছু নাই তোর ভাবনা—

দক্ষিণ-পবন দ্বারে দিয়ে কান
জেনেছে রে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।"

তাহার পরে বলিলেন, "ওরাই আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ * * * এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।" "সভ্যতার সঙ্কটে" ও সেই একই কথা বলিলেন কবি শাসক-সম্প্রদায়কে এবং সেই প্রবন্ধেই সমস্যার সমাধান দিয়াছেন তিনি।

"এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় যে বাণী দিয়াছেন কবি সেই একই বাণী শুনি "রাজা ও রাণী"র পুরোহিত দেবদত্তের মুখে। রাষ্ট্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজা রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে ভীতিবিহ্বল বিমূঢ় অবস্থায়। এইসব মূঢ়, মূক প্রজাদের দেখিয়া রাণী সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"আহা কে ক্ষুধিত ?
দেবদত্ত—অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হলো না অভ্যাস
এমনি আশ্চর্য।
সুমিত্রা—হে ঠাকুর এ কি শুনি
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে ?
দেবদত্ত—ধান্য তার বসুন্ধরা যার
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুকুরের মতো লোল জিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নয়তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।"

ইহাদের রক্ষা করিবে কে? "প্রায়শ্চিত্তে" দেখি সেই সত্যকার মানুষ দেখা দিল ধনঞ্জয়রূপে, "রাজর্ষি"র বিল্বন চরিত্রে, "অচলায়তনে"র ঠাকুরদা,

"শারোদৎসবে"র সন্ন্যাসী ও "রক্তকরবী"র বিশুর মধ্যে। মানুষেই আনিবে মানুষের মুক্তি। তাই "নবজাতক" কবিতায় কবি এই মানুষকেই আহ্বান জানাইয়া বলিতেছেন—

"কে বলিতে পারে তোমার ললাটে শিখা—
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টীকা
আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।
মানুষের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি বা দিতেছে আনি।"

সেই নূতন মানুষ গড়িতে বসিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি রুদ্র সংগ্রামের পথ নির্বাচন না করিয়া সংগঠনমূলক কর্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহাও সংগ্রাম—কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, শরীরের জড়তা, চিত্তের দীনতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাহা লোকশিক্ষার দ্বারাই হইতে পারে। সেই পথই নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি শিল্পী, মানুষের বিধ্বস্ত, বিকৃত রূপ তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল—তাঁহার কবিমানসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল একটি সুস্থ, সুন্দর, শুদ্ধ, সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ মানুষের চিত্র। সেই মানুষই তাঁহার আদর্শ—তাহাকে তিনি দেখিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনে। তাই কবি শান্তিনিকেতনে স্থাপন করিলেন তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এখানে তপস্যাপূত জীবনচর্চার দ্বারা একটি পরিশুদ্ধ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইলেন তিনি। এখান হইতেই সেই সংস্কৃতির প্রসার হইবে বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে। এই শান্তিনিকেতনের পরিবেশে যে মানুষ তৈয়ারী হইবে তাহারাই বিস্তার করিবে তাঁহার শিক্ষার লক্ষ্য, পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ। তাহারাই দুর্গতদের গড়িয়া তুলিবে নূতন মানুষরূপে—তাহাদেরই প্রেরণায় দেশের সকল অকল্যাণ যাইবে দূরে, গড়িয়া উঠিবে এক মহান সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্বমানবের সমাজ।

॥ ৯ ॥

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া মনে হইল তাঁহাকে হিমালয়ের সহিত তুলনা করিলেই বুঝি ঠিক হয়।

"হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়-পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে।

* * * *

পেয়েছো আপন সীমা, তাই আজ মৌন শান্ত হিয়া
সীমা-বিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছো সঁপিয়া।"

আবার মনে হইল, গঙ্গানদীর সহিত তুলনা করিলেই বুঝি বা তাঁহার প্রতিভার সমুচিত মূল্য দেওয়া হয়। ভারতের গঙ্গা আর ভারতের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি সেই একই বৈচিত্র্যের সমাবেশ। হিমালয়ের সেই তুষারদুর্গম শিখরে, চঞ্চলা গঙ্গার উদ্ভব, সমস্ত উত্তরাপথে তাহার ধীর গম্ভীর গতি, অবশেষে "তালতমালবনরাজিনীলা" সাগরবেলায় তাহার অনন্তের সহিত মিলন—একধারা গঙ্গা সকলের সহিত শুভ সমন্বয়ে নিজেকে পুষ্টতর, গভীরতর, বিস্তৃততর করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, সহস্রধারায় দেশের-দশের সেবা করিয়া ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করিয়া চলিয়া চলিয়াছে ইতিহাসের কোন এক বিস্মৃত যুগ হইতে। তেমনি ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের যুগ-যুগান্তসঞ্চিত তপস্যার ফল ও নবীন যুগের নব ভাবধারাকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার বাণীতে ও কর্মে। নদীর ন্যায় ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সমন্বয় সাধন করিয়াছেন প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের সাম্যের বাণী শুনাইয়াছেন বিশ্বকে—নিজের প্রাণকে প্রবাহিত করিয়াছেন বিশ্বের ঐক্যসাধনে। গঙ্গার ন্যায় তাঁহার বাণী চিরকালের। সেই চিরন্তন সত্যটিই তিনি বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনের দ্বারা—

"যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি
যত কাল আছে বহিতে পারি
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি

তবে আর কিবা চাই
পরাণের সাধ তাই।"

বালককালের হৃদয়াবেগের প্রবলতা, তপ্তবাষ্পভরা মনের বুদ্‌বুদ্‌রাশি কল্পনার স্রোতের টানে প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার কবিতার খাতায়। তাঁহার মনের ভিতরে যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া সুরু হইয়াছিল এই সময়ে, তাহাতে ছিল পার্বত্য নদীর ন্যায় গতির চাঞ্চল্য ও আত্মপ্রকাশের উদ্দাম আবেগ। তখনও বাহিরের সহিত কবিমনের সত্য সম্বন্ধটি স্থাপিত হইবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু যেদিন জগতের সুখ-দুঃখের বিচিত্র খেলাকে কবি অন্তরের মধ্যে আবিষ্কার করিলেন, সেদিন যৌবনের গান নানা সুরে বাজিয়া উঠিল তাঁহার জীবনে। সেই সুর নদীর ন্যায় কখনও বা চঞ্চল কখনও বা স্থির ও গম্ভীর—মানুষের সেবায় নিবেদিত। জীবনলোকের তীরে দাঁড়াইয়া জগতের যে চিত্র দেখিলেন তিনি তাহাতে ছিল প্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপের মধ্যে মানুষের খণ্ডিত প্রকাশ। সেই অসম্পূর্ণ প্রকাশকে কবিগুরু নিজের জীবনে সম্পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইলেন সংযমের দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা। মানুষের বৃহৎ জীবনকে উপলব্ধি করিতে তাঁহার যে গভীর প্রয়াস তাহাই তাঁহাকে প্রতিদিন বুঝাইয়াছে যে মানুষকে সুন্দরের পথে চালনা করাই প্রকৃত শিক্ষার কাজ। ইহা ছাড়া এই সময়ে যে নূতন চিন্তাধারা তিনি পরিবেশন করিলেন বিদ্রোহী বাংলাকে তাহার প্রয়োজন ছিল অনিবার্য। জাতীয় সংগ্রামভূমিতে তাঁহার আবির্ভাবে বাঙালী জাতি তাহার চিন্তা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়াছিল সেদিন, একথা আজ অস্বীকার করা যায় না। তিনি যে কেবল দেশের অন্তরকে এক অনাস্বাদিত রসমাধুর্যে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহাই নহে কিন্তু তাহার বিপ্লবী মনকে প্রস্তুত করিয়া দেশব্যাপী সংগঠনমূলক কার্যের পথ তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন। জীবনবেদীতে ইহাই রবীন্দ্রনাথের আত্মনিবেদন।

জীবনের পথে চলিতে চলিতে যে বিচিত্র ভঙ্গিতে ও বিচিত্র কর্মে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিত্য নবধারায় আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কবিকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।" এই পত্র যখন বসু

মহাশয় লিখিয়াছিলেন তখন কবির জীবন-মধ্যাহ্নের আরম্ভ মাত্র। জীবন-সায়াহ্নে কবি-প্রতিভার যে বৈদূর্য, রবিরশ্মির যে বর্ণালী তাহা দেখিলে চন্দ্রনাথ-বাবু কি বলিতেন জানি না। কবির প্রতিভাকে একসঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে যে কি দুরূহ কাজ তাহা তো সহজেই বুঝিতে পারি। তাই বোধ হয় তাঁহার কর্মের পূর্ণ প্রকাশ লইয়া কোন সর্বাঙ্গীন আলোচনা করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। কেহ তাঁহাকে কেবলমাত্র কবি বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কেহ বা সাহিত্যিক, কেহ কেহ তাঁহাকে দার্শনিক ও ধর্মগুরু বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছেন; কেহ বা আজ মহাশিক্ষকরূপে তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করিতেছেন, কেহ বা নাট্যকার-সঙ্গীত-নৃত্যকলাবিদ রূপে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভায় আছে এই সকল রূপের সমন্বয়, সব মিলিয়াই তাঁহার অখণ্ড সত্তা। তাঁহার সমস্ত বাণী ও কর্মের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র দেখা যায় তাহার মূল কথাটি হইল "মানুষ"। মানুষকে তিনি অবজ্ঞা করেন নাই। যেভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করুন না কেন তাঁহার সমস্ত কর্মেই তাঁহার সৃষ্টিধর্মী মন মানুষের সেবায় নিয়োজিত। রূপে, বর্ণে, গন্ধে, ভাবে, আভাসে, জ্ঞানে, প্রেমে তিনি যাহা কিছু অনুভব ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহারই প্রকাশ হইয়াছে দিকে দিকে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে—তাই আমরা তাঁহাকে পাই কবিরূপে, স্বদেশের সেবকরূপে, আমাদের গুরুরূপে।

তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার সহিত যে অনুপম মনুষ্যত্বের সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহা সংসারে কদাচিৎ দেখা যায়। প্রতিদিনের খণ্ড মানুষকে যেমন দেখি তাঁহার বিরাট সাহিত্যসৃষ্টিতে, তেমনি দেখি তাঁহারই রচনায় মানুষের পরিপূর্ণ রূপ। গোরার মধ্যে যেমন দেখি মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের ছবি—তেমনি দেখি তাঁহার ছোটগল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, দুঃখ-দৈন্য জর্জরিত, আশা-নিরাশায় দোলায়িত মানুষ—সফলতা-বিফলতার গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষ। নিপীড়িত মানুষের প্রত্যেকদিনের কাহিনী যেমন পৃথিবীতে মিথ্যা নহে তেমনি মানুষের আদর্শ-রূপও মিথ্যা নহে। রবীন্দ্রনাথ কাহাকেও উপেক্ষা করেন নাই, কাহাকেও তুচ্ছ করেন নাই, ঘৃণার চক্ষেও দেখেন নাই। "শেষের কবিতা"র অমিত রায়, কেটি, সিসি, লিসির ন্যায় চরিত্র আজ ভারতে নিতান্ত বিরল নহে—তাহাদের কথাও মানুষকে বলিয়া সতর্ক করা প্রয়োজন আবার-"গল্পগুচ্ছে"র নায়ক-নায়িকাদের সুখ-দুঃখভরা জীবন-সমস্যা যাহা আমাদের প্রতিদিনেরই কথা, তাহারও সমাধানের

ইঙ্গিত দার্শনিক কবিগুরুই দিয়াছেন। রবির কিরণ তো কেবল পর্বত-চূড়াতেই কিরণ সম্পাত করে না, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণের বক্ষেও আসিয়া পড়ে। তাই দেখি তিনি কেবল অভিজাতসম্প্রদায়ের কথা বলিয়াই তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন নাই—"পুরাতন ভৃত্যের" দুঃখে তাঁহারই সাহিত্য প্রথম অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। "দুই বিঘা জমি"তে তাঁহারই লেখনী নিরীহ প্রজার অসহায় রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। আকৃতিতে রুক্ষ, কর্কশ কাবুলীওয়ালার অন্তরও যে স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল তাহা কে বলিয়াছে শিক্ষিত, সভ্য মানবসমাজকে? ভৃত্য রাইচরণের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে প্রকাশ তাহার তুলনা মেলে কোন সাহিত্যে? অভিজাতশ্রেষ্ঠ কবি—মানুষের সামান্যতম কথাটিও ভুলিয়া যান নাই। "সমাপ্তি" গল্পে দেখি একমাত্র কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে ঈশান হেড-আপিসের সাহেবের নিকটে ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষ্যটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া, সে পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য সে দেশে চিঠি লিখিয়া দিল। কিন্তু পাত্রের মাতা কহিলেন, "এই মাসে দিন ভালো আছে, আর বিলম্ব করিতে পারিব না।" উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় ঈশান আর কোন আপত্তি না করিয়া পূর্বমত সেই নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে বসিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, নিয়মিত মাল ওজন ও টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল। সাধারণ মনুষ্য-জীবনে এমন কত ঘটনা যাহা সামান্য বলিয়া আমাদের নজরে পড়ে না কবির রচনায় তাহা কত সজীব ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এইখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। মানুষের আরও একটি রূপ আছে, তাহাই তাহার সত্যরূপ। মানুষ জীবনপথের যাত্রী, সৃষ্টির কোন অনাদিকাল হইতে মানুষের এই যাত্রা-প্রবাহ সুরু হইয়াছে—সে চলিয়াছে সম্মুখের দিকে, মহত্তর সার্থকতার দিকে। পথের বিঘ্ন, জীবনের গ্লানি ও নিরাশা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে সত্য, কিন্তু অনন্ত পথ-পরিক্রমায় মানুষ যে আজও শ্রান্ত হয় নাই—সে যে একদিন সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া একটি কল্যাণময় সমাজ গড়িয়া তুলিবে—ইহাতে ছিল কবির ধ্রুব বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মানুষের অন্তরে একদিকে পরম মানব, আর একদিকে স্বার্থ-সীমাবদ্ধ জীব-মানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্য

চেষ্টাই মানবের মনের নানা অবস্থা অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্র-রূপে অভিব্যক্ত। নইলে কেবল সুবিধা-অসুবিধা, প্রিয়-অপ্রিয় থাকতো জৈবিক ক্ষেত্রে, জীবধর্মে; পাপ-পুণ্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোন অর্থই থাকতো না।" এই একই চিন্তা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ছন্দে—

"মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবনসর্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।
কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তব পানে,
ঝড ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

ক্ষুদ্র সীমা হইতে মানুষেব এই যে অসীমের দিকে যাত্রা—তাহা কেবল অন্নবস্ত্রের জন্য নহে, কেবলমাত্র স্থূল ভোগের জন্য নহে কিন্তু দৈনন্দিন সুখ-দুঃখেব মধ্য দিয়া পরমতম সত্যের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার জন্য—ইহাই মানুষের রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন।

তবে কবিকে কেবল তাঁহার বাণীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে তাঁহাকে একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তিনি এই মুমুক্ষু মানব-মনকে যে পথের সন্ধান দিয়াছেন তাহা কেবল তাঁহার সাহিত্যের মাধ্যমে নহে কিন্তু তাঁহার পূর্ণ কর্মের পথে। সর্বভারতীয় ঐতিহ্য হইতে উপাদান আহরণ করিয়া প্রাচীন জীবনধারাকে নবরূপে রূপায়িত ও সঞ্জীবিত করিয়াছেন কবিগুরু, যাহাতে দেশের জীবনযাত্রা হইয়া উঠে সুষ্ঠু ও সুন্দর, সত্য ও অকৃত্রিম। কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী। সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন পাশ্চাত্যদেশের প্রগতি—তাহাদের বস্তুবাদী জীবন দেখিয়া কবির ভারতীয় মন যে বারম্বার কুণ্ঠিত হয় নাই একথা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু সত্যকার প্রগতিমূলক ক্রিয়াকর্ম, বিশেষ করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুমনের উপর শিক্ষকের অধিকার ও প্রভাব দেখিয়া তিনি

নিশ্চিতরূপেই বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে দেশের ছেলেদের মুক্তি নাই। তাই দেখি শিক্ষা-সংস্কারের কাজই ছিল তাঁহার জীবন-মধ্যাহ্নের প্রধান চিন্তা। কিভাবে দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষার আলোকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা যায় যাহাতে সেই আলোকে তাহারা যাহা সত্য, যাহা নিত্য ও শাশ্বত তাহা দেখিতে পাইবে তাহারই প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার কর্ম্মজীবন কাটিয়াছে। সেই আত্মনিবেদিত কর্মপ্রচেষ্টার ফল তাঁহার বিশ্বভারতী এবং তাহারই একটি বিশাল অঙ্গ তাঁহার শ্রীনিকেতন।

একথা আজ সুনিশ্চিত যে বিরাটভাবে পল্লীসংস্কারের চিন্তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম করিয়াছিলেন এবং পল্লীসংগঠনের পুরোধা তিনিই। তিনিই সর্বপ্রথম জনসাধারণের শিক্ষার দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় শ্রীনিকেতনের নানা কর্মধারার দ্বারা বাংলার বহু লুপ্তপ্রায় কুটীরশিল্প পুনরুজ্জীবিত হইয়া আজ বিশ্বের দরবারে স্থান পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "দেশের উন্নতি বলতে বাইরের গুটিকয়েক ছেলেদের শিক্ষাদান নয়; দেশের প্রাণ রয়েছে পল্লীগ্রামে; সেইখানে সেই নিরক্ষর পল্লীবাসীর সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সব অভাব অভিযোগের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে।" এই মহাবাণী তিনি সার্থক কবিয়াছিলেন কার্যের সত্য স্বাক্ষরে—তাহারই সাক্ষ্য আছে শ্রীনিকেতনের শিক্ষাপ্রাঙ্গণে। কুটীরশিল্পের নানা আয়োজনে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে শান্তিনিকেতন-সংলগ্ন গ্রামগুলি—শতাব্দীলাঞ্ছিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কবি ও কবির সহকর্মিগণ নিগূঢ় সত্যের আহ্বানে।

এই যে ব্রত কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার যৌবনপ্রান্তে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই ব্রত তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত। হস্তশিল্পের সাহায্যে গুরুদেব যে কেবল মানুষের জীবিকার উপায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা বলিলে তাঁহার উদ্দেশ্যকে সামান্য করিয়াই দেখা হয়। সত্য করিয়া কলকারখানার কাজে জীবিকার উপায় তো আরও সহজ, আরও অধিক। তবে কেন কবিগুরু কুটীর-শিল্পোন্নয়নের প্রতি এত মনোযোগ দিয়াছিলেন? মানুষ যাহাতে কেবল জীবিকা উপার্জনের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরিয়া না মরে কিন্তু আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া পায়—তাহার মধ্যে যে শিল্পীমন সুপ্ত আছে তাহা যেন সে যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার উপায়

দেখিতে পায় তাহারই জন্য প্রয়োজন নানারূপ হস্তশিল্পের ব্যবস্থা। অনেকের মত হইল যে কলকারখানার কাজে মানুষ অল্প সময়ে অনেক বেশি উৎপাদন করিয়া জীবনের প্রয়োজন সহজে মিটাইয়া যে অবসর পাইবে, সেই অবসরকালে সে ললিতকলার অনুশীলন করিবে। হায়রে দুরাশা! কলকারখানার কাজে তাহার শিল্পীমনটিই যে মরিয়া যায়। জুতার কারখানাতে দেখিয়াছি একটি কারিগর অন্যের আঁকা ছবি দেখিয়া দিনে আট ঘণ্টা কেবল জুতার গোড়ালিই তৈয়ারি করিতেছে। আর একজন কেবল জুতার ফিতার মুখে টিনের পাতে চাপ দিতেছে আট ঘণ্টা ধরিয়া। একটি গোটা জুতা সম্পূর্ণরূপে তৈয়ারি করিবার যে আনন্দ, যে সুখকল্পনা, তাহা উপভোগ করিবার সময় পাইল সে কোথায়? নিজের স্বকীয়তা প্রকাশেরই বা সুযোগ পাইল সে কখন? মানুষের মনই যদি মরিয়া যায় তাহা হইলে তাহার আর বাকী রহিল কি? এই চিন্তাটি কবি-রচিত "স্যাকরা" কবিতাতে কি চমৎকারভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে—

১

কার লাগি এই গয়না গড়াও
যতন ভবে
স্যাকরা বলে একা আমার
প্রিয়ার তরে

২

শুধাই তারে প্রিয়া তোমার
কোথায় আছে।
স্যাকরা বলে মনের ভিতর
বুকের কাছে।

৩

আমি বলি কিনে তো লয়
মহাবাজাই
স্যাকরা ব'ল প্রেয়সীরে
আগে সাজাই।

৪

আমি শুধাই সোনা তোমার
ছোঁয় কবে সে।
স্যাকরা বলে অলখ ছোঁওয়ায়
রূপ লভে যে।

৫

শুধাই, একি একলা তারি
চরণ তলে
স্যাকরা বলে তারে দিলেই
পায় সকলে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

মানুষের জীবিকার সহিত যেন তাহার সংবেদনশীল মনটি জাগিয়া থাকে

যে মনটি মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করিবে, সহানুভূতির দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দর করিয়া তুলিবে—সেই মনটিই গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। ইহাই তাঁহার শিল্প শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ১২৯১ আষাঢ় মাসে "সাধনা" পত্রিকাতে এই মর্মেই কবি লিখিয়াছেন, "নির্ভুল কল ও ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয়, তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয় কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।"

আবার আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ থেকে পোস্টকার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চারদিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এঁটে গয়না গড়চে। ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর। এই কাজের দ্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ করচে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ করচে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্তি দিচ্চে। মুখ্যতঃ এ কাজটি তার আপনারই, গৌণতা যে মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে করে ফল কামনাটা হয়ে গেল লঘুতর, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল, কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে। এককালে বণিককে সমাজ অবজ্ঞা করত, কেননা বণিক কেবল বিক্রি করে, দান করে না। কিন্তু এই স্যাকরা এই যে গয়নাটি গড়লে তার মধ্যে দান এবং বিক্রি একই কালে মিলে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েচে, বাইরে থেকে যোগায়নি। ভৃত্যকে রেখেচি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ একান্ত হলে সেটা হয় ষোল আনা দাসত্ব। যে সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি দরদ হারায় নি, সে সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে করে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জ্যাঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফল-কামনাটা যায় যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি গোয়ালা গরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফল-কামনাকে তুচ্ছ করে দিয়েচে তার ভালোবাসায়; কর্ম করেও কর্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ

গোয়ালা শূদ্র নয়। যে গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখে গরু পোষে, কষাইকে গরু বেচতে যার বাধে না সেই হল শূদ্র ; কর্মে তার অগৌরব, কর্ম তার বন্ধন, সে কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মেই শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে তারা কেউবা শিক্ষক, কেউবা বিচারক, কেউবা শাসনকর্তা কেউবা ধর্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষী আছে, যারা ওদের মতো শূদ্র নয়—আজকের এই রৌদ্রে উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের নারকেল গাছের মর্মরে তাদের জীবন-সঙ্গীতের মূল সুরটি বাজচে। ইতি ২৮শে জুলাই ১৯২৭।"

একদিকে যেমন বয়স্ক লোকের মনটিকে সতেজ সবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে প্রচলিত শিক্ষাধারার নির্মম শিক্ষাবিধি যাহাতে শিশুমনটিকে পিষিয়া না ফেলিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিলেন তিনি। গুরুদেবের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল গুরুকুল আশ্রমের স্নিগ্ধ চিত্র—সেখানে পরীক্ষার পীড়ন ছিল না, সার্টিফিকেট ও জীবিকা সংগ্রহের ভাবনায় শিক্ষা কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে নাই। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডের বাঁধা-ধরা সময়সূচীও ছিল না। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে পিঁজরাপোলও ছিল না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কও শেষ হইয়া যাইত না। এক কথায় বাহিরের আড়ম্বর দিয়া অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঢাকা পড়ে নাই সেদিন। গুরুর চারিদিকে শিষ্যের সমাবেশ হইত তাঁহার মনস্বিতার গুণে—বালক তাঁহার নিকটে পুত্রাধিক স্নেহ-যত্নের বাতাবরণের মধ্যে প্রসন্ন মনে শিক্ষালাভ করিয়া সার্থক হইত। মহাশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সেই বিগত দিনের কথাই ভাবিতেছিলেন যখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "বালকের মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্র-ভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিশু যে অ্যালজেব্রা না কষিয়াই,

ইতিহাসের তারিখ মুখস্থ না করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সেজন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে?"

গুরুদেব নিজেই ইহার উত্তর দিতেছেন, "হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলো, মাতৃগর্ভে দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিও না—তাহাদিগকে দয়া করো।" কেহ যখন তাঁহার কথা শুনিলেন না—কেবল শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই তাহা সকলে গ্রহণ করিলেন তখন তিনি স্বয়ং তাঁহার ভাবকে কর্মের আকার দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই কার্যে তিনি কতদূর সার্থক হইয়াছেন তাহা বিচার করিবার দিন আজ আসিয়াছে।

১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে "কমিশন" গঠিত হয় তাহার সভাপতি ছিলেন স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার। তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিব। সেই সময়ে বিদ্যালয়ের শৈশব অবস্থা—তখনও আশ্রমের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দেশের লোকেরাই সন্দিহান। এমন সময়ে ব্রিটিশ রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে তাৎপর্য দিয়াছেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পরিকল্পনা যে কত সুচিন্তিত তাহারই সত্য সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

কমিশন বলিতেছেন, "বাংলাদেশে বিদ্যালয়কে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হয়। এর সামাজিক দিকটি অবহেলা করা হয়। শিশু যেমন বিদ্যালয় থেকে পাঠগ্রহণের দ্বারা শিক্ষালাভ করে তেমনি সে শিক্ষালাভ করে বিদ্যালয়-সমাজের একজন সভ্য হয়ে। বিদ্যালয়ে এসে শিশুর অনুভব করা উচিত যে সে শুধু শিক্ষকের নিকট থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ গ্রহণ করেই শিক্ষালাভ করবে তা নয়, অধিকন্তু বিদ্যালয়-সমাজের একজন সভ্য হয়ে তার প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে, তার নানা কর্মে অংশ গ্রহণ করে, দায়িত্ববোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে খুশি মনে শিক্ষালাভ করবে। এই ব্যবস্থা যে বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে অসম্ভব এ কথা বলা চলে না। কারণ এইরূপ একটি সুন্দর ব্যবস্থা বোলপুরের বিদ্যালয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।"

আবার দেখি ১৯৩০ সালে অধ্যাপক কিলপ্যাট্রিক "নিউইয়র্ক ইন্টার-

ন্যাশনাল হাউসে” এক বক্তৃতায় বলেন, “আজ আমি কেমন করে সেই বিদ্যালয়ের রূপটি আপনাদের বোঝাব জানি না। বোধ হয় কল্পনা করাও আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে যে,—বনে সত্যকারের গাছতলা তাঁর বিদ্যালয়, বিদ্যা বিতরণের ক্ষেত্র। যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে বৃক্ষরাজি সুশোভিত উন্মুক্ত প্রান্তর—নানা রূপ ফুল ও ফলের বাগান। বড় বড় ইঁট পাথরের তৈরি প্রাসাদ সেখানে মূর্তিমান উৎপাতের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। বৃক্ষরাজির মধ্যে মাথা নীচু করে বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও এতটুকু বেমানান মনে হয় না। সে আশ্রমের বড় কথা—বড় বড় অট্টালিকা নয়—বৃক্ষ। ভারতবর্ষ এই বৃক্ষের মধ্যেই নিজেকে ধরা দিয়েছে।

আপনারা জানেন বোধ হয় ভারতবর্ষে উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রকৃতিদেবী হিন্দুদের প্রাণে যেমন তরো সাড়া দিয়েছেন এমন তরো বোধ হয় আর কোন দেশে দেননি। গাছে গাছে প্রাণের হিল্লোল হিন্দুদের প্রাণে গিয়েই পৌঁছেছে। এভাব অবশ্য কতকটা আমরা জাপানে দেখতে পাই। তার কারণ জাপানে বুদ্ধধর্মের প্রভাব এবং সে ধর্মের জন্ম হিন্দুস্থানেই। কবির কল্পনাপ্রসূত এই বিদ্যালয় কবিরই সৃষ্টি। এখানে জাতিবিচার নেই; স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে মিলে-মিশে এখানে বিদ্যাশিক্ষা করে। মিথ্যা সংস্কারের বেড়া দিয়ে স্ত্রী-পুরুষকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হয় না এই বিদ্যালয়ে।

চারুকলা, চিত্রকলা, সঙ্গীতকর্ম—এই সব ভারতবর্ষের নিজের রূপেই সার্থক হয়ে ওঠে—এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে। আমার মনে পড়ে আমি এই বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলাম, ঘরে ঢুকবার সময় আমার জুতাজোড়া আমাকে বাইরে রেখে যেতে হয়েছিল। ভারতবাসীর দিক দিয়ে এর অর্থ যে কত গভীর কত পবিত্র তা তিনিই বুঝতে পারবেন যাঁর কোনদিন ক্ষণেকের জন্যও ভারত-বর্ষের অন্তরাত্মার সঙ্গে এতটুকু পরিচয় ঘটেছে।

একটা জিনিস দেখে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলাম। নয় দশ কি এগারো বছরের ছেলেরা মিলে নিজেদের হাতে একটি বাড়ী তৈরি করেছে—কেবলমাত্র ছাদ তৈরি করতে পারেনি। বাড়ীতে তিনখানি কামরা; একখানিতে পুস্তকাগার, একখানি দোকান এবং একখানি তাদের বসবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাদের কী অহঙ্কার বাড়ীখানা তৈরি করেছে বলে। এই তো চাই! ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এই রকম শিক্ষারই তো প্রয়োজন। শতাব্দীর বিদেশী শাসনে ভারতবর্ষের আর যাই হোক না কেন, কর্মশক্তির অনুপ্রেরণা ভারতবর্ষ

হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তা জানেন। তাই তাঁর বিদ্যালয়ে এইসব প্রচেষ্টা। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যে কেবল ভারতবর্ষের সভ্যতাই প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তা নয়, পশ্চিমের যা কিছু ভালো তা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যাদানের মধ্যে তিনি পশ্চিমকে অবহেলা করেন নি।

কৃষির উন্নতি, গ্রাম-সংস্কার—এই সমস্তও তাঁর বিদ্যালয়ের অন্তর্গত এবং সঙ্গে সঙ্গে তিব্বত থেকে আনীত পুরাতন জীর্ণ পুঁথির মধ্যে প্রাণ ঢেলে দিয়ে পণ্ডিতদের গবেষণা করতে দেখেছি—বৌদ্ধধর্মের নূতন রূপ যদি কিছু আবিষ্কৃত হয়। একটি লোককে আবার দেখলাম বাংলা অভিধান তৈরি করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।

কবির বিদ্যাশ্রমে একটি মন্দির আছে—ধর্মমন্দির। কোন সম্প্রদায়-বিশেষের মন্দির নয়। মানবের ধর্মের, বিশ্বমানবের ধর্মের যা কিছু গভীর, যা কিছু সত্য, যা কিছু মহান—প্রাণে তারই স্পর্শ পাওয়া যায় এই মন্দিরের মধ্যে। মহাত্মা গান্ধীর মুখে শুনেছি ভারতবর্ষে যেদিন ত্রিশ কোটি লোক অন্ততঃ একবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারবে—সেদিন ভারতবর্ষের শুভদিন—যে দেশে দারিদ্র্য এত প্রখর, এত ভীষণ সে দেশে এরূপ একটি বিদ্যাশ্রমের সৃষ্টি অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়।" (বিচিত্রা—রবীন্দ্র জয়ন্তী, ১৩৩৮।) শিক্ষাদানের মূলে সৃষ্টিকার্যের প্রেরণা থাকা চাই। সৃষ্টিকার্যের প্রকৃত প্রেরণা হইল প্রেম। সেই সত্যটিই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সত্য প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহার এই বিদ্যালয় সংগঠনে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কার্যের আরম্ভে কি প্রকৃতির ছাত্র পাইয়াছিলেন সে কথা আমরা সকলেই জানি কিন্তু তিনি কোনোমতেই নিরাশ হন নাই। তাঁহার সমস্ত কর্মশক্তি তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন সেই দুরন্ত প্রাণচঞ্চল কয়েকটি বাঙালী ছেলের জন্য। একদিন তাহাদেরই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা উৎসারিত হইয়াছিল। তাহাদের স্বচ্ছ বুদ্ধি আচ্ছন্ন-হইয়া দেশে যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল সেদিন, সেই সমস্যা দূর করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কবি। "কালান্তর" পুস্তকে "সমস্যা" ও "সমাধান" নামক দুইটি প্রবন্ধে তিনি এই কথাই দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমি যেটাকে সমস্যা বলে নির্ণয় করছি, সে আপন সমাধানের পথ আপনিই প্রকাশ করছে। অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন; শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ, অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগতকে বাস্তবভাবে গ্রহণ

করতে পারিনে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে সুবুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুতেই হতে পারে না।"

এই শিক্ষা তিনি সুরু করিয়াছিলেন বাংলার ছেলেমেয়েদেরই লইয়া। সত্য বটে, পরবর্তী যুগে তাঁহার সাহিত্য ও বাণী, কর্মের পরিধি দেশ ও কালের ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বিশাল জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত কর্মের কেন্দ্রস্থল তাঁহার বাংলাদেশ। দ্বাদশবার বিশ্বভ্রমণ করিয়া বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সমস্ত সম্পদ আহরণ করিয়া তাঁহার সাধন-ভূমি বাংলাদেশকেই প্রথমে দান করিয়াছেন। তাই মনে হয়, তাঁহার তপস্যারত কর্মযোগী রূপকে জগতের নিকটে প্রকাশিত করা বাঙালীরই প্রথম ও প্রধান কাজ।

বাঙালীর অপরাজেয় মননশক্তি ও প্রতিভার উপরে তাঁহার যে কি অসীম আস্থা ছিল তাহা দেখি তাঁহার বহু উক্তিতে, বহু রচনায়। তিনি বলিয়াছেন "আমার বিশ্বাস যুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেরই অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানাদিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগলো তার জীবনে, তার মনন-শক্তি জাগরিত হয়ে উঠলো পূর্বযুগের অজগর নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সর্বজনীনতা, সৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্বমানবের পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবত্বের উপলব্ধি বাংলাদেশেই রামমোহন রায়ের মতো মহা মনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়। আচার, ধর্ম, রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠলো বাঙলা ভাষা; তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবনের সঞ্চারে। সাহিত্যে দেখা দিতে লাগলো অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদি যুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্রগর্ভ থেকে নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয়ভূমি হয়ে। চিত্রকলা বাংলাদেশেই সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতা লাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণ-চারণ-চক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হল। গীতকলা আজ বাংলাদেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার করে নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে, তার আশুফলের বিচার করবার সময় হয়নি;

কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নব নবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তিকামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ্য-প্রকৃতির নিরূপণ হতে পারে।"

বাংলাদেশের এই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটাইতে রবীন্দ্রনাথের দান যে কত বিরাট তাহা বিচার করা কি সহজ কাজ? বাঙলাসাহিত্যে নূতন যুগের তিনিই প্রবর্তক। তাঁহারই হস্তে ছোটগল্পের প্রকৃত সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। বাঙলাভাষাকে শক্তিশালী করিবার জন্য তাঁহার যে সাধনা তাহার তুলনা কোথায় মেলে? প্রাচীনসাহিত্য ও আধুনিকসাহিত্যকে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করিয়া তিনিই প্রথম বাঙলাসাহিত্যের একটি নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। এমন ব্যাপকভাবে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন যাহাতে বাঙলাসাহিত্যে যথাযথ ও উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার সুগম হইতে পারে। নানা মাসিক পত্রিকা পরিচালনাকালে তিনি উদার হৃদয়ে নূতন লেখককে আহ্বান জানাইয়াছেন এবং সম্পাদকীয় সমালোচনায় তাঁহাদের লেখার ন্যায়বিচার করিয়া একদিকে লেখককে যেমন সাহস ও আশা দিয়াছেন অন্যদিকে ভাষা ও সাহিত্যকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি শিশুদের জন্য তাঁহার যে সাহিত্য সৃষ্টি তাহা অনুপম ও অতুলনীয়।

আবার অন্যদিকে ভারতীয় নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ে প্রাণরস ঢালিয়া তাহা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। নিজে অভিনেতা সাজিয়া, নিজের আদর্শে অভিনয় ও নৃত্যভঙ্গীর মধ্যে শালীনতা ও গরিষ্ঠতা আনিয়া নৃত্য, গীত ও অভিনয়কলাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছেন। যে অনুপম ভাষায় ও অপূর্ব সুরে তিনি অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহার তুলনা পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই নাই। ভারতের ধর্ম, সমাজ, লোকাচার, শিক্ষা-ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি কোন ক্ষেত্রেই তিনি বাদ দেন নাই। দেশের জড়তা দূর করিবার জন্য তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণী প্রতিভার দ্বারা সমাজের প্রত্যেক ব্যবস্থাকে নিষ্ঠার সহিত তুলাদণ্ডে বিচার করিয়াছেন—কোনও মিথ্যার সহিত আপোষ করিয়া দুর্বলতার পরিচয় দেন নাই। বাংলার গ্রাম্য সাহিত্য ও পল্লী-শিল্পে নব প্রাণসঞ্চারের ইচ্ছায় ছড়া, গল্প, ঠাকুরমা-দিদিমায়ের ছেলে-ভুলানো কথা ও কাহিনী, পল্লীগীতি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলি নূতন সাজে সাজাইয়া পরিবেশন করিয়াছেন দেশের শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে। একটি পরাধীন জাতির ও দেশের মানুষ হইয়াও নির্ভীক চিত্তে ও

প্রকাশ্যভাবে পরপীড়ন-নীতির সমালোচনা করিয়াছেন এবং খেতাব ত্যাগের দ্বারা সময়োচিত শিক্ষা দিয়া এক অতি উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি দ্বাদশবার বিশ্বপর্যটন করিয়া বিশ্বের চিত্তসম্পদ যেমন ভারতের পায়ে নিবেদন করিয়াছেন তেমনি ভারতীয় জীবন-দর্শনের মর্মকথা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করিয়া ভারতকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে একটি মানুষ নিজের জীবনসাধনার দ্বারা সমস্ত ভারতকে কিভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তব্ধ ও হতবাক হইয়া যাই।

বাঙালী ছেলেদের জন্য তাঁহার যে আশা, তাহাদের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যে গর্ব সেই কথা আজ স্মরণ করিতেছি। কি গর্বভরে তিনি একদিন লিখিয়াছিলেন, "একথা কারো অগোচর নাই যে একদা রাষ্ট্রমুক্তিসাধনার সর্বপ্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাংলাদেশে এবং যে দুর্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা কারাপ্রাচীরের নেপথ্যে ছিলেন, তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্যে বধ-বন্ধনের মুখে যেমন নির্বিচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেই এরকম ঘটে নি। * * * * বাংলাদেশের সহস্রাধিক তরুণ প্রাণ সুদীর্ঘকাল কারানির্বাসনে আপন দীপ্তি নির্বাপিত করেছে, জানি সেইজন্যে আজ বাংলাদেশের আকাশ অনুজ্জ্বল, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, যে-মাটিতে এদের জন্ম সেই মাটিতে দুঃখ-জয়ী বীর সন্তান আবার জন্মাবে, তারা পূর্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সমাহিত হয়ে ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপব্যয় না করে গঠনের কাজে প্রবৃত্ত হবে।" বাঙালী ছেলেমেয়েদের উপরে তাঁহার যে আশা-ভরসা তাহা কি ব্যর্থ হইবে?

রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে তাঁহার কর্মিগণ শান্তিনিকেতনে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা যুগান্তকারী। পুঁথিগত, রুটিনগত, পরীক্ষাসর্বস্ব একান্ত নীরস শিক্ষাকার্যকে কবিগুরুর প্রেরণায় হাসি-গল্পে, নৃত্য-গীতে, রূপে-রসে, জ্ঞানে ও কর্মে অপূর্ব ও আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন তাঁহারা। শিক্ষা যে দৈনন্দিন আহার-বিহারের ন্যায় গতানুগতিক ব্যাপার নহে, শিক্ষার আয়োজন যে উৎসবের আনন্দায়োজনের ন্যায় বিচিত্র ও বহুমুখী হওয়া চাই, শান্তিনিকেতনই সেই শিক্ষা দেশকে দিয়াছে। শিক্ষক কেবল পাঠ দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, তাহার উপরে আরও কিছু দিবেন এবং নিজে সাধকের ন্যায়

শিষ্যের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিবেদন করিয়া দিবেন, এই আদর্শ শান্তি-নিকেতনেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষাজগতে যুগ-পরিবর্তন করিয়াছেন ইঁহারাই। ইঁহাদের সকলকে আজ প্রণাম করি।

গুরুদেবের মনের ধ্যানকে কর্মে রূপান্তরিত করিয়া সার্থকতার পথে লইয়া গিয়াছিলেন এই সকল কর্মিবৃন্দ তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়ের অনুরাগ ঢালিয়া। কবি নিজে এ বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাই এখানে বলিব, "আজ মনে পড়ে কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছু ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই; এমন কি খ্যাতিরও না—অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। * * * * আশ্রমের কোনও সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না—চাইও নি। এই জন্যই যাঁরা এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি।"

আরও এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, "আইডিয়ালকে প্রকাশ করে তোলা কারও একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দু একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়। প্রথমে যে অনুধাবনায় কাজ আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কায় তার যথার্থ পরিচয় নয়। হৃদয়, কর্ম, ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় তা ফুটে উঠতে থাকে।" এই সময়ে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীকেও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। তাঁহার ত্যাগ ও আশ্রমের কর্মের প্রতি নিষ্ঠা যে কত গভীর ছিল একথা গুরুদেবের জন্মের শতবর্ষ পূর্তির সময়ে বিশেষভাবে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য, কেননা স্ত্রীর পূর্ণ সহায়তা না পাইলে মনে হয় না কবির পক্ষে এমন নিঃশেষে নিঃস্বার্থভাবে কর্মযোগে আত্মনিবেদন করা সম্ভব হইত। কবি নজরুলের বিখ্যাত "নারী" কবিতাতে এই চিন্তার যে যথার্থ প্রকাশ দেখি তাহাই উল্লেখ করিব এই প্রসঙ্গে—

"তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।

* * * *

শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।

নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।

* * * *

জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী
রানীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।"

অধ্যাপক ও আশ্রমের কর্মিগণ যেমন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছিলেন তিনিও তেমনি তাঁহাদের সকলকেই তাঁহার কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমের কাজে অনেকেই যোগ দিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের শিক্ষা-দীক্ষা সমান ছিল না, কিন্তু কাহাকেও তিনি বাদ দেন নাই। সকলের নিষ্ঠা সমান ছিল না, আশ্রমের কাজে আস্থাও সমান ছিল না, কিন্তু নদীর ন্যায় তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া সম্মুখের দিকে চলিয়াছিলেন লক্ষ্যের সন্ধানে। ক্রমে দেখি কবিকে ঘিরিয়া কত গুণী জ্ঞানী মহাপুরুষের সমাবেশ হইয়াছে ওই বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ন্যায় অমিততেজ পুরুষ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী; অজিত চক্রবর্তী ও সতীশ রায়ের ন্যায় জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবন্ধু; এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের তুল্য মানবপ্রেমিক, এলমহার্স্টের ন্যায় ত্যাগী, দিনেন্দ্রনাথের ন্যায় সুরশিল্পী, নন্দলাল বসুর ন্যায় সৌন্দর্যের পূজারী; জগদানন্দ রায়, তেজেশচন্দ্র সেন ও নেপালবাবুর মত ছাত্র-কল্যাণকামী শিক্ষক—সর্বমুখী প্রতিভার এমন অপূর্ব সমাবেশ কে কোথায় দেখিয়াছে? ক্ষুদ্র একটি বিদ্যালয়কে যেমন কবিগুরু গড়িয়া তুলিলেন এ যুগের নালন্দা ও বিক্রমশীলা রূপে তেমনি গুরুদেব বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন বহু রত্নের সমাবেশে। যে রত্নরাজির দ্বারা তিনি

তাঁহার সভাকক্ষ আলোকিত করিয়াছিলেন তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন বিশ্বের সাতসমুদ্রের তীরভূমি হইতে—তাঁহাদের জ্ঞানের আলোক-রশ্মিও পৌঁছিয়াছিল পৃথিবীর সকল প্রান্তে।

সকলকে লইয়া যে সমগ্রতা, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শটি শিক্ষাজগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা থাকিলে কর্ম সহজেই সার্থক হয় কিন্তু যেখানে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার সমাবেশ হইয়াছে সেখানেও যদি সত্য থাকে তবে কর্ম কখনই পণ্ড হইবে না। কেননা সত্য চিন্তার সমাবেশে কর্ম আরও সমৃদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কর্মীর বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতামতকে কখনও উপেক্ষা করেন নাই বরঞ্চ সেই মতামতগুলির মধ্যে সত্যের সন্ধান করিতেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এই কথাই তিনি বলিয়াছেন যখন পড়ি, "কর্ম যখন বহু বিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রম-প্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। * * * * উচ্চতর সঙ্গীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে; একতারায় ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই যে শ্রেষ্ঠ এমন নয়।"

রবীন্দ্রনাথের কাজ বেশিদিন বাংলাদেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রহিল না। ক্রমে তাঁহার সঙ্কল্প হইল যে শিক্ষাকে একটি বিশেষ জাতি ও গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত না করিয়া তাহা সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্ব কর্ম-যোগে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই সঙ্কল্পের ফলে তাঁহার কর্মের পরিধি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল—কোন আঘাত, কোন দুর্বুদ্ধি, কোন অবজ্ঞা বা কঠিন সমালোচনা তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। সত্যের যে প্রাণশক্তি—তাহাই তাঁহার কর্মের মূলটিকে চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই বিদ্যালয় বাংলার এক প্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়েছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগ-সাধন হল। বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।" শিক্ষার ঐক্য যে পোলিটিকাল ঐক্য অপেক্ষা গভীরতর, উচ্চতর ও মহত্তর, এই চিন্তাই কবির মনে এই সময় হইতে ঘুরিতে লাগিল। কবিগুরু বলিলেন, "শিক্ষার ঐক্য

চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য—এবং তাহাই সত্য ঐক্য।" "বিদ্যাসমবায়" প্রবন্ধে তিনি লিখিলেন, "ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ, পার্শি, খ্রীষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্য সাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। ভারতের এক অংশকে ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখিলে ভারতের চিত্তকে ঠিক বুঝা যাইবে না এবং প্রাদেশিকতার বিষে দেশের যে অমঙ্গল তাহাও কাটিবে না।"

মানুষের মিলন চাই প্রেমের ভিত্তিতে। বিদ্বেষকে দূরে ঠেকাইবার জন্য কেবল কতকগুলি সভাসমিতি করিলে তাহা যে হইতে পারে না এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেই সুদূর ১৯১৬ সালে ১৮ই অক্টোবর লস এঞ্জেলস হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তার পরে এও আমার মনে আছে যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্রস্থাপন করতে হবে। স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্ব মানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ করা হবে।"

তাহার পর আসিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের সময়ে ও পরে পৃথিবীতে একটা মহা অশান্তি ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়াছিল যেমন দেখা দিয়াছে আজ। সেই সময়ে পৃথিবীতে যে বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল—সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে—তাহা আজও শেষ হইয়া যায় নাই। মনে হয় সকলই যেন ধূলিসাৎ হইবার পথে। এই বিপ্লবের সময়ে ভারতের কি দিবার আছে? কবিগুরু বলিয়াছেন, "ভারতের ধনসম্পদ না থাকিতে পারে কিন্তু তাহার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করিবে তাহার আত্মার প্রচ্ছন্নতাকে দূর করিবার জন্য—কোন সুখ-সুবিধা পাইবার জন্য যে আন্তর্জাতিক মিলন হয়—তাহাতে এই মুক্তি আসিবে না—যখন প্রকৃত মৈত্রীর বাণী শিক্ষার সমন্বয়ে প্রচারিত হইবে বিশ্বের দরবারে তখনই আসিবে প্রকৃত শান্তি।" মানুষের সেই প্রকৃত আত্মার পরিচয়টি আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, আমাদের কর্মের মধ্যে প্রচলিত করিতে হইবে, সকল মানুষকে সম্মান করিয়া

আমরা সম্মানিত হইব—নবযুগের উদ্‌বোধন করিয়া আমরা জরামুক্ত হইব। তাই কবিগুরু সকলকে বলিতেছেন যে আমাদের শিক্ষামন্ত্রটি হইবে—

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্‌সতে ॥"

"যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না।"

ক্রমে ক্রমে আমরা দেখিতে পাই যে জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই শিক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করেন নাই, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জগতেরই শিক্ষাগুরুর কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। চীন, জাপান, মালয়, যবদ্বীপ, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশে তিনি বৃহত্তর ভারতের রূপ দেখিয়া ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এশিয়ার যে মূলগত ঐক্য সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়াছিলেন। আত্মশক্তির অভাবে প্রাচ্যের যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহা বাঁচাইয়া তুলিতে গুরুদেবের কি অসম্ভব প্রয়াস। জাপান এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম সেই আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহার কি অপরিসীম আনন্দ, কি বিরাট গর্ব।

এশিয়াকে যেমন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি শিক্ষাগুরুর কাজে নামিয়াছিলেন তেমনি য়ুরোপকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারই কণ্ঠে সংযমের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল; আত্মশক্তির দম্ভকে সংযত না করিলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে য়ুরোপের যে দান তাহা তাহার ঔদ্ধত্যে নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইয়া যাইবে—এই সতর্ক বাণী তাঁহারই মুখে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল। জাপান যখন য়ুরোপীয় শক্তিমত্তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দম্ভপ্রকাশ করিতে সুরু করিল তাহাকেও ভর্ৎসনা করিতে কবি দ্বিধা বা বিলম্ব করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার শেষজীবনে সমস্ত সাহিত্যরচনার মধ্যেই শক্তির দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রতি ধিক্কার এবং সংযম শিক্ষার প্রশস্ততা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।

এইভাবে দেখি যে, প্রথম জীবনে তাঁহার কর্মক্ষেত্র একটি বিশেষ সমাজে ও একটি বিশেষ ধারার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে তাহা সমস্ত বঙ্গদেশের গণ্ডি ছাড়াইয়া ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বৃহত্তর ভারতে এবং অবশেষে সমগ্র পৃথিবীতেই বিস্তারিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে,

শেষজীবনে তিনি সমস্ত বিশ্বেরই চিন্তানায়ক ও শিক্ষাগুরুর আসন গ্রহণ করিয়া কখনও উদ্দীপনার দ্বারা কখনও বা ভর্ৎসনার দ্বারা, কখনও অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, কখনও বা অনাগত ভবিষ্যতের পটভূমিকায় বর্তমান যুগের সমস্যাগুলি সমাধানের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

কবিগুরুর মতে, এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা। এই প্রকৃত শিক্ষার যে পরিকল্পনা ও প্রয়োগ তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা সমালোচকের শাণিত তরবারি হইতে রক্ষা পায় নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার অনেকটাই বিদেশ হইতে আমদানি করা; ইহাতে তাঁহার নিজস্ব দান অতি অল্পই। তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রভাব ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সাদৃশ্য আছে বই কি। না থাকাই তো আশ্চর্যের কথা। কেননা, যুগের সমস্যা কম-বেশি হইলেও সবদেশেই সেই সমস্যাগুলি প্রায় সমান তালেই চলে, এবং প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির যুগ-সমস্যার মধ্যে শিক্ষা-সমস্যা একটি বিরাট স্থান অধিকার করিয়া থাকে। যে সমস্যা একটি জাতিকে সংশয়াকুল করিয়া তুলিতেছে তাহার তরঙ্গ অন্য এক জাতির চিন্তাধারাকে আঘাত না করিয়া পারে না। এইজন্যই কিংবদন্তী আছে যে মহাপুরুষগণের চিন্তাধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই মহাপুরুষগণের মধ্যে অন্যতম। কাজেই তাঁহার শিক্ষাভাবনাতে কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তাহা তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীকে ক্ষুদ্র বা সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয় নাই, বরঞ্চ তাহাই তাঁহাকে বিশ্বগতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সমারোহ, বিলাসের মোহ তাঁহার চিত্তকে কোনমতেই অভিভূত করিতে পারে নাই। বর্তমান সভ্যতার চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেই তাঁহার দিন কাটিয়াছে, তথাপি প্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির স্নিগ্ধরূপ তাঁহাকে চিরকাল আকর্ষণ করিয়াছে, প্রেরণা দিয়াছে। তিনি বারবার বলিয়াছেন,

"যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।

মৃত্যু তরণ শঙ্কা হরণ
দাও সে জীবন নব।"

সেই ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম, স্বার্থ-বিক্ষোভ-বর্জিত শম-দম-ত্যাগ-তিতিক্ষা, উদার বিশ্বমৈত্রীকেই রবীন্দ্রনাথ মানবসভ্যতার সার্থকতম পরিণাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই শিক্ষাতেই ভারতকে দীক্ষিত করিতে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন।

যাহাতে এই শিক্ষার সাহত জনসাধারণের সহজেই পরিচয় ঘটে তাই তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির নানা ঘটনা যাহা মানব-মহত্ত্বের পরিচায়ক তাহা সাহিত্যে ও কার্যে রূপ দিয়াছেন। নিজে ভারতীয় সাধকের ন্যায় কর্ম-তপস্যায় মগ্ন ছিলেন অথচ নিজের জীবন দিয়াই দেখাইয়াছেন যে সাধনা করিতে হইলেই যে গৃহত্যাগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। নিজে সংসারের সমস্ত কাজের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া ছিলেন তবুও ঋষির ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনে ইহাই ছিল আদর্শ। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া ত্যাগবিদ্ধ সংসার ভোগ করার যে পথ তাহা রবীন্দ্রনাথই পরিপূর্ণভাবে আমাদের দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় সভ্যতার সত্য রূপটি যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি সেই ইচ্ছাতে তিনি রামায়ণের সামাজিক দিকটি বারবার আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় দেখি যে তখনকার সমাজবন্ধন ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নী, স্বামী ও স্ত্রীর পবিত্র এবং স্নিগ্ধ সম্বন্ধ-বন্ধন সমাজকে দিয়াছিল একটা সংহত মূর্তি। চরিত্র-গৌরবে ও আদর্শ-মহিমায় মানুষ যে স্তরে উপনীত হইয়াছিল—সেই উচ্চ শিখরের দিকে কি আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ হইবে না?"

মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধ আলোচনাকালে গুরুদেব বলিয়াছেন, ধর্ম কি তাহা লইয়া আজ তর্কের সীমা নাই কিন্তু ভারতীয় জীবন হইতে ধর্ম কি করিয়া দূরে রাখা সম্ভব তাহাও তো তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতবর্ষ নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে যে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছে সেই সূত্রটি হইল ভারতের ধর্ম। আজ যে ভারত খণ্ডিত হইয়াছে তাহার রাজনৈতিক কারণ যাহাই হউক না কেন—ধর্মকেই প্রধান কারণ বলিয়া খাড়া করা হইয়াছে। আরও দেখি ভারতের

প্রকৃত ঐতিহ্য ও তাহার সাহিত্যের উপকরণ তাহার ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে। যে যোগসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিধৃত তাহা আমাদের শাস্ত্রে, পুরাণে, কাব্যে ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "পলিটিক্স এবং নেশন যেমন য়ুরোপের কথা, ধর্ম কথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা। পলিটিক্স এবং নেশন কথাটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভবে না, তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ য়ুরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এইজন্য ধর্মকে ইংরাজী রিলিজনরূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভুল করিয়া বসি। * * * আমাদের গৃহধর্ম, সন্ন্যাস-ধর্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়ম সংযম, আমাদের বৈরাগী ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্যন্ত সর্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত সকলেই বলিতেছে আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি বুদ্ধিপূর্বক মুক্তিব পথ গ্রহণ কবিবার জন্য; সংসারের অন্তহীন আবর্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পডিবার জন্য।" এই একটি সূত্রেই বাঁধা পড়িয়াছে ভারতের সকল ধর্মাবলম্বী—সে সূত্র যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন তাহার প্রভাব সামান্য নহে। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সময়েবই ধর্ম—তাহার মূল মাটির ভিতবে এবং মাথা আকাশেব মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র কবিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভাবতবর্ষ দ্যুলোক ভূলোকব্যাপী মানবেব সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিযাছে।" এই ধর্মকে আমরা আমাদের জীবন হইতে দূবে রাখিব কি কবিয়া? ভাবতীয় জীবনধাবাব সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতবে যে একটি মূলগত যোগসূত্র আছে তাহা ভাবতের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার আশ্রমবিদ্যালয়ে—তাহা "মানুষেব ধর্ম"—মানুষের সেবায় সুরভিত

তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন সংস্কৃতির দ্বারাও মনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন নাই। যে ভাবতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপরে তাঁহাব নিজের জীবনের ভিত্তি ছিল সেই ভিত্তির উপরেই দেশের ছেলেদের জীবন-ইমারতের বুনিয়াদ গাঁথিবার প্রয়াস ছিল তাঁহার। কিন্তু তিনি বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন যে, যে-কালকে আশ্রয় করিয়া তপোবনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেকালে এইরূপ শিক্ষার পূর্ণ উপযোগিতা ছিল। আজ সে যুগের যে পরিবর্তন

হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। সেই প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে নূতনকে আহ্বান করিতে হইবে—তাহারই মধ্যে নূতনকে প্রকাশ করিতে হইবে—নূতনের প্রাণ স্পন্দন হইবে প্রাচীনের মধ্যে।

এই ভাবনাতেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান শিক্ষাকে তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। কলের দ্বারা পাছে "মানুষ" হারাইয়া যায় এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বটে কিন্তু, যে বিজ্ঞান সত্য—সেই যথার্থ সত্য জ্ঞানকে তিনি শিক্ষা হইতে বাদ দেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মতে সমস্ত সৃষ্টিপ্রবাহ এক সত্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও সেই সত্যকে উপলব্ধি করা, সেই সত্যকে প্রমাণ করা। নূতন শিক্ষায় বিজ্ঞান সেই সাধনাই করিবে। এই আশায় কবিগুরু একদিন বলিয়াছিলেন, "দেশ স্বাধীন হলে মহাত্মাজীকে বলব আমাকে শিক্ষা-মন্ত্রী করে দিতে। ভারতবর্ষের শিক্ষা ভারতবর্ষের ধারায় দিতে হবে, চারিদিকে আশ্রম গড়ে তুলতে হবে, অতীতের আশ্রম নয়, ভবিষ্যতের আশ্রম। ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা নেব, আমাদের যা কিছু দেবার আছে দেব। উপকরণের বাহুল্য থাকবে না, ধর্মের গোঁড়ামি থাকবে না, হৃদয়ের কার্পণ্য থাকবে না।" এই ভাবে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ঐতিহ্য ও প্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার পথটি আমাদের দেখাইয়া গিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে গুরুদেবের শিক্ষার ক্ষেত্র ভারতবর্ষের সীমা ছাড়াইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িল বিশ্বের ক্ষেত্রে। একদিন যে শিক্ষা ব্রহ্মণ্য-শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, যে দেশাত্মবোধ "গোরা"র স্বদেশপ্রেমের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ ছিল তাহা মুক্তি পাইল সার্বজনীন শিক্ষায়—বিশ্বপ্রেমে। গীতার সেই পরম বাণী সত্য হইয়া উঠিল কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথের জীবনে—

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতেতু যোগমুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥"

যিনি মহান হইতে সুমহান, তাঁহার স্বদেশ কোন বিশিষ্ট ভূভাগ নহে—সমগ্র বসুধাই তাঁহার মাতৃভূমি। আপনাকে তিনি নিখিলের সর্বভূতে দেখিতে পান, নিখিল বিশ্বকে আপনার মধ্যে নিবেশিত দেখেন।

অর্জুনের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও দেখিলেন, শত্রু-মিত্র, আপন-পর, দূর ও নিকট পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। কেবল নিষ্কাম কর্মের দ্বারা ভেদবুদ্ধির উপরে উঠিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি আসিবে, নতুবা নহে। অশোকের

ন্যায় তিনি স্থিতধী—তিনি শিক্ষা দিলেন—ভয়ের দ্বারা কিছুই জয় করা যায় না, জয় করা যায় প্রেমে। তাই তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব। আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে, কিন্তু তার একটিমাত্র কারণ এই যে সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। যিনি সর্বগতঃ, শিবঃ, যিনি সর্বভূত গুহাশয়ঃ, যিনি সর্বানুভূঃ। তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বলো এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তা হলে আমি বলব স্বজাতি অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত আছে। সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে, "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম।" রাজ্য ডুবিয়া যায়, সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়, প্রতাপশালী সম্রাটকে লোকে ভুলিয়া যায় কিন্তু সাধনার প্রভাব যে চিরযুগের—একথা ভারতবর্ষ কেমন করিয়া ভুলিবে?"

এই সত্যে দীক্ষিত ভারতবর্ষ একদা বিশ্বমানবের তীর্থভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের সত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহার বিশ্বভারতীকে আবার তিলে তিলে গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার সেই মর্মকথা শুনি তাঁহার সঙ্গীতে—

"হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

বিশ্বভারতী এখন হইতে কেবলমাত্র একটি আদর্শ শিক্ষায়তন নহে, কেবলমাত্র একটি স্থানগত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান নহে, কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা বরণীয় তাহারই আদর্শ ও প্রতীক। কালের পটভূমিকায় উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া থাকিবে মহাশিক্ষক রবীন্দ্রনাথের এই বিরাট কীর্তি, তাঁহার মানসীমূর্তি।

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বিশ্বভারতীকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তর-সাধকগণ ঠিক সেইভাবে ইহার আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই এইরূপ অনু-

যোগ বহু ক্ষেত্রেই শুনিতে পাওয়া যায়। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কি বলিয়াছেন দেখা যাক। "সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবি যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না—এর বদলে পেলুম কী।" গুরুদেব তাঁহার কাজটি গড়িয়াছিলেন নিজের মনের মত করিয়া—প্রতিদিন নিজের ভালবাসা ও নিষ্ঠা ঢালিয়া। শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া তাঁহার কঠিন সঙ্কল্প ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট করিয়াছেন তিনি। কিন্তু তাঁহার কর্ম ছিল নিষ্কাম। যে সত্য তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাকে রূপ দেওয়াই ছিল তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। তাহা রক্ষা করিবার ভার তাঁহার উত্তরসাধকগণের—তাঁহারা যে সকলেই গুরুদেবের সমস্ত চিন্তা ও ভাবধারা গ্রহণ করিবেন, এমনটি আশা করাই তো ভুল। তাহা হইলে তো সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিই একটি স্থাণু অচলায়তনে পরিণত হইবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের আদর্শেই কি পরিবর্তন আসে নাই? বর্ণাশ্রম ধর্ম ও তপোবনের আদর্শ লইয়া যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন শান্তিনিকেতনে, যুগের ধর্মে তাঁহার নিজেরই হাতে সেই তপোবন-বিদ্যালয়ের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে তাঁহার যে কখনও বিচার-বিভ্রাট হয় নাই এ কথাও আমরা বলিতে পারি না। কল্পনাকে বাস্তবের আসনে বসাইতে গিয়া কতবার তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নিজের মনস্বিতারগুণে বৈদিক যুগের তপোবন ও বৌদ্ধযুগের নালন্দার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া যুগধর্মের প্রয়োজনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে তিনি বিশ্বভারতী গড়িয়া তুলিয়াছেন।

এই পরিবর্তনের কথাই মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "অন্তরের সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সঙ্কল্পকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না—বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েছি। এ ভাবনা যেন না করি, আমি যখন যাব তখন কে একে দেখবে, এর ভবিষ্যৎ কী আছে কী নেই। এইটুকু সান্ত্বনা বহন করে যেতে চাই, যতটুকু পেরেছি তা করেছি, মনে যা পেয়েছি, দুর্বল হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তারপরে সংসারের লীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কীভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারিনে। লোভ হতে পারে, আমি যে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই ভাবে এর পরিণতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অহঙ্কৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে, কালের সঙ্গে ও যোগে কোনরূপ রূপান্তরের

মধ্য দিয়ে আপন প্রাণবেগে ভাবীকালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা আজ কে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে? এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে, এমন কখনও হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সত্যের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না বলেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু "মা গৃধঃ" নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। যা কিছু ক্ষুদ্র, যা আমার অহমিকার সৃষ্টি, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় বলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সজীব পরিচয় দেবে সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জন-সুলভ সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রয়াস করে ব্যবসায়ীর মন সে না কিনুক; আন্তরিক গরিমায় তার যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্ত সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে।"

আর এক জায়গায় তিনি এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "শিশু-অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে? আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোট কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠলো তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা—সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করিনে, কাউকে বাদ দিইনে। নানা ভুল-ত্রুটি ঘটে, নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে—এসব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ, ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করিনে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাইনে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ-অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে

প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোন এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।"

তারপরে তিনি আরও বলিয়াছেন, "অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি; দেখছি আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পরে ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সঙ্গত হলো, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হলো কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই; কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি তার আর নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো—আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্ত-সম্মিলনে আপনি গড়ে উঠেছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ, তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে।

নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না—তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে একথা আমি আশা করি—সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটা প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে, এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে, কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়। যাঁরা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়—নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিঁকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের জীবাণু—তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যে ভালোমন্দের

একটা দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়ো।"

রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা হইল যে তিনি যাহা বলিবেন তাহাই যে বেদবাক্য-রূপে সকলে মানিয়া লইবেন এমন আশা তিনি কোনদিনই করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্ভাবন করি নি ; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক। তারপরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান যেন প্রাণবান হয়, কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে ; হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চরণের পথ যেন থাকে। অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়—তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। * * * * * ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠার দ্বারা শ্রদ্ধার দ্বারা এর কর্মকে সফল করেন—এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।"

ভাগীরথীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথ আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া গিয়াছেন এবং ভাগীরথীরই মত তাঁহার কর্মধারা নিত্য স্রোতে প্রবাহিত। নূতন স্রোত আসিয়া তাঁহার কর্মধারাকে পুষ্ট করিবে এ বিশ্বাসও কবিগুরুর যেমন ছিল, তেমনি ভরসা ছিল যে স্রোত যদি একদিকে শুকায় তো অন্যদিকে তাহা প্রবাহিত হইবে নূতন খাতে—কিন্তু মূল সাধনার ধারা কখনই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে না।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বৈচিত্র্য যেমনই বিস্ময়কর তেমনি চমকপ্রদ। তাঁহার চিন্তার গতির সহিত সাধারণ মানুষের পক্ষে তাল রাখিয়া চলা দুষ্কর। তাঁহার লেখনীমুখে কত কথা, কত চিন্তা, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—সব কথা এখানে বলা সম্ভবপর নহে। শুধু একটি আদর্শ, যাহা আমাদের জীবনের মূল ভিত্তি তাহাই প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার যে কর্মসাধনা—সে সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা গেল। "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা" করিলাম। তাঁহারই কথা, তাঁহারই ভাব, তাঁহারই আদর্শ শিক্ষকের জীবনের পাথেয় হইবে—শিক্ষককে সাহস দিবে—এই প্রার্থনা। কবিকণ্ঠে যে প্রত্যাশার ধ্বনি আমরা শুনিয়াছি যখন তিনি গাহিয়াছিলেন,

"কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি—"

তাহারই উত্তরে আমরা যেন আজ বলিতে পারি—

"আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

ইহাই আমাদের গুরুদক্ষিণা, আমাদের কবি-প্রণাম।

আমাদের উপরে তাঁহার ভরসা অসীম, বাঙালীর অপরাজেয় বীর্যে তিনি আশা রাখিয়াছেন—দেশের সত্যনিষ্ঠার উপরে তিনি তাঁহার কর্মের ভিত গাঁথিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে যে বাণী তিনি শুনাইয়াছেন,

"পঁচিশে বৈশাখের পৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।
জেনেছ কি
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত
অনেক ছিন্ন ভিন্ন
অনেক উপেক্ষিত।

* * * *

যাবার সময়ে এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে
কালের হাতে রইল বলে
করব না অহঙ্কার।"

এই বাণীই শুনিয়াছি তাঁহার যৌবনেব লেখায়—যখন তিনি তাঁহার বিশাল কর্মভার একাকী তুলিয়া লইয়াছিলেন প্রবল সাহসে ও পরম বিশ্বাসে।

"হবে হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়,
হবো আমি জয়ী
তোমার আহ্বান-বাণী সফল করিব বাণী
হে মহিমাময়ী॥

* * * *

কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান॥"